ভারতবর্ষে এই প্রথম।

মানুষের পূর্ব পুরুষ অন্য গ্রহের

মানুষ

পরমেশ চৌধুরী

এক মাত্র পরিবেশক :—

দে বুক ষ্টোর

১৩ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রকাশক :—

প্রফুল্ল চৌধুরী

গ্লোব লাইব্রেরী, ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

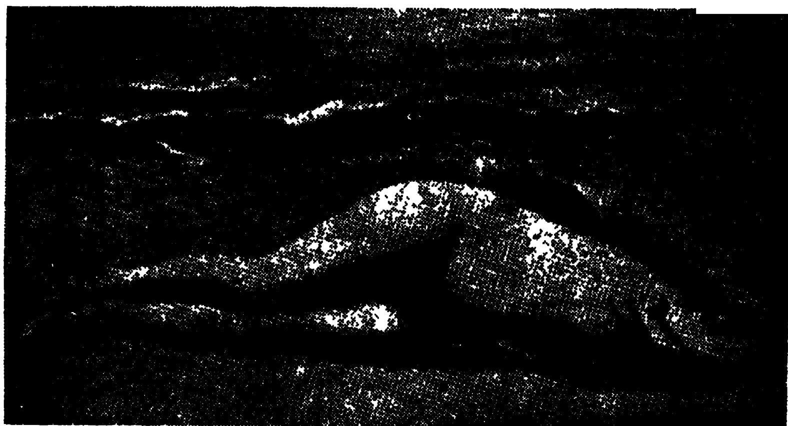
২১শে শ্রাবণ ১৩৬৬

প্রিণ্টার্স :—

বঙ্গবাসী প্রেস

২৬ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সূচিপত্র :—



কাল্পনিক নয় :—

এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক উপাদান।

মহাকাশের মানুষ আসেন।

মহাকাশের মানুষদের উপনিবেশ।

মহাকাশের মানুষ আসতেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অত্যাধুনিক সভ্যতা।

মানুষের পূর্বপুরুষ অন্য গ্রহের মানুষ।

শ্রদ্ধা নিবেদন :—

(১) জ্যাক বার্জিয়ার এবং জি পাউয়েলস (ফ্রান্স)

(২) পিটার কলোসিমো (ইটালী)

(৩) এনড্রু থমাস (ইংল্যাণ্ড)

(৪) মিষ্টার এণ্ড মিসেস ল্যাণ্ডসবার্গ এবং মিষ্টার ব্রামরীচ (আমেরিকা)

(৫) মেটেষ্ট আগরেষ্ট, ও আলেক্সি ক্যাসানজেভ (রাশিয়া)

কিছু কথা :

নতুন কিছু ভাবা এবং লোকে যা ভাবে অর্থাৎ প্রচলিত মতকে চ্যালেঞ্জ করা আমার মজ্জাগত অভ্যেস। আমরা এই ভেবে খুব গর্ব অনুভব করি যে আমরাই পৃথিবীতে একমাত্র সভ্য জীব। কিন্তু, পৃথিবীতে আমাদের আগেও যে অত্যাধুনিক সভ্যতা বিরাজ করছিল তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি এই গ্রন্থে।

মহাকাশের মানুষ এখনও আসেন, অতীতে আসতেন এবং যারা আসতেন তাদের বংশধর আমরাই। শ্রমসাধ্য গবেষণার পর আমি আমার এই সূত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিতে পেরেছি আশা করি।

কিশোর কিশোরীদের কাছে এই গ্রন্থ রূপকথার মতো মনে হবে, আর বয়স্ক চিন্তাশীলদের এ গ্রন্থ যোগাবে চিন্তার খোরাক। সর্ব দেশের সর্ব বয়সের নরনারীদের এই গ্রন্থ আনন্দ দেবে, শিহরিত করে তুলবে। যে সব কথা কখনও শোনেননি সে সব কথা শুনুন। এই গ্রন্থে বেশ কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সে জন্যে মার্জনা চাইছি।

এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক উপাদান

ঐতিহাসিকেরা হারানো যুগের ইতিহাস রচনা করতে বসে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বিভিন্ন লিপি ও তাম্র শাসন, মুদ্রা, শিল্পকলা নিদর্শন, ধর্মীয় ও অন্যান্য সাহিত্য, পর্যটকদের বিবরণ, প্রভৃতির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেন। বিভিন্ন জায়গায় খনন করে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে প্রধানতঃ তার ওপর ভিত্তি করেই প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে। আমিও আমার এই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্য নিয়েছি অন্য গ্রহের মানুষ যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আসতেন তা প্রমাণ করবার জন্যে। আর নিয়েছি বিভিন্ন রকম মুদ্রা ও শিলালিপির সাহায্য। ইতিহাস পড়তে বা রচনা করতে গিয়ে আমরা যদি বিভিন্ন রকম মুদ্রা ও শিলালিপিকে বিশ্বাস করি এবং তাদের ওপর ভিত্তি করেই প্রামাণ্য সর্বজনগ্রাহ্য ইতিহাস রচনা করা যায় তাহলে মুদ্রা ও শিলালিপির সাহায্যে আমি যদি প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ আসতেন অন্য গ্রহ থেকে এ কথাটা প্রমাণ করতে পারি তা ঐতিহাসিক সত্য হবে না কেন?

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সব শিল্পকলার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে সে সব নিদর্শনের সাহায্যেও ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস রচনা করে থাকেন। তারা ধর্মীয় ও অন্যান্য সাহিত্যেরও সাহায্য নিয়ে থাকেন ইতিহাস রচনায়। এই গ্রন্থ রচনায় আমিও গ্রহণ করেছি ঐতিহাসিকদের এই দুটো উপাদানকে।

সমসাময়িক ইতিহাস রচনায় কিন্তু উপরোক্ত উপাদানগুলো কাজে আসে না। সমসাময়িক বা আধুনিক ইতিহাস রচনার প্রধান প্রধান উপাদান হলো সংবাদপত্র, পর্যটকদের বিবরণ এবং সমসাময়িক সাহিত্য। অন্য গ্রহের মানুষ যে এখনো আসেন আমাদের এই পৃথিবীতে এই বক্তব্যটাকে ঐতিহাসিক ভিত্তি দেবার জন্যে আমি বিভিন্ন পর্যটক, অভিযাত্রিক, ভূ-তাত্ত্বিক, সাংবাদিক, প্রভৃতির আশ্রয় নিয়েছি।

এ গ্রন্থ পড়ার আগে আপনাদের আরও কয়েকটা বিষয়ে সজাগ হওয়া দরকার। কারণ, অবিশ্বাসী মন নিয়ে এগুলে অনেক সত্য ঘটনাকেও কাল্পনিক মনে হতে পারে। অবিশ্বাসী সন্দেহবাতিকগ্রস্থদের অবিশ্বাস আর সন্দেহের কোন দাম আছে কিনা জানি না—কিন্তু যুগে যুগে অবিশ্বাসীরা

আগে ভাগে জোর গলায় অবিশ্বাস করেও পরে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি অনেক বৈজ্ঞানিকও অবিশ্বাস করেছিলেন মানুষ আকাশে উড়তে পারবে কিনা, চাঁদে যেতে পারবে কিনা; মানুষ যে চাঁদে যাবে কোন কোন বৈজ্ঞানিক'ত তা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কথা প্রসঙ্গে ড্রাগনদের কথায় আসি। চীন এবং ইন্দোচীনে ড্রাগনদের নিয়ে বিভিন্ন উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এসব ড্রাগনদের কথা কি কাল্পনিক? আমি আপনাদেরকে ড্রাগন দেখাতে পারি, নিয়ে যেতে পারি ড্রাগনদের দেশে।

দেশটা আমাদের এশিয়া মহাদেশেই। ইন্দোনেশিয়ার অদূরে কতকগুলো দ্বীপে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ইন্দোনেশিয়ায় ড্রাগনদের নিয়ে নানা রকম লোমহর্ষক গল্প তৈরী হয়েছে। জনৈক ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক এসব উপাখ্যানগুলোর একটা সংকলন প্রকাশ করলেন, উপহার দিলেন সভ্য সমাজকে। কিন্তু, তিনি নিজেই বিশ্বাস করতে পারলেন না যে ওসব উপাখ্যানগুলোতে বাস্তব সত্য কিছু থাকতে পারে।

পৃথিবীতে ড্রাগনের অস্তিত্বের কথা প্রথম বললেন একজন ইউরোপীয়, বৈমানিক। তার বিমানটা ভেঙ্গে পড়েছিল কামোডো দ্বীপপুঞ্জে। ১৯১২ শতাব্দীর কথা। বেচারীকে বলতে গেলে ড্রাগন পরিবৃত হয়েই থাকতে হয়েছিল কয়েক মাস। একদিন তিনি সভ্য সমাজে ফিরে এলেন, বললেন ড্রাগনদের কথা। সভ্য সমাজ বিশ্বাস করলো না তার কথা। পাগলের প্রলাপ বই তো নয়। ভদ্রলোক অবশ্য যখন ফিরে এসেছিলেন তখন অপ্রকৃতিস্থই ছিলেন, অনেকটা পাগলের পর্যায়ে।

১৯২৭ সালে আমেরিকার একদল অভিযাত্রিক ড্রাগনের ছবি তুললেন, পৃথিবী সে ছবি দেখলো। আঁৎকে উঠলো: এ্যাঁ, সত্যি!

১৯৬১ সালে ইন্দোনেশীয় বৈজ্ঞানিকদের আমন্ত্রণে চারজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী তো ধরেই নিয়ে এলেন কয়েকটা ড্রাগনকে। কামোডোতে পা দিতে না দিতেই কিন্তু আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা। অতি সুস্বাদু মনুষ্য মাংসের গন্ধে ওরা ছুটে আসলো। ঘেরাও করলো তাদের শিবির। ভয়ে তাদের গায়ের রক্ত জল হয়ে আসবার উপক্রম। এতো ভয়াবহ জন্তু তারা দেখেন নি। অতি উজ্জ্বল কমলা রঙের বিরাট একটা কাঁটার মতো জিব, অতিকায় ফণার মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকটা ঝলসে দিচ্ছিল যেন,—সে জিবটাকে মনে হচ্ছিল যেন আগুনের লেলিহান শিখা; কারখানার চুল্লি থেকে যে রকম

অগ্নি-শিখা বেরিয়ে আসে অনেকটা সে রকম।' ঐ জাতীয় দৈত্যদের চামড়া দেখতে বাদামী-কালো। তাদের আছে এক জোড়া শক্তিশালী পা। লেজটা কিন্তু ঝুলে থাকে মাটির সঙ্গে। অপরিসীম শক্তি নাকি সে লেজের। সামান্য একটু লেজের খোঁচায় নাকি সে বড় বড় শূকর আর হরিণকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। মানুষ তো খড়কুটো মাত্র॥ আর ওর চোয়ালগুলো যা শক্ত ও বড় বড়!—এক সঙ্গে সে পাঁচ কিলো-ওজনের মাংস তুলে নিতে পারে তার শিকারের শরীর থেকে। (২৭)

তাহলে রূপকথা উপাখ্যানে যে সব ড্রাগন দৈত্যদের কথা পড়ে থাকি, তাদের কথা মিথ্যে নয়!

পুরাণে, উপাখ্যানে, মহাকাব্যে আমরা নানা রকম গালগল্প শুনতে পাই। ইংরেজীতে যাকে বলে মিথ্ (myths) তাকে আমরা সহজ বাংলায় 'মিথ্যা' 'অতি কথা' বলে উড়িয়ে দিতে চাই। অর্থাৎ অতীতের ঐ সব 'কাহিনীকে আমরা আদৌ আমল দিতে চাই না। কিন্তু. অতীতের ঐ সব কাহিনীতে কি খাঁটি জিনিস, ঐতিহাসিক বিষয় বস্তু কিছুই নেই, সবিই কি কল্পনা? আলোচনা শুরু করা যাক্।

ছয় শত বছর আগের কথা। চীনা রাষ্ট্রদূত চৌ-ট্যা-কোয়ান্ মহামান্য চীনা-সম্রাটের কাছে রিপোর্ট করলেনঃ—আমাদের সাম্রাজ্যের দক্ষিণ দিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা অপূর্ব সুন্দর নগরী। চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। চীন সম্রাট সেই হারিয়ে যাওয়া নগরীটিকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানা নেই। কিন্তু, চীনা রাষ্ট্রদূতের সেই রিপোর্টটা যখন ছাপানো হলো ১৮৫৮ সালে, পশ্চিমী পণ্ডিতেরা হেসেই খুন—মাথা খারাপ, অলীক কল্পনা! কিন্তু, কিছুদিন পরই একজন ফরাসী নিসর্গবেদী প্রাণীতত্ত্ববিদ ইন্দোচাইনার 'আঙ্কোর থাম' আবিষ্কার করে সবাইকে চমকে দিলেন, পাশ্চাত্য সন্দেহবাদীরা তখন বিস্মিত। কল্পনাও তাহলে সত্যি হয়। হ্যাঁ, অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। লোকের মুখে যে বর্ণনা তার সঙ্গে আশ্চর্য মিল ঐ প্রাচীন মন্দির-শোভিত অপূর্ব নগরীর। আবিষ্কারকর্তা এ, এইচ, মৌহট সন্দেহবাদীদের সন্দেহ নিরসন করতে পেরে খুবই স্বস্তি বোধ করেছিলেন সন্দেহ নেই। মৌহট সাহেবকে ধন্যবাদ, শুধু অবিশ্বাসীদের মুখে চুণকালী মাখিয়ে দিলেন তাই নয়, ভারতবর্ষের মুখও উজ্জ্বল করলেন—ইন্দোচীনকে জগতের সামনে তুলে ধরে বললেন—এই দেখো, বৃহত্তর ভারতবর্ষ।'

'হোমারের কা [illegible] ীব কথা পড়েছি। যুগ যুগ এই ট্রয় নগরী [illegible] র আকাশের মতো নানা রং রূপ, এঁকে দিয়ে এ [illegible] য। সাত আট হাজার বছর আগের সেই ট্র [illegible] লেন। হেলেনকে কে না চেনে? সৌন্দর্যের বাণী [illegible] যব প্রতিমূর্তি। হাজা [illegible] বছর ধরে [illegible] প্রিয় রসিক চিত্তে [illegible] এসেছেন তিনি [illegible] সুন্দর বর্ণনা দিয়ে [illegible] হোমার তাঁর [illegible] দ্বীব পঞ্চাশ ষাট [illegible] ভাবতো মহা [illegible] বর্ণনা নিছক [illegible] কিছু নয। [illegible] থাকতে পা [illegible] ট্রয় নগরী [illegible] কোন নগরীর [illegible] পাবে এ [illegible] উঠতোই না [illegible] কল্পনে [illegible] কেউ থাক। তা [illegible] চেষ্টা [illegible] নবিচ. শ্রীমান ট্রয [illegible] যেন [illegible] —আমি মাটির নীচে [illegible] ট্রয় নগরীর ডাকে সাড়া [illegible] তিনি ছুটলেন এসিয়া মাই [illegible] সংকল্পের কথা শুনে বুদ্ধি [illegible] নিলে—পাগল। যতো সব [illegible] করে দিয়ে ১৮৭০ খৃস্টাব্দে [illegible] করলেন শ্রীমান। জগতকে [illegible] পৃথিবী চমকে উঠলো।

অতীতের [illegible]

হাজার [illegible] গ্রী [illegible] সক হেরোডোটাস্। তার একটা [illegible] যেছে যেখানে গ্রিফিনরা (যে কল্পিত জ [illegible] এবং দেহ সিংহের মতো) একটা [illegible] টায় লোকের বিশ্বাস জন্মানোর কোন যুক্তি নেই। [illegible] শুধু। কিন্তু, তাজ্জবের ব্যাপার, আধুনিক [illegible] সেই দেশটার খোঁজ পেয়েছেন [illegible] কিন্ স্থান্। বহুকাল ধরে সেখানে [illegible] র উপত্যকায় বৈজ্ঞানিকেরা একটা

।মরা মৎস্য-কন্যাব কথা পড়ে

সমৃদ্ধ সভ্যতা আবিষ্কার ক বলে যে কিছু আছে তা বিশ্ব গুলো সাজ-সজ্জা পোষাক পরিচ্ছদ আবিষ্কৃত ক্রব সৃষ্টি কেবল। কিন্তু, জেলে উপকথায় বর্ণিত গ্রিফিনের মতো। সুতরাং, ' এক বছরও হবে না। পোর্ট যে বাস্তবতাহীন নিছক গালগল্প তা মেনে নেও গাব করেছিল যেটার নাভী

লোহিত সাগবেব দক্ষি. ীর মতো দেখতে। না একটা পার্বত্য দুর্গেব কথা বলে গেছেন মনি সুন্দর, এমনি .এবং ইউসেবিউস। কালক্রমে কিন্তু, ঐ দুর্গটাকে সব । মিশরের এক রব মাঠেব মতো কিছু ভাবতো। কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দ র খোঁজ মিশবের হার্ড সেই গিরিখাতে প্র:বেশ করলেন। আবিষ্কাব করে নো উপকথা খোদিত একটা প্রাসাদ, একটা অ্যাম্ফিথিয়্যাটাব, এবং অনেক

ডিয়েগো ডি ল্যাণ্ডাব গল্প। ১৫৬ কথা। য়ুকাটানে একটা পবিত্র কুপ রয়েছে। সেখানে দোষীদের ছুড়ে ফেলা হতো, এবং সঙ্গে অনেক অলঙ্কার পত্র মহার্ঘ দ্রব্যাদিও। ঐতিহাসিকেরা কিন্তু য়ুকাটানের ঐ কুপটাকে কোন রকম ঐতিহাসিক মূল্যই দিতে চান নি, ভাবতেন নিছক একটা গল্পেব খোবাক বই'ত নয়। ও রকম গাঁজাখুরি গল্প'ত অনেকগুলোই আছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে আমেবিকাব বিখ্যাত কূটনীতিবিদ্ এবং পুরাতত্ত্ববিদ ই, এইচ, থম্সন আবিষ্কার কবলেন চিচেন ইজার কুপটা। প্রমাণ হলো উপকথাও মিথ্যা নয়।

বিসুভিয়স আগ্নেয়গিবির বিস্ফোরণের ফলে লাভাব নীচে তলিয়ে গিয়েছিল হার্কিউল্যাণীয়াম এবং পোম্পী নামে 'জাপানের দুটো নগবী। কিন্তু আজ থেকে আড়াই'শ বছব আগে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীবা ঐ নগবী দুটোব অস্তিত্ব মেনে নিতে চাইতেন না, ভাবতেন কাল্পনিক আজগুবি কথা সব। কিন্তু, পুরাতত্ত্ববিদবা যখন ঘুমন্ত নগরীদুটোকে বের করলেন মাটি খুঁড়ে তখন সাগ্রহে মেনে নিলেন সবাই—হ্যাঁ, তা হবে বৈকি, তা হবে।

এশিয়া ভ্রমণ শেষ করে মার্কোপোলো ফিরলেন ইউরোপে। ইউরোপবাসীকে তিনি বললেন কালো কালো পাথরের গল্প। চীনারা ঐ সব পাথর দিয়ে প্রত্যেকদিন স্নানেব জল গবম কবে। ভিনিসনগরবাসীদের তখন'ত হেসে কুটি কুটি হবার মতো অবস্থা। বলো কি হে, কালো পাথর আবার জলে! প্রত্যেকদিন গরম জলে স্নান করবার মতো বড সৌভাগ্যি পৃথিবীতে আর কার। (শীত প্রধান অঞ্চলে গরম জলে স্নান করতে পারা যে কতো বেশী

আরামদায়ক ত... ...রীর কথা পড়েছি বেশ ভালভাবেই জানে)।
মার্কোপলোর ... ...র আকাশের মধ্যেহল, উপহাস করেছিল মার্কোপলোকে। ... ...য়। সাত আবেই জানি কয়লা বেশ ভালভাবেই জ্বলে। ...কার ... ...লেন। হেলেন...ছিলেন ক্যাস্পিয়ানে ভূগর্ভ থেকে কিভাবে কা... ...সব ...র্যের প্রতিমূর্তি মার্কোপলোর ঐ সব গল্প শুনে ভিনিসবাসীরা চমৎ...কি ...প্রিয় রসিব... হয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের কাছে ঐ স...ষয়ের ... সুন্দর ব... কাঠখোট্টা সত্যি ঘটনা —কল্পনা নেই, রোমা...ংশ শতাব্দীর পক্ষ

ভিনিসবাসীরা না... ...রীর বর্ণনা ... ...চারী ভণ্ড বলে উপহাস করেছিল সেই মধ্যযুগে ... থাব ...ক যুগে আমরা যখন নতুন কোন জিনিসের নাম শুনেছি তখন ... জিনিসের খবর যে দিয়েছে তাকে আমলই দিই নি, ডেকেছি তাকে মিথ্যুক, করেছি তাকে উপহাসাস্পদ। এমনকি ভদ্রমহিলারাও বাদ পড়েন নি। কিন্তু, ওরা যে সত্যি কথা বলছেন সেটা প্রমাণ যখন হয়েছে ...? ম্যাডাম মেরি... ন পাখী-খেকো মাকড়শার বর্ণনা দিয়েছিলেন। ... ...জ তার বর্ণনা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু, সে জাতীয় মা... ...খন খুঁজে পাওয়া গেছে দক্ষিণ আমেরিকায় এবং আমাদের দেশে ... ...প।

একই ভাবে উ... ...রা অভিযুক্ত করেছিলেন অওডুবনকে। তিনি বলেছিলেন কুমুদ ফুল... ...। সেটা ... তার 'দক্ষিণের পাখী' নামক বইতে অভিহিত করেছেন ... ...নামে। মিথ্যাচারীর অপবাদ নিয়ে দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছিল ... ...ে তার বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত হলো যখন ঐ হা... ...ল খুঁজে পাওয়া গেল ফ্লোরিডাতে। (৩২)

ভিক্টর ... ...অপমান সইতে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ... ...মাছের কথা। তিনি বর্ণনা দিয়েছিলেন কি ভাবে এ... ... অসহায় ভাবে মাছটার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হ... ...অবিশ্বাস্য রকমের কথা। কেউই বিশ্বাস করতে চা... ...রের মধ্যেই হুগোর বর্ণনা সম্মত মাছটা পাওয়া ... ...উপকূলে। কাটল্ ফিস্ ত্রিশ ফুট বিস্তৃত পাখা বিস্তার ... ...এবং ... ...াই বড় বড় নৌকাগুলোকেও টেনে নিতে পারে ... (৩৩)

বিভিন্ন উপাখ্যানে আমরা মৎস্য-কন্যার কথা পড়েছি। এক সময় মানুষ হয়তো মৎস্য-কন্যা বলে যে কিছু আছে তা বিশ্বাসই করতো না। ভাবতো মানুষের উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্টি কেবল। কিন্তু, জেলেরা ত' ও রকম জীব খুঁজে পেয়েছেন সমুদ্রে। এক বছরও হবে না। পোর্টব্লেয়ারের উপকূলে জেলেরা এমন একটা প্রাণী শিকার করেছিল যেটার নাভী থেকে পা পর্যন্ত সব কিছুই একটা সুন্দরী নারীর মতো দেখতে। পায়ের নোখ থেকে গোড়ালি, উরুদেশ সব কিছু এমনি সুন্দর, এমনি নিখুঁত। কোমরের উর্ধাংশ কিন্তু মাছের মতো দেখতে। মিশরের এক সংবাদ পত্রেও খবর বেরিয়েছিল পাওয়া গেছে মৎস্য-কন্যার খোঁজ মিশরের নীল নদীতে। অর্ধেক নারী, অর্ধেক মাছ। অতএব পুরোনো উপকথাগুলোকে হেসে উড়িয়ে দিই কি করে?

কোনটা ইতিহাস, কোনটা উপাখ্যান? পুরাণ কাহিনী উপাখ্যানগুলোও যে ইতিহাসের খনি সে বিষয়ে ক্রমশঃ বেশী করে সচেতন হয়ে উঠেছেন বৈজ্ঞানিক মহল। আমেরিকার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পদার্থবিদ ডঃ কার্ল স্যাগন ব্যাপারটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে লা পিরাউজ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম ভাগে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। রেড্ ইণ্ডিয়ানদের উপাখ্যানগুলো সে ঘটনাটাকে ঠিক ঠিক ধরে রেখেছে। সেই জাহাজের বর্ণনা, সেই চেহারা, সেই পোষাক। সবকিছু সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ঠিক ঠিক। একটা ঐতিহাসিক ঘটনা যে লোকের মুখে মুখে এইভাবে বেঁচে থাকতে পারে উপাখ্যান হয়ে এটে তার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য কল্পনার রঙ চড়েছে এইটুকু, বংশ পরম্পরায় আসল ঘটনাটা বিকৃতি লাভ করেছে একটু আধটু।

গোয়াতেমালার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও নানা রকম সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান প্রচলিত আছে—সব দেব-দেবীর উপাখ্যান। ঐ সব উপাখ্যান-গুলোর জন্ম ষোড়শ শতাব্দীতে। ওক্লাহামা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্ন তুললেন:— ব্যাপারটা কি? তারা উপাখ্যানগুলোর অতলে ডুব দিলেন—রহস্যের খোঁজে। রহস্যের খোঁজ পেলেন। রহস্যজনক ঐ সব দেব-দেবীরা আর কেউ নয়। স্পেনের আক্রমণকারী দস্যুরা।

মধ্যযুগের উপাখ্যানগুলোর না হয় রহস্য উন্মোচিত হলো। কিন্তু, সেই যে ইন্‌কা, আজটেক, ম্যায়াদের শ্বেত দেবতারা যাঁরা সেই সুপ্রাচীন যুগে

খেয়ালের বশবর্তী হয়ে কিংবা অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে এসব অতিমানব রাজ রাজরাদের কথা লিখে যাবেন ইতিহাসের পাতায় তা কখনো হতে পারে না। ওঁদের কথা লিখে যাবার আগে তিনি নিশ্চয় মানুষের আগে যে তিনটি দেবতাদের রাজবংশ পৃথিবীতে রাজত্ব করে গিয়েছিলেন তাদের সম্বন্ধে খুব ভাল করেই গবেষণা করেছিলেন। এই তিনটে রাজবংশের মধ্যে একটি হলো পূর্ণ দেবতাদের, অন্যটা দেবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষদের, তৃতীয়টা বীরপুঙ্গব অথবা দৈত্যদের। মিশরের পুরোহিতরা নাকি হেরোডোটাসকে কতকগুলো কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি দেখিয়েছিল। সে মূর্তিগুলোর সংখ্যা তিনশো পঁয়তাল্লিশ। ঐ সব মূর্তিতে খোদাই করা ছিল প্রত্যেকটা রাজার নাম, ইতিহাস, ইতিবৃত্ত। (৩৪)

এ ব্যাপারে আমাদের পুরাণের সাহায্য নিলে বলতে হয়, এই তিনটে রাজবংশের প্রথমটা দেবতাদের, দ্বিতীয়টা কিম্পুরুষদের, তৃতীয়টা দানব অথবা দৈত্যদের। দেবতারা তখন নাকি নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতেন: দেবত্ব আমরা চাই না। ভারতবর্ষের মতো পূণ্যময় দেশে আমরা যদি জন্মগ্রহণ করতে পারি ত' জীবন সার্থক। আমরা বেশ ভালভাবেই জানি পুরাণে ভাগবতে মহাকাব্যে যে সব ভারতীয় রাজ রাজরাদের নাম লেখা আছে তারা সবাই স্বর্গের দেবতা। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির, পাণ্ডু, এবং অন্যান্য সব আদর্শ রাজাদের সবাই হয়তো শাপভ্রষ্ট দেবতা, নয়তো তারা স্ব-ইচ্ছায় ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ ছাড়া যে সব রাজাদের নাম আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় পাচ্ছি, তারাও ছিলেন ধর্মপ্রাণ—রাজা বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন সবাই নিজেদেরকে মনে করতেন দেবতাদের প্রতিনিধি। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনই ছিল তাদের পরম ধর্ম। প্রজাপালনই ছিল তাদের জীবনের ব্রত। পুরাণ মহাকাব্য থেকে আমরা অসুরদের রাজত্বের কথাও জানতে পারি। রাজা রাবণ, তার পূর্বপুরুষেরা, মহীপাল, কংস সবাই ছিলেন দানব বা অসুর প্রকৃতির।

পৃথিবীর সব সুপ্রাচীন সভ্য দেশগুলোর দেবতাদের রাজত্ব সম্বন্ধে যে বিশ্বাস ও ঐতিহ্য প্রচলিত রয়েছে সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বেইলী বলছেন:—

'এই দেশগুলোর বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য ও মিলের কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ভারতবর্ষের দেবতা, পারস্যের পেরিস,

চীনের টিয়েং হোয়াঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে মিশর এবং গ্রীসের অতি মানব—রাজাদের একই শাসন, একই প্রতিপালন, একই আদর্শ।'

এবং প্যানডোরাসের মতেঃ—'বাইবেলে বর্ণিত মহা জলপ্লাবনের আগে হাজার হাজার বছর ধরে রাজত্ব করতেন সাত সাতজন দেবতা। তাঁদেরই রাজত্বকালে অবতীর্ণ হন দার্শনিক, বিজ্ঞানী, মহাকবি ঋষিরা। তাঁরাই মানুষকে শিক্ষিত সুসভ্য করে তোলেন।

আমাদের পুরাণে আছেঃ 'যে সব ফল ফসল এবং শস্যের কথা সেকালে মানুষের কাছে অজানা ছিল সে সব ফল ও শস্যের বীজ আমদানি করেন দেবতারা পৃথিবীতে যাতে অন্য পৃথিবী থেকে তারা যাদের প্রতিপালন করছেন তাদের অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় প্রজাপুঞ্জের উপকার হতে পারে।'

কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন কোন ফসল, কোন শস্যটা পৃথিবীর অজানা ছিল? আমি তাদেরকে শুধু একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আজকে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই গমের ওপর নির্ভরশীল। গম না থাকলে পৃথিবীর মানুষের জীবন ধারণও দুষ্কর হয়ে উঠতো। এই গম কে আবিষ্কার করলো? পৃথিবীর মানুষ? না দেবতারা অন্যগ্রহ থেকে এনে তুলে দিলো মানুষের হাতে? গমকে বন্য অবস্থায় আবিষ্কার করতে পারেন নি পৃথিবীর কৃষি-বিশেষজ্ঞরা। অন্যান্য খাদ্য ফসলের উৎপত্তির সূত্র খুঁজে পেয়েছেন উদ্ভিদবিদরা বনে জঙ্গলে জন্মানো নানা রকমের ঘাসের মধ্যে। শুধু গমের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম কেন?

গম স্বর্গীয় তাই বলে কি মিশরীয় পুরোহিতরা তাকে এতো পবিত্র মনে করেন? পিরামিডের মধ্যে মমিগুলোকে সংরক্ষণ করবার সময় তার সঙ্গে সযত্নে কতকগুলো গম রেখে দিতো মিশরবাসীরা শুধু কি এ কারণেই? ভূট্টা এলো পৃথিবীর বুকে কোত্থেকে? বিজ্ঞানীদের কাছে বিরাট জিজ্ঞাসা।

মিশরের দেবী আইসিস মিশরবাসীকে ডেকে বলছেনঃ—'শোন তোমরা, আমিই এই অঞ্চলগুলোর রাণী। হে মানুষ, তোমাদেরকে আমিই সর্বপ্রথম গম এবং অন্যান্য শস্য উপহার দিয়েছিলাম। তোমরাই যে আমার সেবাপুষ্ট সে জন্যে ধন্য মনে করো নিজেকে।'

মিশরে আইসিস দেবী রাজত্ব করতেন আজ থেকে প্রায় ৭৫০০০ বছর আগে। ডেনডেরা মন্দিরের ছাদের ভাস্কর্য-শিল্প থেকেই এ তথ্য জানা যায়।

চীনের ঈ-কিঙ্গ'ও কৃষিকার্যের আবিষ্কারের জন্যে মানুষকে কৃতিত্ব

দেবার পক্ষপাতি নন। তার মতে অপার্থিব বুদ্ধিমান দেবতাদের উপদেশানুসারেই মানুষ কৃষি কার্যে হাত পাকা করে।'

পুরাণ, উপাখ্যান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে আদি যুগে মানুষের আগে পৃথিবীতে রাজত্ব করতেন দেবতারা। এখন পুরাণ উপাখ্যানগুলোকে আমরা বিশ্বাস করবো কেন? আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক, পুরাতত্ত্ববিদ এবং পণ্ডিতরা অনেকগুলো উপকথা উপাখ্যানের বাস্তব অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে ?

লোক কথার মধ্যে ছড়িয়ে আছে নানা রকম ঐতিহাসিক উপাদান। এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি আগে এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এই পরিচ্ছদের প্রারম্ভে। বিভিন্ন দেশের লোক কথায় ছড়িয়ে আছে বাইবেলে বর্ণিত মহাপ্লাবনের পর নতুন করে পৃথিবীর সৃষ্টি হবার কথা। মহাপ্লাবনের পরও যখন নতুন করে সৃষ্টির দামামা বেজে উঠলো পৃথিবীতে তখনও নাকি দেবতারা নেমে এসেছিলেন পৃথিবীর মানুষকে সু-সভ্য করে তুলতে। ব্যবিলনের উৎকীর্ণ ফলক থেকে জানা যায়ঃ—'মহাপ্লাবনের পর দেবতারা নেমে আসলেন পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন বলে।'

ব্যবিলনের ঘটনাপঞ্জী লেখকরাও প্রাগৈতিহাসিক রাজাদের একটা ফর্দ রেখে গেছেন। কিন্তু, আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকেরা সে তালিকাকে নির্ভরযোগ্য মনে করতে পারেন নি। কারণ, রাজন্যবর্গের তালিকায় কয়েকজন দেবতা এবং আধা দেবতার নাম ছিল। তাছাড়া সে ঘটনাপঞ্জীতে উল্লেখ আছে প্রথম রাজবংশের রাজারা রাজত্ব করেছিলেন সুদীর্ঘ ২৪১৫০ বছর। ব্যাপরটা ঐতিহাসিকদের মোটেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের আগে পর্যন্ত ঐতিহাসিকেরা এমন কোন প্রমাণ পাননি যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারেন যে অষ্টম রাজবংশের আগে পর্যন্ত ব্যবিলনে কোন রাজবংশ রাজত্ব করতেন। তারপর যেন পূর্ববর্তী রাজবংশের রাজারা কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে পাঠালেন স্যার লিউনার্ড উলীকে সন্দেহবাদীদের সন্দেহ নিরসন করবার জন্যে। মিস্টার উলী উরের আল-উবাইড পর্বতে একটা সুপ্রাচীন মন্দির আবিষ্কার করলেন। মন্দিরটা ছিল দেবী নিন্-খরসাগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত। সে মন্দিরে পাওয়া গেল একটা সোনার জপমালা। সেখানে একটা নাম লেখা ছিলঃ—রাজা অ-ন্নি-প-দ। পরবর্তী পর্যায়ে একটা ভিত্তি-প্রস্তর আবিষ্কৃত হলো—সেখানে

লেখা ছিল :—আমি উরের রাজা অ-ন্নি-প-দ, পিতা মেস্ অন্নি পদ, মহা-দেবীর উদ্দেশ্যে এই মন্দির উৎসর্গ করছি। (৯৮)

এখন ব্যবিলনের ঘটনাপঞ্জী লেখকরা যে নামের তালিকা রেখে গেছেন তার থেকে জানা যায় রাজা মেস্ অন্নি পদ ছিলেন তৃতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মেস্ অন্নিপদের নাম অনেক লোক গাঁথায় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকেরা সে নামটাকে কাল্পনিক মন গড়া বলে ভেবে এসেছিলেন এত কাল, সত্যকে অস্বীকার করে এসেছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় প্রাচীন কালের সব কিছুকে নিরীহ সরল লোকগুলোর মুখের বাচালতা মাত্র মনে করার মানসিকতা সত্যান্বেষীদের পক্ষে মিথ্যান্বেষণের কৃত্রিম প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।

মহাকাশের মানুষ আসেন

১৯০৮ সালের ৩০শে জুন। সাইবেরিয়াতে ঘটেছিল ঘটনাটা। ইনীসী নদীর ওপর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। হিরোসিমা নাগাসাকির ওপর বোমা ফেলেছিল আমেরিকা। তার চেয়েও ভয়ংকর প্রচণ্ড রকমের বিস্ফোরণ। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা কয়েকটা শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটলেই ওরকম প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হতে পারে, সৃষ্টি হ'তে পারে ওরকম ধ্বংসলীলার। সে সময় চারদিকটা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আকাশ জুড়ে বিচিত্র রকম সব পদার্থ—অপার্থিব। সাত'শ মাইল দূরে সেই বিস্ফোরণের শব্দ শুনে চমকে উঠেছিল মানুষ। প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটায় মুখ থুবরে পড়েছিল মানুষ এবং পশু। ভ্যানভোরার একজন লোক ঐ বিস্ফারণের পূর্বে দিব্যি আরামে দাওয়ায় বসে সিগারেট ফুঁকছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলেন—কানফাটা শব্দ। একটা তীব্র উত্তাপে ঝলসে উঠলো তার শরীরটা। ছিটকে পড়লেন তিনি কয়েক গজ দূরে। ঐ ভ্যানভোরা জায়গাটা ছিল ঘটনাস্থল থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। ভীষণ আহত অবস্থায় কোনমতে প্রাণে বেঁচেছিলেন ভদ্রলোক। তার পরই প্রচণ্ড ভূ-কম্পন। সেই সময় সাইবেরিয়া রেলপথের একজন ইঞ্জিনীয়ার ট্রেন থামিয়ে ফেলেছিলেন পাছে ছিটকে পড়ে রেল লাইন থেকে।

১৯ বছর অবধি কেউ ঘটনাস্থলে পৌঁছুতে পারেনি। ১৯২৭ সালে অনেক বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এল-এ কুলিক নামে একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী। দেখতে পেলেন বিরাট এক ধ্বংসস্তূপ। আমাদের কোলকাতা এবং তার সহরতলীর মতো এক বিরাট এলাকা ধ্বংস স্তূপে পরিণত। কোন কোন জায়গায় বনভূমি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। বল্গা হরিণ এবং অন্যান্য জন্তুদের বংশ নির্বংশ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সেখানে তারা অনতি বিলম্বে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পেলেন। সরে পড়লেন ভয়ে ভয়ে। এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিকেরা ১৯৬৩ সালেও। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখলেন সাইবেরিয়ার ঐ বিশেষ অঞ্চলটার তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবস্থিতি আশ পাশের অন্যান্য অঞ্চলগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশী। তারা ১৯০৮ সালের সেই

ঘটনাটার প্রত্যক্ষদর্শী খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলেন। পেলেন কয়েক-জনের খোঁজ। তারা স্বীকার করলে:—হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য রকমের একটা কাণ্ড কারখানা প্রত্যক্ষ করেছিল তারা সেদিন। প্রথমে আকাশ ফাটানো শব্দ, তারপর আকাশ ধাঁধানো আলো, তার পরে মেঘে মেঘে চারদিক আচ্ছাদিত—একটা ভুতুরে অন্ধকারের রাজত্ব। পারমাণবিক বিস্ফারণ ঘটলে ঠিক এমনটিই হয়। যারা এ ঘটনা স্ব-চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের অনেকেই নাকি কয়েক বছরের মধ্যে মারা পড়েছিল। তেজস্ক্রিয় পদার্থের শিকার হয়ে তারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল লিউকোমিয়া জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে।

বিস্ফোরণটা ঘটালো কারা? নানারকম জল্পনা কল্পনা চললো এ নিয়ে। সোভিয়েত রাশিয়া এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা নানা জনে নানা ব্যাখ্যা দিলেন। বিস্ফোরণের পর যে বিরাট লম্বা একটা পুচ্ছ থেকে গিয়েছিল সেটা ধরেই কি পদার্থটা হাওয়া হয়ে গেছে আকাশে? ঐ আলোক পুচ্ছের সঙ্গে যদি এই বিস্ফোরণের কোন সম্পর্ক থাকবে তাহলে সম্প্রতি যে গবেষণা চালানো হলো কম্পিউটারের সাহায্যে তাতে কেন প্রমাণিত হলো বস্তুটা ওপরের দিকে এবং চতুর্দিকেই তার প্রচণ্ডতার স্বাক্ষর রেখে গেছে? বিস্ফো-রণের পর কেন প্রচণ্ড ভূ-কম্পন, ইলেক্ট্রোস্টাটিক এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক গোলযোগ অনুভূত হয়েছিল পৃথিবীর সর্বত্র? থার্মোনিউক্লিয়ার এ্যাক্সপ্লোসন বা বিস্ফোরণ ঘটলে পৃথিবী ব্যাপী যে প্রতিক্রিয়া হতো এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রশ্নগুলো তুলেছেন জ্যাক্স বার্জিয়ার।

বোস্টন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেরাল্ড এস্-হকিন্স বললেন:—অন্য কিছু নয়। বিরাট একটা উল্কাপাত। বাইবেলের সোডোম এবং গোমোরাহ নগরী দুটো ধ্বংসের বর্ণনা পড়েছেন নিশ্চয়। ওদুটো নগরীর ওপরেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো উল্কা পড়েছিল। কিন্তু আমার মতে হাইড্রোজেন বোমার মতো শক্তিধর যদি এহেন উল্কাপাত বিরাট বিরাট নগর নগরীগুলোকে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির নীচে তলিয়ে দিতে পারে'ত ঐতিহাসিক কোন নগর নগরী কেন এ হেন উল্কাপাতের ফলে ধ্বংস হলো না! উল্কাপাত'ত যখন তখন ঘটে। এর ফলে'ত জনপদ নগর নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে। কিন্তু, কোন ঐতিহাসিক এ ধরণের ঘটনার নজির রাখতে পারেন কি?

আমার এই প্রশ্নের উত্তর হকিন্স সাহেব নিজেই দিচ্ছেন। পৃথিবীর লোক সংখ্যা যতো বৃদ্ধি পেয়েছে, উল্কাপাতের ঘটনাটা ঘটে চলেছে ততো

বেশী। তবে উল্কাপাতের ঘটনাটা এখন একটা সংপৃক্ত মুহূর্তে এসে পড়েছে। গড়ে পৃথিবীর বুকে প্রতিদিন তিনটে থেকে চারটে উল্কাপাত ঘটে চলেছে। গত পাঁচ বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবী বক্ষে কোটি কোটি টন পরিমাণ উল্কাপাত ঘটেছে। তবু হকিন্স সাহেব আমাদেরকে প্রবোধ দিচ্ছেন আমরা যেন ঘাবরে না যাই। কারণ এ উল্কাপাতের ফলে আমাদের সমূহ ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রথমতঃ বড একটা উল্কা যদি তোমাকে আঘাত করে তাহলে তার প্রভাব হবে আকস্মিকভাবে প্রজ্বলিত একটা অগ্নিশিখার মতো। সেটা তোমাকে খুব দ্রুত এড়িয়ে যাবে; দ্বিতীয়তঃ—ওটার দ্বারা আঘাত পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। আধুনিক যুগে উল্কার আঘাতে কেউ যে আহত হয়েছে তার নজির নেই বললেই চলে। তারপরই তিনি বলেছেন আমাদের ভারতবর্ষের একটা ঘটনার কথা। ই-এফ্., ক্ল্যাডনী (Chladni) নামক এক ভদ্রলোকের লেখা থেকে তিনি জেনেছেন একটা উল্কা একটা মানুষ খুন করেছে এবং একজন মহিলাকে আহত করেছে। ঘটনাটা ১৮২৫ সালের। বাইবেলের সোডোম এবং গোমরাহ্ নগরী দুটো যে উল্কাপাতের ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে একথাটা হকিন্স সাহেব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেও (Certainly the people of Sodom and Gomorrah were smashed and incinerated by a meteorite। মিষ্টার ক্ল্যাড্নীর বলা ঘটনাটা কিন্তু তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। ব্যাপারটাকে তিনি স্রেফ্ অস্বীকার করে বসলেন, বললেন ;—Chladni was probably exaggerating a little, as no stone was produced and the evidence is not conclusive.' অর্থাৎ ক্লাড্নী একটু বাড়িয়ে বলেছেন। কোন পাথরই তিনি দেখাতে পারেননি, সুতরাং তার বক্তব্য যে ঠিক এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। (১) কোথায় সোডম আর গোমোরাহ নগরীর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া আর কোথায় একটি মাত্র লোকের মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া, একজন ভদ্রমহিলার আহত হওয়া! ব্যাপারটা কি? সোডম এবং গোমোরাহ্ নগরী দুটো যে উল্কাপাতের ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এটা প্রমাণ করবার মতো জোরালো যুক্তি তার আছে কি? ই-এফ্., ক্ল্যাডনী না হয় পাথর দেখাতে পারেন নি, কিন্তু তিনি কি সেই উল্কার প্রস্তর খণ্ডের নমুনা দেখাতে পারেন যার প্রকোপে পড়েছিল সোডম ও গোমোরাহ।

বস্তুত, সোডম এবং গোমোরাহ নগরী ধ্বংসের এমন একটা হাস্যকর কারণ তিনি দেখাচ্ছেন, সেই সুদূর অতীতে যে কোন শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল তা তিনি মেনে নিতে পারছেন না বলেই।

সাইবেরিয়ার ঐ বিস্ফোরণটা যে উল্কাপাতেই ফলেই. তাইবা হকিন্স সাহেব নিশ্চিত হয়ে বলছেন কি করে? কোন পাথর কি উদ্ধার করতে পেরেছেন ঐ জায়গা থেকে? উল্কাপাতের ফলে গর্ত হয়। কিন্তু, সাইবেরিয়ায় কোন গর্তই আবিষ্কার করতে পারেননি বৈজ্ঞানিকেরা। তাদের চোখে পড়েছিল অবশ্য কতকগুলো ছোট খাট জলভর্তি গর্ত। কিন্তু সেগুলো পরীক্ষা করে দেখে তারা জানতে পারলেন ওগুলো উল্কাপাতের সৃষ্ট গর্ত নয়, সাইবেরিয়ার তুষার পাতের সৃষ্ট গর্ত।

বস্তুতঃপক্ষে বৈজ্ঞানিকেরা তাদের সামান্য সীমিত বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে চান। অনেক সময় তারা যে হাস্যকর যুক্তির অবতারনা করেন তাও প্রমাণিত হলো উপরোক্ত আলোচনায়।

মস্কোর বিজ্ঞান—পরিষদ এই ঘটনা সম্পর্কে যে রিপোর্ট বের করলেন তাতে বলা হলো:—ওটে হয়তো একটা মহাকাশযানের বিস্ফোরণ। অন্য কোন গ্রহ থেকে এসেছিল। বিস্ফোরণটা ঘটবার আগে মহাকাশযানের অনেকেই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয় এবং তারা আমাদের মধ্যেই হয়তো মিশে আছেন এখনো।(২) সোভিয়েত বিজ্ঞানী আগরেস্ট অবশ্য এ ঘটনার অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে সে সম্বন্ধে বলছি।

১৯১৩ সালে অদ্ভুত দর্শন একটা বস্তু দেখা গিয়েছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। কিছুক্ষণ পরেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অন্যগ্রহ থেকে মহাকাশযান যে আমাদের গ্রহে আসতে পারে সেটা কি নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার? অন্যগ্রহে যে সভ্য উন্নত জীবন নেই সে বিষয়ে দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করতে পারে কি আধুনিক বিজ্ঞান?

টোরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সি. এ চাণ্ট তিন মিনিটেরও অধিক কাল ধরে আকাশে উজ্জ্বল কতকগুলো বস্তু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে ঘুরছিল। প্রথম দলে ছিল চারটে, দ্বিতীয় দলে ছিল তিনটে, তৃতীয় দলে দুটো। একদল অন্য দলকে অনুসরন করছিল। এদের কেউ কেউ এতো নীচে নেমে এসেছিল যে সুপারসনিক এয়ারপ্লান উড়বার সময়

যে রকম একটা 'সোনিক বুমের' সৃষ্টি হয় ঠিক সেই রকম একটা শব্দ হচ্ছিল। তারা আড়াআড়ি ভাবে উড়ছিল, গতিবেগও খুব বেশী ছিল না।

অন্য একজন নক্ষত্রবিদ্—নাম ডব্লিউ এফ্‌. ডেম্নিং, রয়্যাল এ্যাসট্রোন-মিক্যাল সোসাইটি অব্‌ ক্যানাডায় একটা বক্তব্য রেখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন আকাশে তিনি দেখেছেন একটা উজ্জ্বল বস্তু—ওটা দেখতে রাত্তিরের আলোক সজ্জিত রেলগাড়ীর মতো—অনেকগুলো আলোকোজ্জ্বল জানালা—আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল আলোক দ্যুতি বিচ্ছুরণ করতে করতে। ক্যানাডার দিক থেকে উড়ে এসে বস্তুটা বার্মুডাসের আকাশের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়েছিল ব্রাজিলের দিকে। সে সব অঞ্চলে কেউ অতো কৌতূহল নিয়ে বস্তুটাকে চোখে চোখে রাখেনি বলে সেটা কোথায় যে নেবে গিয়েছিল কিংবা আকাশের কোন দিকে কোন প্রান্তে আত্মগোপন করেছিল তা এখন আর কেউ বলতে পারছে না।

নক্ষত্রবিদ্‌দের কেউ কেউ বললেন;—ওটে কিছু নয়। কয়েক জোড়া ধূমকেতু স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক উপগ্রহে পরিণত হয়েই ঐ অলৌকিক কাণ্ডের অবতারণা করেছিল। এ নিয়ে আর ভাববার কি আছে? যারা একটা মুখোসের আড়ালে আত্মগোপন করতে চান, যারা হিসেবের গণ্ডির বাইরে পা ফেলতে ভয় পান তারা এ ভাবেই সব কিছুকে হাল্কা করে দেখেন। যে জিনিসটা যুক্তি তর্ক দিয়ে সঠিক ভাবে বোঝানো যায় না সেটাকে তারা অলিক তুচ্ছ ব্যাপার বলে হাসাহাসি করেন, নয়তো সেটার এমন একটা ব্যাখ্যা দেন যার কোন মাথা মুণ্ডু নেই। জ্যাক্স বারজিয়ার তাই প্রশ্ন তুলছেন কোন প্রাকৃতিক উপগ্রহ যদি পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে সেটা কি সঙ্ঘর্ষের ফলে শক্তিহীন হয়ে পড়ে না? শক্তিহীন হয়ে পড়লেই কি সেটা পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়বে না? কিন্তু, ঐ বস্তুটা'ত পড়েনি পৃথিবীর কোথাও। এ ছাড়া ওটে যদি একটা উপগ্রহ হতো তাহলে কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে কি একানব্বুই মিনিট পরে সেটে আবার আমাদের চোখে পড়তো না? তৃতীয়তঃ, জিনিসটা যে কি সেটা আদৌ দেখা যায় নি। পাশের আলোগুলো চোখে পড়েছিল মাত্র। তাহলে কি রকেট জেট্ ফ্লেইম্‌স? অথবা প্ল্যাজমা? অথবা ফোটোনিক প্রোপেলারের ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত এ্যাটমোস্‌ফিয়ারিক ফ্লুওরিসেন্স? সঠিক উত্তর দেওয়া মুশকিল। তাছাড়া, এরা ইচ্ছে মতো নীচে নেবে আসতে পারে সোনিক বুমের

সৃষ্টি করে, আবার প্রচণ্ডগতিতে উর্ধে উঠে যেতে পারে। কোন পার্থিব বস্তু'ত এটে পারে না। আর পার্থিব কোন উপগ্রহ হলেই বা ১৯১৩ সাল নাগাদ যে উপগ্রহের মতো বস্তুটাকে দেখা গিয়েছিল সেটা কি পৃথিবীর? তখন পৃথিবীর কোন্ সুসভ্য জাতি রকেট তৈরী করেছিল? রকেট, মহাকাশযান প্রভৃতি কোন জিনিসের নামই পৃথিবী জানতো না তখন, মহাকাশে ওড়া ছিল তখন একটা হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো অলৌকিক ব্যাপার।

১৯৫৮ সালের বিকেল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একজন ভূতত্ত্ববিদ্ তার একজন বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। বেশীদূরে অবশ্য যাননি। শিবির থেকে কিছু দূরে অ্যান্টার্কটিকার নোক্স উপকূল অবধি। তারা অলস আলসে পথ চলছিলেন। গল্প গুজব করছিলেন, কোন কোন সময় নানা বিষয়ের ওপর আলোচনা চালাচ্ছিলেন আপন মনে। এক কিলোমিটার পথ যেতে না যেতেই তারা দেখলেন একটা সাদা আলোকের প্রচণ্ড ঘূর্ণি তাদের চোখের সামনে। একজন আর একজনকে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: ব্যাপারটা কি! আবহাওয়ার কোন গোলযোগের ফলে'ত এ রকমটি হওয়ার কথা নয়। কারণ সেদিন আকাশ ছিল বেশ পরিস্কার—সুন্দর ঝকঝকে দিন। আকাশ সম্পূর্ণ নীল, মেঘের আনা গোনা সম্পূর্ণ বন্ধ। হাওয়ার গতিও মৃদুমন্দ, তাহলে! ....ওরা ঠিক বুঝে উটতে পারলেন না ব্যাপারটা কি। একজন অন্য জনকে জিজ্ঞেস করলেন: জাপান অথবা রাশিয়ার কোন শিবির এদিকে আছে কি? (বলা বাহুল্য, ১৯৫৮ সাল ছিল ইণ্টার-ন্যাশন্যাল জিওফিসিক্যাল ইয়ার) ওরা কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন না'ত! কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তো মুশকিল। হয়তো কোন বিপদেই পড়েছেন তারা। দেখা যাক্ ব্যাপার কি। যাওয়া যাক তাড়াতাড়ি।' যখন বিশেষ জায়গাটায় গিয়ে তারা পৌছুলেন তখন তারা দেখলেন এক জাতীয় উচ্চ সাদা আলোর ঝরণা ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। তাদের উচ্চতা অনেকটা। কি রকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলেন তারা। তবে কিসের গন্ধ, কি জাতীয় গন্ধ সেটা বুঝে উঠতে পারলেন না সঠিক। সেই আলোকের ঝরণায় উর্ধাংশে তারা দেখতে পেলেন গম্বুজাকৃতি একটা জিনিস—দু'মিটার উচ্চতা। পরিধি আট থেকে দশ মিটার—উজ্জ্বল কাঁচের মতো জ্বল জ্বলে দেখতে।

আমেরিকার প্রখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ মহাশয় ভেবেছিলেন—ওটে হয়তো ভূ-অভ্যন্তরের আগ্নেয় লাভার কারসাজি। তিনি কিছু একটা আবিষ্কারের আশায় সেই দিকে ছুটে গেলেন। কাছে গিয়েই মনে হলো কে যেন তার আগে গিয়েই সেখানে উপস্থিত। পরক্ষণেই তিনি দেখলেন একজোড়া মূর্তি। ওরা ছিল চলমান। কিন্তু একটু পরেই তার গায়ের রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার উপক্রম—কারণ ওরা মানুষ নয়, দেখতে গোলাকার, রঙ হলদে রকমের, উচ্চতা এক মিটারের থেকে বেশী হবে না—অনেকটা বেলুনের মতো দেখতে—কিন্তু তুষারের সঙ্গে মিশেই ছিল বলে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তদুপরি ঘুরপাক খাচ্ছিল তারা দারুণ ব্যস্ততায়।

তাদের সন্নিকটে অথবা তাদের ওপর যেন একটা অক্সি-এ্যাসোটালিন ল্যাম্প জ্বলছিল। একটু পরেই ছোট্ট একটা বল যেন ছুটে এসে পড়লো তার সামনে। সে বল থেকে বেরিয়ে এলো নীল রঙের আলোকচ্ছটা—একটা গোলাপের মতো সুন্দর—আনন্দে যেন হাসছিল। ভদ্রলোক ভয়ে কিন্তু আঁৎকে উঠলেন। বন্ধুর উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বললেন '—চলে যাও! ছুটে পালাও! শীগ্‌গির!'

ছুটে পালালেন তারা। নীরাপদ দূরত্বে গিয়ে ফিরে তাকালেন ঐ অলৌকিক কাণ্ড কারখানার দিকে। কিছুক্ষণ পর সে আলো স্তিমিত হয়ে এলো। সেখানে শুধু তুষার আর তুষার ছাড়া অন্য কিছুই অবশিষ্ট রইলো না।

এটেই একমাত্র গল্প নয়—দুঃখিত, এটেই একমাত্র সত্যি ঘটনা নয়। সেই জিওফিসিক্যাল ই-য়ারে অনেকে অনেক রকম অলৌকিক দৃশ্য দেখেছিলেন। সে বছর ষষ্ঠ মহাদেশকে চারদিক থেকে আক্রমণ করেছিলেন পৃথিবীর এগারোটা দেশের বিজ্ঞানীরা। তারা এখানে ওখানে বসিয়েছিলেন ষাটটা শিবির। এদের মধ্যে তেত্রিশটা ছিল চিরস্থায়ী। আর্জেন্টিনার শিবিরগুলো থেকে এ রকম প্রায় বারোটা ঘটনার কথা জানা গেল। সে সব শিবির-বাসীরা নাকি আকাশে এবং বরফের ওপর এমন কতকগুলো জিনিস দেখেছিলেন যা ইতিপূর্বে পৃথিবীর বুকে তারা কখনো দেখেননি। এ সব বস্তুর অধিকাংশই দেখতে ডিম্বাকৃতি।

বিশেষ করে সোভিয়েত শিবির ভোস্তক এক, দুই এবং সোভিয়েতস্কায়তে যে সব সোভিয়েত বিজ্ঞানী ছিলেন তারা এমন কতকগুলো বস্তু দেখেছিলেন

যার নির্মাণ কৌশল খুবই বৈজ্ঞানিক, চমকপ্রদ—সেগুলো ছিল গতিশীল। সেগুলোর মধ্যে ছিল বেঁটে মোটাসোটা হামাগুড়ি দেওয়া কালো কোন কিছু, আর সাদা মানুষ কিংবা শূকরের মতো দেখতে কোন প্রাণী।

অ্যাণ্টার্কটিকায় এই রকম উড়ন্ত বস্তুকে নাকি প্রায়ই দেখা যায়। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে বৈজ্ঞানিক, নাবিক এবং যন্ত্র-কলা কুশলীদের মধ্যে বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। সে সময় আরজেন্টিনা সরকার একটা সরকারী প্রচার পত্র বের করেছিলেনঃ—আর্জেনটিনার অ্যাণ্টার্কটিকাতে যে নৌ সেনারা আছে তারা (৩রা জুলাই স্থানীয় সময় ১৯-১৪) কাঁচের মতো দেখতে বিরাট একটা উড়ন্ত জিনিস দেখেছে। জিনিসটাকে দেখতে মনে হয়েছে খুবই শক্ত মজবুত—বড় লালচে হলুদ—সেটা অবশ্য কখনো বা হলুদ বর্ণ ধারণ করছিল, কখনো বা নীল, কখনো বা সাদা, কখনো বা তাতে কমলা রঙের ছাপ। জিনিসটা আঁকা বাঁকা গতিতে ছুটে চলে গেছে পূর্ব দিকে। কিন্তু উত্তর পশ্চিম দিকে বেশ কয়েকবার দিক পরিবর্তন করেছে সেটা, তার গতিবেগেরও তারতম্য হয়েছিল সে সময়। দেখে মনে হয়েছে সেটার নিজস্ব একটা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল। ওঠা নামা, বাঁক খাওয়া, গতিবেগ কমানো বাড়ানো সব কিছুই তার হাতের মুঠোয়। মাধ্যাকর্ষণের হাতে উল্কার মতো সে অসহায় নয়। এটার যে তীব্র গতিবেগ ছিল তা দর্শকেরা সবাই স্বীকার করেছে। আশ্চর্যের বিষয় সেটা এক সময় স্থির দাঁড়িয়ে থেকেছিল ১৫ মিনিট ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০০ মিটার উর্ধে।'

অ্যাণ্টার্কটিকায় এসব অলৌকিক বস্তু প্রায়ই দেখা যায় কেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রসিদ্ধ সাংবাদিক পি. ডেভিলে বলেছেনঃ ঐ খানটাতে একটা সু-সমৃদ্ধ মহাদেশ ছিল। কিন্তু, এখন সেখানে শুধু বরফের রাজত্ব। মনে আছে কি অ্যাণ্টার্কটিকা আবিষ্কৃত হবার আগে শত শত বৎসর ধরে নাবিক, আবিষ্কারক এবং স্বপ্নবিলাসীদের দল দক্ষিণের স্বর্গটাকে খুঁজে বের করবার জন্যে বার বার চেষ্টা করেছে? কারণ, তারা পৌরাণিক কাহিনী এবং উপাখ্যান থেকেই জানতে পেরেছিল সেই দক্ষিণী স্বর্গের কথা।'

১৯৬৯ সাল। এ্যাপোলা বারো ছুটে চলেছে চাঁদের দিকে আমেরিকার মহাকাশচারীদের দ্বিতীয় বার চাঁদের বুকে সাগ্রহে নামিয়ে দেবার জন্যে। নভেম্বরের চৌদ্দ তারিখ ইউরোপের সব পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলো একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করলো। এ্যাপোলোর পথে আশে পাশে ছুটো উজ্জল

(যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে) জিনিস ভেসে চলেছে। বড় বড় সব টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখলেন পৃথিবীর বড় বড় সব বৈজ্ঞানিকেরা :—সেই উজ্জল বস্তু দুটোর একটা এ্যাপোলোকে অনুসরণ করছে, অন্যটা তার সামনে দিয়ে উড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে তাদের দেহ থেকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছিল।(৪)

নভেম্বরে পনের তারিখ। মহাকাশচারীদের তিন জন পিঠে কনরাড, ডিক্ গরডন এবং এলান্ বিন্ হাউসটনের মিশন কণ্ট্রোলকে জানালেন যে তারা দুটো ট্রলি দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু, এ রহস্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা আর বিশেষ কিছু বলতে চাইছেন না। তাই, স্যাগা ম্যাগাজিনের (Saga Magazine) আক্ষেপ :—'এ্যাপোলো বারো যে উড়ন্ত বস্তুদের সাক্ষাৎ পেয়েছিল সেগুলোর সম্বন্ধে নীরব কেন? নাসা (Nasa) ব্যাপারটা খোলাখুলি বললে আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হই।'

এর আগে মহাকাশচারী গর্ডন কূপার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিলেন ১৯৬৩ সালে। সে বছরের ১৬ই মে তিনি যখন পঞ্চদশ বারের মতো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন অস্ট্রেলিয়ার ওপর যেতে যেতে তিনি গ্রাউণ্ড কনট্রোলকে জানিয়েছিলেন যে একটা অত্যুজ্জল সবুজ পদার্থ তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে জিনিসটাকে যারা পৃথিবীতে ছিল তারাও নাকি দেখতে পেয়েছিলেন।

জি. গ্যারী এনডারসন একজন উচ্চপদস্থ প্রবীণ মহাকাশ বিজ্ঞানী। স্যাগা ম্যাগাজিনের একটা প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে প্রত্যেকটা মহাকাশচারী উড়ন্ত বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন, স্বচক্ষে সেগুলোকে দেখেছেন মহাকাশ যাত্রার সময়। কিন্তু, তাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে তারা যেন ওসব কথা কারুউ সঙ্গে আলোচনা না করেন। (৫)

১৯৬২ সালের জুন মাসের তের তারিখ বুয়েনস এয়ারস' এর সংবাদ পত্র এল্ মুণ্ডি'তে একটা মজার খবর বেরুল। ব্যাপারটা হলো—ব্যাহিয়্যা ব্লাঙ্কা এলাকায় এক সঙ্গে অনেকগুলো উড়ন্ত বস্তু দেখা গেছে। লা প্লাটা পুলিশ প্রধান যারা দেখেছে ঐ সব রহস্যজনক বস্তুগুলো তাদেরকে ডেকে পাঠালেন ব্যাপারটা কি তা জানতে। অনেকেই স্বীকার করলো :—হ্যাঁ, তারা দেখেছে, ঐ সব উড়ন্ত বস্তুগুলোকে পৃথিবীতে নাবতে। 'এল্ মুণ্ডি'

সংবাদ পত্র ঘটনাটার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখলো—'ওসব বস্তু যাত্রী বাহী হয়ে কোন গ্রহ উপগ্রহ থেকে নেবে এসেছে নিশ্চয়।'

একটা অবিশ্বাস্য রকমের ঘটনা ঘটেছিল ক্যাম্বা পুনাট (আর্জেন্টিনা) বিমান অবতরন ক্ষেত্রে। একটা উড়ন্ত বস্তু নেবে পড়েছিল। সে প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনাটা নিয়ে চারদিকে সে কী হৈ চৈ। এ্যায়ার পোর্ট ম্যানাজার সেনর লুইস হার্ভে কণ্ট্রোল রুম থেকে রিপোর্ট পেলেন অপরিচিত একটা বিমান কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছে বিমান ক্ষেত্রে। মিস্টার হার্ভে তাড়াতাড়ি গেলেন ঘটনাক্ষেত্রে। দেখলেন একটা অত্যুজ্জ্বল যান উর্ধাকাশে বন্‌বন্‌ করে খুব জোরে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু, ঐটে থেকে অনেক আশা করেও কেউ কোন সংকেত পেলো না। শেষ পর্যন্ত তিনি এবং তার সহকারীরা বিমানটি অবতরনের জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। ওটে নীচে নেবে এলো, নীচে আরও নীচে। একেবারে মাটি ছুই ছুই অবস্থা। বিমান অবতরন ক্ষেত্রে সবাই তখন একটা অজানা আশংকায় শিউরে উঠলো—একীরে! ভুতুরে কাণ্ড!' ওটে বিমান ফিমান কিছুই নয়। কি রকম যেন একটা বস্তু যেটার কোন বর্ণনা দেওয়া যায় না—সম্পূর্ণ অপরিচিত এ পৃথিবীর কাছে। মাটি থেকে কয়েক ফুট মাত্র উঁচুতে ওটে ঝুলে থেকেছিল, ওটা ঘুরছিল, পাঁক খাচ্ছিল। তিন চার মিনিট ধরে ওটে প্রচুর নীল, সবুজ, এবং কমলা রঙের আলোকচ্ছটা ছুড়ে মারলো সবার চোখে মুখে। অকুতোভয়ে কেউ কেউ ওটের কাছাকাছি এগুতে চাইলেন ব্যাপারটা কি ভালভাবে বুঝবেন বলে। কিন্তু, কাছাকাছি এগুতেই সেটা 'বোঁ' শব্দে ওপরে উঠে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে। অপার্থিব এসব বস্তুগুলো নীরস নয়। প্রচুর রঙ্গ রসও করতে জানে ওরা। তামাসা করতেই তো ওটে এসেছিল। তারপর কয়েক মিনিট ভেল্কিবাজী দেখিয়ে আপন খেয়ালে কোন অজানার খোঁজে চলে গেল।'

আশপাশের সংবাদপত্রগুলো এ নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ শুরু করে দিলে। তারা জোরালো দাবী জানালে এ ঘটনার তদন্ত হোক। এর থেকেও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল ঐ বছরের (1962) ডিসেম্বরে বাইশ তারিখ। বুয়েনস্ এয়ার্স' এর পত্র পত্রিকাগুলো বেশ বড় বড় হরফে লিখলো:—গত কাল একটা উড়ন্ত বস্তু নেবেছিল বেলা ২-১৫টায় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ইথোমিয়ার একটা প্রধান রানওয়ের ওপর। ওটে চুপচাপ বসেছিল।

চারদিকের কাণ্ড কারখানা সব দেখছিল বুঝি আপন মনে। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই প্যান আমেরিকার প্রকাণ্ড একটা যাত্রীবাহী বিমান প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে নাববো নাববো করছিল যেই অমনি সেটা উপরে উঠে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলক পড়তে না পড়তেই।

বুয়েনস্ এয়ারস এর প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রগুলো প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। সেই বিমান বন্দরের ফ্লাইট কনট্রোল টাওয়ারের অফিসার ইন-চার্জ সেনর হোর্‌্যাসিও এ্যালোবা'ও সাক্ষ্য দিলেন,—জোর গলায় বললেন:—হ্যাঁ, সত্যি বটে ব্যাপারটা। কোন ভুতুরে ব্যাপার নয়। আস্ত একটা যন্ত্র। আমি এবং আমার সতীর্থ সেনর জোম্ ঐ জিনিসটাকে কন্ট্রোল টাওয়ারের দু-হাজার মিটার দূরে অবতরন করতে দেখেছিলাম। তখন কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ওটাকে একটা ফুটবলের মতো দেখাচ্ছিল। উড়ে যাওয়ার সময় ওটা সোজা ৪০০ থেকে ৬০০ মিটার উর্ধে উঠে অকস্মাৎ বাঁক নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গিয়েছিল। আমরা তখন প্যান অ্যামেরিকান ডিসি ৮ বিমানটাকে নামাবার কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। তাই, বিমান বন্দরের আশে পাশে চারদিকের সব কিছুর ওপর আমাদের ছিল সুতীক্ষ্ণ নজর।(৬)

রবার্ট চ্যারুক্স তার 'আকাশ থেকে অচেনা অতিথি' নামক প্রবন্ধে কয়েকটা ঘটনার কথা লিখেছেন। তার বন্ধু প্রফেসর জীন ভাইলেস্‌রিক্স'এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তখন ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাস। ফ্রান্সের ভ্যার অঞ্চলে কয়েক বছর ধরে আঞ্চলিক প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মীরা অতি সঙ্গোপনে কাজ করে যাচ্ছিলেন। প্রফেসর ভদ্রলোক ঐ জায়গাটা পরিদর্শনে গেলে একজন উগ্রচণ্ডা স্ত্রীলোক প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে সেখান থেকে। কয়েকদিন পর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন তিনি সেখানে। এবারে অনেকটা ভদ্র ব্যবহার পেলেন। তারা ভেতরে গেলেন। সেখানকার ধ্বংসাবশেষ দেখে ভদ্রলোকের মনে হলো গ্রীক, ল্যাটিন এবং খ্রীস্টান -এই তিনটে সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল এখানে। অতীতের যেসব গুরুত্বপূর্ণ স্মারকচিহ্ন পাওয়া গেছে সবগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে এখান থেকে। পড়ে রয়েছে শুধু একটা অদ্ভুত আশ্চর্য রকমের সমাধি প্রস্তর। সে পাথরের ওপর এমন একটা কিছু আঁকা ছিল যেটার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে একটা জেট এয়ারপ্লেনের। ভদ্রলোক ওটার একটা ফটো নিতে গেলেন। কিন্তু, গাইড বাধা দিল।

দুদিন পরের কথা। ভদ্রলোক আবার ওকাবিয়াতে ফিরে এসেছেন। আর দেরী না করে সন্ধ্যের পরেই তিনি গেলেন সেই অতীতের গহ্বরে। সেই সমাধি প্রস্তরটা যেন তাকে টানছিল। সেই পাথরটা দেখে তার মনে হয়েছিল শুঁক তারার কথা। কিন্তু, গিয়ে দেখলেন পাথরটা নেই। উধাও হয়ে গেছে কোথাও।

ভদ্রলোক এবং তার আর এক বন্ধু ফিলিপ লেঙ্গলেট অনেক খোঁজ খবর নিয়েও ঐ সমাধিপ্রস্তরটার কোনও হদিস পেলেন না। রবার্ট চ্যারুক্স অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এমন সব ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তাই তিনি প্রশ্ন তুলছেন্ : সমাধি প্রস্তরের ছদ্মবেশে ওটা কি কোন জেট প্লেন, না মহাকাশ যান?—অন্য গ্রহের লোকেরা এভাবেই হয়তো চোখে ধুলো দেয়।(৭)

নাসরা আব্দাল্লা এট্ কামি একটা দুরারোগ্য রোগে ভুগছিল। আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে চীকিৎসাধীন থাকা সত্ত্বেও তার রোগ সারেনি। রোগাক্রান্ত শরীর নিয়ে সে কোন মতে জীবনটাকে টেনে নিয়ে চলেছিল কাদের এট্ ডাওয়ার'এ তার দিদির আশ্রয়ে। জায়গাটা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ত্রিশ মাইল দূরে, ছোটখাটো একটা শিল্পাঞ্চল। একদিন রাত্রে তার ঘর থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে বাড়ীর লোকজন সেদিকে ছুটে গেল। মেয়েটা বলল :—তিনজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক বড়ো গোলাকার সাদা রঙের চ্যাপটা ধরনের একটা বস্তু থেকে নেবে এলো।

তারপর!

তারপর আর কিছু মনে করতে পারছি না। ওদের কাছে আসতে দেখেই আমি হুঁস হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তারা আমার পেটে অস্ত্রোপচার করে গেছে।

কি যে বকছিস! তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

না না, তোমরা বিশ্বাস করছ না আমার কথা। এই দেখ, এই জংধরা সূঁচটা তারা বের করে এনেছে আমার পেট থেকে। সূঁচটা আমার ডান হাতের পাতায় এই আঠাল ফিতের সাহায্যে সেঁটে দিয়ে গেছে।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ডাক্তারদের ডেকে নিয়ে আসা হলো। তারা সব পরীক্ষা করে দেখলেন। ক্ষতস্থানটায় সেলাইয়ের পদ্ধতি দেখে তারা

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেলাইয়ের সুতোটা খুবই আধুনিক—অপার্থিব রকমের—ডাক্তারদের অপরিচিত।

এর পর থেকে মেয়েটা সম্পূর্ণ সুস্থ। রক্তস্রাব একদম বন্ধ।

খবরটা ইতালীর লা সিসিলিয়া নামক এক সংবাদপত্রের।(৮)

ইন্টারোভিয়া ম্যাগাজিনের মতে সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা ২ চাঁদের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে যে সব ছবি তুলেছিল (মাত্র ২৫ মাইল দূরত্ব থেকে) সে সব ছবি থেকে দেখা যায় চাঁদে কে বা কারা মেনহির (Menhir) তৈরী করে গেছে। ফটোগুলো থেকে এরকম আটটা মেগালিথের অস্তিত্ব বোঝা যায়। এ গুলো এক একটা চল্লিশ থেকে সত্তর ফুট উঁচু, এবং প্রায় পঞ্চাশ ফুট জায়গা জুড়ে তাদের অবস্থিতি।

লুনা ৯ যে সব ছবি তুলেছিল সেগুলোও এ ধরণের মেগালিথের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করে। (৯)

এখন প্রশ্ন এ সব মেগালিথ তৈরী করলো কারা? প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর মানুষ কি চাঁদে গিয়েছিল? নাকি অন্য গ্রহের মানুষ চাঁদে গিয়ে ঐ সব মেগালিথের সৃষ্টি করেছে? বুদ্ধিজীবী বাস্তববাদীরা এসব মেগালিথের কি ব্যাখ্যা দেবেন?

এই মে মাইকেল দুটো ঘটনার কথা বলেছেন। প্রথম দৃশ্যটা দেখবার দশদিন পর দ্বিতীয় দৃশ্যটা ফুটে উঠেছিল তার চোখের সামনে। (১১)

উত্তর দিকে আকাশের নীলের সঙ্গে মিশে একটা অদ্ভুত রকম তুলতুলে মেঘ চোখে পড়ছিল। তার উর্দ্ধে ছিল একটা সাইলিণ্ডার। ৪৫° ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে সেটা ভাসছিল। ধীরে ধীরে সরলরেখা বরাবর সেটে ভেসে যাচ্ছিল দক্ষিণ দিকে। জিনিষটা দেখতে ছিল সাদা মোটা—জ্যোতি বেরুচ্ছিল না কোন রকম। ঐ সাইলিণ্ডারের উপর দিক থেকে এক খণ্ড সাদা ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। সেই সাদা ধোঁয়ার পিছু নিয়েছিল আরও ত্রিশটার মতো অন্যান্য বস্তু। খালি চোখে সেগুলোকে মনে হচ্ছিল ধোঁয়ার তৈরী বুদ্বুদের মতো। কিন্তু, অপেরা গ্লাসের সাহায্যে দেখে মনে হলো তার কেন্দ্র বিন্দুতে একটা লাল রঙের বৃত্ত। ঐ বৃত্তের চারদিকে বেড়িয়ে আছে হলদে রঙের একটা বৃত্ত। ঐ বস্তু গুলো জোড়ায় জোড়ায় ভাসছিল। এঁকে বেঁকে সেগুলো চলছিল। তাদের গতি পথ যেন দার্জিলিং-এর রেল লাইন। যখন একটা বস্তু অন্য বস্তুর থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল তখন একটা সাদা ধোঁয়া

কাটা দাগ তৈরী হচ্ছিল তাদের মাঝখানে—যেটাকে দেখতে বৈদ্যুতিক বৃত্ত-চাপের মতো।

ঐ বিস্ময়কর অপার্থিব বস্তুগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবার পর অনেকগুলো প্রমাণ ফেলে রেখে গিয়েছিল তাদের বাস্তব অস্তিত্বের। কয়েক ঘণ্টা ধরে কি রকম যেন বিদ্‌ঘুটে পদার্থ সব গাছের শাখা প্রশাখায় লতা পাতায় রঙ মাখিয়ে দিয়েছিল, কিছু কিছু টেলিফোনের তারের ওপর পড়েছিল, কিছু কিছু বাড়ীর ছাদের ওপরেও।

এ সব ঘটনা থেকে এটেই প্রমাণ হয় আকাশে সত্যি সত্যিই উড়ন্ত বস্তু ভেসে বেড়ায়, তারা মাটিতেও নামে।

এই'ত গেল ভুতুরে সব কাণ্ড, অর্থাৎ, এসব বস্তুগুলো মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, সম্পূর্ণভাবে রহস্যলোকের। কিন্তু, পৃথিবীর মানুষ'ত রহস্যজনক সব এয়ারসিপ বা বায়ু জাহাজ, এ্যারোপ্লেন বা বিমান, রকেট এবং মহাকাশযানও দেখেছে। সেগুলো'ত পৃথিবীর মানুষের কাছে সম্পূর্ণ পরিচিত।

১৮৯৬-৯৭ সাল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট এলাকা জুড়ে কতক-গুলো প্রকাণ্ড এয়ারসিপের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেকেই সেগুলোকে স্ব-চক্ষে দেখেছিল। কিন্তু, অতগুলো মহাকায় সব এয়ারসিপ এসেছিল কোত্থেকে?(১২) কাউণ্ট ফ্যার্ডিন্যাণ্ড জেপ্‌লিন প্রথম এয়ার শিপ্‌ আবিষ্কার করেছিলেন ১৯০০ সালের জুন মাসে। তখন তার গতিবেগ ছিল ১৮, এম, পি-এইচ। ঐটে মাত্র সাড়ে তিন মাইল ওড়ার পরেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। তারপর থেকেই তার উড়া বন্ধ। তাহলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে যে সব এয়ারসিপ দেখা গিয়েছিল সেগুলো নিশ্চয় মনুষ্য নির্মিত নয়। ঐ উড়ো জাহাজগুলোকে দেখেছিল দশ হাজার লোক। এয়ারসিপটা আবির্ভূত হয়েছিল প্রচণ্ড গতিতে, ক্যানসাস নগরীর ওপর একটা চিলের মতো উড়ে বেড়িয়েছিল দশ মিনিট ধরে। সে সময় সেটা ছুড়ে মারছিল সবুজ নীল এবং সাদা আলোকচ্ছটা উর্ধাকাশে। ও রকম একটা প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন উড়োজাহাজ মানুষ উনিস'শ তেরো সাল পর্যন্ত তৈরী করতে সক্ষম হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর জেপ্‌লীনগুলো ইংলণ্ডে বোমা ফেলে স্বদেশে ফিরে আসতে গিয়ে খুবই অসুবিধের সম্মুখীন হতো—তাদের শক্তি ছিল অতোই সীমাবদ্ধ। ঐ প্রকাণ্ড উড়ো-জাহাজগুলো

এসেছিল কেন পৃথিবীতে জেপ্‌লীন আবিষ্কৃত হবার ঠিক পূর্ব মূহুর্তে? মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তিকে উপহাস করতে? নীরব ভাষাতে তারা যেন বলেছিল:—তোমরা মানুষ, একটা পাখী মাত্র তৈরী করছ—পাখা নেড়ে নেড়ে হয়তো পাখীর মতোই নিম্নাকাশে ধীর ছন্দে উড়বে তোমাদের ঐ জেপ্‌লীন্। আর আমাদের দেখো ঝঞ্ঝার গতি, মানুষ তবুও তোমার এতো বড়াই, এতোই দর্প, এতোই দাম্ভিক তুমি!'

গ্রোভ কার্ল একটি বই লিখেছেন। সেখানে সে বছরটাতে ব্রিটেনে যে কয়টা এয়ার-শিপ্ প্রত্যক্ষ করার ঘটনা ঘটেছিল তার অনেকগুলোই লেখা আছে।(১৩)

মিস এইচ. এম. বোভিল মে মাসের নয় তারিখ ইসেক্সে একটা অদ্ভুদ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন:—শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করছিলেন তিনি। সে সময় হঠাৎ একটা গাঢ় কাল রঙের বৃত্ত দেখতে পেলেন তিনি আকাশে। স্বুরিনেস থেকে সেটা ধীরে ধীরে ভেসে আসছিল। ভদ্রমহিলা ভাবলেন:—কোথাও হয়তো কোন বিস্ফোরণ ঘটেছে। হয়তো তারই কালো ধোঁয়া পাখা মেলে এ দিকটায় আসছে। রাত্তিরে গাঢ় জমাট অন্ধকারের মধ্যে সেটাকে আরও কালো দেখাচ্ছিল। কিন্তু, একী! সেটা ধীরে ধীরে একেবারে তার জানালার ধারে! স্থির দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ভদ্রমহিলা বিস্মিত হয়ে দেখলেন টর্পেডোর মতো একটা জিনিস ভেসে আছে। অনেক লম্বা, প্রকাণ্ড। লম্বায় এক চতুর্থাংশ মাইলের মতো হবে—বাড়ী ঘর এবং গাছ পালাগুলোর ঠিক উপরে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মিনিট স্থির দাঁড়িয়ে থেকে সেটে আবার উপরে উঠে গেল এবং খুব জোরে ছুটে গেল পশ্চিমদিকে লণ্ডনের উপকূলাঞ্চলে। প্রচণ্ড গতিতে উড়ে যাবার সময় সেটা ভূদিকে এক তু সেকেণ্ডের জন্যে সার্চলাইট ফেলে কি যেন দেখে নিয়েছিল।

চৌদ্দই মে একটা নরওয়ে জাহাজ যখন ব্লিথ থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন দেখতে পেলো প্রকাণ্ড একটা এয়ারশিপ পাঁচটা সার্চলাইটের অনুসন্ধানী উজ্জ্বল আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছে। সেণ্ট ওল্যাক'এর ওপর চিলের মতো পাঁক খেতে খেতে সেটা তার সবকটি লাইটের আলো ছুড়ে মারলো ষ্টীমারের সেতুর ওপর। হঠাৎ সেটা অন্য একটা ষ্টীমারের দিকে ছুটে গেল এবং তার ওপর আলোকচ্ছটা ছুড়ে মারলো। তারপর দ্রুতবেগে উড়ে গেল দক্ষিণ দিকে। নিউজিল্যাণ্ডের সায়েন্টিফিক স্পেশ রিচার্চ'এর

ডাইরেক্টর এবং স্পেশ্ ভিউ'র সম্পাদক মিষ্টার হেঙ্ক কো হিন্ফেলার এসব এয়ারশিপের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন:—'আমাদের একটি প্রধান দৈনিকের একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিকের সহায়তায় আমরা এমন কতকগুলো তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছি যেগুলো যে কোন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোককে কিংবা যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিককে অজ্ঞাত এসব উড়ন্ত বস্তুগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করবে আশাকরি।'

যে সময়কার কথা আমরা বলছি সে সময় রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এবং কাউন্ট জেপ্লীনের শুভ প্রচেষ্টা ছাড়া উর্ধাকাশে কোন শক্তিশালী আকাশযানের আনা গোনা হতো না এটে অভিজ্ঞ মহল নিশ্চয় স্বীকার করবেন। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম উড়েছিলেন ১৯০৩ সালে এবং জেপ্লীন ১৯০০ সালে। আকাশ যানের মাধ্যমে এদেশ ওদেশে যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯০৯ সালে। প্রথম মহাযুদ্ধে বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল বিমানের সাহায্যে এখানে ওখানে। কিন্তু, এদের একটি বিমানও নিউজিল্যাণ্ডের আকাশে কখনো প্রবেশ করেনি। এমন কি কেউ ভুল করে পথ ভুলেও নিউজিল্যাণ্ডের মানুষকে জানতে দেয়নি বিমান জিনিসটা আদৌ কি বস্তু, কি জিনিস।

কিন্তু, ১৯০৯ সালে চুরুট সদৃশ যে সব উড়ন্ত বস্তুগুলোকে নিউজিল্যাণ্ডের আকাশে লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেগুলো কি জিনিস? ওসব উড়ন্ত জিনিস-গুলোকে দেখা গিয়েছিল নিউজিল্যাণ্ডের সর্বত্র। এরা প্রথমে চোখে পড়ে, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে; শেষ বারের মতো সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এই ছয় সপ্তাহ ধরে অগুন্তি প্রত্যক্ষদর্শী সারা দেশে একটা হৈ চৈ শুরু করেছিল যে তারা অতিকায় উড়ো জাহাজ সব আকাশে দেখতে পাচ্ছে। ঐ সময়ে নিউজিল্যাণ্ডবাসীরা শুধু মাত্র উড়োজাহাজের শরীরটাই দেখেনি, যারা বসেছিল ভেতরে দেখেছে তাদেরকেও। প্রতিদিন বেশ কয়েক ডজন রিপোর্ট পাওয়া যেতে লাগলো এ সম্বন্ধে। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর বেসামাল অবস্থা। কারণ, সব প্রত্যক্ষদর্শীদের সামলানোই মুশকিল। একসঙ্গে কয়জনের রিপোর্ট নিতে পারে তারা? উড়ো জাহাজগুলো দেখা গিয়েছিল ভ্যারগ্যাভিল থেকে ইনভারকারগিল পর্যন্ত ৮৫০ মাইল বিস্তৃত ভূ-ভাগে। দিন রাত্রি শুধু এই দৃশ্য। বিভিন্ন জন একসঙ্গে অনেকগুলো উড়ন্ত বস্তু দেখেছে—যাদেরকে দেখতে টর্পেডো, নৌকো, চুরুট এবং কড্ মাছের মতো। রাত্রিবেলা কোন কোন সময় দেখা গেছে ওসব উড়োজাহাজগুলোর

থেকে শক্তিশালী সার্চলাইটগুলো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলো ফেলে দিনের মতো আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে চারদিক। চলবার সময় তাদেরকে মনে হতো ঢেউয়ের নাগরদোলায় দোদুল্যমান এক একটা নৌকো; কিংবা উড়তে উড়তে একটা পাখী নীচে পড়ে গেলে যে দৃশ্য হয় ঠিক সেই রকম একটা দৃশ্য।

নানা জনের কাছ থেকে শোনা গিয়েছিল নানা রকম কথা। একব্যক্তি রাত্রিবেলা দেখেছিলেন নৌকোর মতো একটা বস্তু নীচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে—তাতে দুখানা পাখা আর তিনটে লাইট—লাইটগুলো কিন্তু পাখাব আড়ালে ঢাকা। এই ব্যক্তিটা হলো দক্ষিণ দ্বীপ বা গোরের অধিবাসী। উড়ো জাহাজগুলো খুব নীচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ২০০০ থেকে ১০০০ ফুট পর্যন্ত নেমে এসে চারধারে ঘুরে ঘুরে যেন মজার খেলা খেলছিল আপন খেয়ালে। গোরের অপর দুজন অধিবাসীও দেখেছিল নৌকোর মতো দেখতে একটা উড়োজাহাজকে। তার ওপরে কোন ছাউনি নেই। এই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল ভোর সকালে। তখন ছিল ঘন কুয়াসা। ওরা শপথ করে বললো ওরা ঐ যানে উপবিষ্ট দেখেছে দুজন লোককে। দুপুর বেলাতেও কয়েকজন স্কুলের ছাত্র দেখতে পেয়েছিল ও রকম একটা উড়োজাহাজ। সেখানেও বসেছিল একটা লোক। (১৪)

এসব উড়োজাহাজগুলোর এমন প্রচণ্ড শক্তি যে ওরা খারাপ আবহাওয়াকে পর্য্যন্ত পরোয়া করে না। এ সম্বন্ধে নিউইয়র্ক টাইমস (২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৩)এর একটি খবর আছে। নিউইয়র্কে তখন প্রচণ্ড তুষার ঝড়। সেই তুষার ঝড়ের মধ্যেই একটা উড়ো জাহাজ উড়ে গিয়েছিল নিউইয়র্কের ওপর দিয়ে। প্রথমে সেটার গর্জন শোনা গিয়েছিল পার্ক এ্যাভেন্যুতে সকাল নয়টা তিরিশ মিনিটে। অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শী তখন ন্যাসন্যাল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীকে ডাকতে সুরু করে দিলে ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে। উক্ত কোম্পানী বেলা দুটো পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের ক্রমাগতঃ চেঁচামেচিতে অধৈর্য হয়ে উঠলো। ঐ রহস্যজনক প্লেনটা মানহাট্টানের ওপর দিয়েও অনেকক্ষণ উড়েছিল তুষার ঝড়কে ভ্রূকুটি দেখিয়ে বেপরোয়া হয়ে।

জন্ এ, কীল 'মিসট্রি এ্যারোপ্লেনস্ অব দি নাইনটিন থার্টিজ' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন।(১৫) উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন ঐ সব তুষুরে

উড়ো-জাহাজগুলো স্ক্যানডিনেভিয়াতেও খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সাক্ষ্য দিয়েছেন সাল্লেন। সে সময় স্ক্যান্ডিনেভিয়ার আবহাওয়া ছিল খুবই খারাপ। প্রবল তুষারপাত, তুষার ঝড়, ঘন গভীর কুয়াশায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ার জীবন তখন অতিষ্ঠ। এই ভয়ংকর সময়েও উড়োজাহাজগুলো অতি নিচুতে লোকজনের বাড়ীর ওপর, দোকানের ওপর, রেলওয়ে স্টেশনের ওপর দিয়ে অপূর্ব দক্ষতায় পাঁক খেয়েছিল, নেচে বেড়িয়েছিল নৃত্যপটীয়সীর মতো।"

কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে সুইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্কের সরকার পক্ষও আর নীরব থাকতে পারলেন না। তারা তদন্ত কমিটি বসালেন। এ সম্পর্কে নিউইয়র্ক টাইমস মন্তব্য করলো:—১৯৩৪ সালের ১১ই জানুয়ারী—আলকার্লেবিতে দেখা গেল একটা ভূতুরে উড়ন্ত বস্তু এখানে ওখানে ঘুরছিল, আর যে সব লোক তার পেছনে পেছনে ছুটছিল তাদের সঙ্গে বেশ মজা করতে শুরু করে দিয়েছিল। বোডেন দুর্গের ওপর দিয়েও একটা বিমান উড়েছিল। পড়ে গিয়েছিল হৈ চৈ। একজন মিলিটারি গার্ড ঐ বিমানটাকে অন্যান্য দুর্গের ওপর দিয়েও উড়ে যেতে দেখেছিল।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভেনাবষ্ট্রমকে এ ব্যাপারে জানানো হলে তিনি স্ত্রোন্ডেনের একজন মিলিটারী কম্যানডারের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করলেন কিছুক্ষণ তারপরই ব্যাপারটা স্রেফ অস্বীকার করে বসলেন।

কিন্তু জেনারেল ভার্জিন বললেন:—আমাদেরকে এক সঙ্গে অনেকগুলোর মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

তবে এ সম্বন্ধে আর বেশীক্ষণ আলোচনা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে মিলিটারি হেড্‌কোয়ার্টারগুলো।'

১৯৪৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। ফ্রান্সের বিখ্যাত সংবাদপত্র লে ফিগ্যারো লিখেছিল:—সুইডেনের ওপর গত কয়েকমাস ধরে দুহাজারের বেশী রকেটকে উড়ে যেতে দেখা গেছে—অনেকের কাছে এটা একটা হাসির খোরাক হলেও কিন্তু সুইডেন এবং ডেনমার্কের মিলিটারি স্টাফ এতে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তদন্ত শুরু করে দিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি।'

অনেকেই ভেবেছিল ওগুলো রাশিয়ার তৈরী রকেট। কিন্তু এ ধারণা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয়েছিল।

ওয়াল্লাই বিজোর্ণ যোষ্ট বহুদিন ওগুলো সুইডেন নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন।(১৬)। সেখানে তিনি লিখেছিলেন:—নিক...অনেকগুলো ওগুলো

গোপন অস্ত্র পাঠাবে কোন রাষ্ট্র কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে? লোকালয় পরিত্যক্ত কোন মরুভূমিতে কিংবা তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে ঐ অস্ত্রগুলো পরীক্ষার জন্য পাঠাতে পারতো। তা ছাড়া আরও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে —সে সময় ঐ জাতীয় অস্ত্র তৈরী করার ক্ষমতা কারই বা ছিল? জার্মাণ বিশেষজ্ঞরা'ত পালিয়েছে আমেরিকাতে; রাশিয়া যাদেরকে কব্জা করেছে তাদের ঐ জাতীয় অস্ত্র তৈরীর ক্ষমতা ছিল না—এ কথাটা সর্বজনবিদিত।

এতক্ষণ পর্যন্ত কতকগুলো রহস্যজনক উড়ন্ত গোলক এবং বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হলো। এই উড়ন্ত যন্ত্রগুলোর রহস্য কেউ ফাঁস করে দিতে পারেন? আমি আপনাদেরকে একটু সাহায্য করছি এ ব্যাপারে। সান্তা মোনিকার 'লা পোনডারোসা' নামক একটা রেস্টুরেন্টের কাছাকাছি একটা উড়ন্ত জিনিস এসে নেবেছিল। সেটা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল ঐ অঞ্চলে। কিছুক্ষণ পর ঐ জিনিসটা যখন উড়ে চলে গেল তখন তার অবতরণ ক্ষেত্রে পাওয়া গেল একটা টিউব। সে টিউবটাকে পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মাদ্রিদের ইন্টাতে (I N T. A—the Spanish National Technical Institute for Aeronautics and Space Research) সেখানে সেই টিউবটাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হলো। যে ধাতু দিয়ে ওটা তৈরী সেটা খুব উঁচু ধরণের নিকেল। যে প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তু সেখানে ছিল সেটা পোলিভাইনিল ফ্লুওরাইড্ জাতীয়—যেটা বাজারে খুবই দুষ্প্রাপ্য। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে, মানে দস্তুরমতো গবেষণা করে জানা গেল ডিউপোন্ট নেমাউরস'এর একটা আমেরিকান ফার্ম ঐ জাতীয় বস্তু আবিষ্কার করতে পেরেছে। আমেরিকার নাসা (NASA) যেটা অন্তরীক্ষ বা মহাকাশ গবেষণা চালাবার কাজে, মহাকাশে মানুষ পাঠাবার কাজে ব্যবহার করছে। এর থেকে কি আমরা এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে আমেরিকাই গোপনে ঐ উড়ন্ত বস্তুগুলো তৈরী করে বেশ কয়েক বছর ধরে মহাকাশে ছুড়ে মারছে? একদিন হয়তো আমেরিকা দাবী করে বসবে—হাঁ ঐসব উড়ন্ত বস্তুগুলো আমাদেরই সৃষ্টি, এবং আকাশে বেলুন ওড়াবার মতো সেগুলোকে উড়িয়ে পৃথিবীকে বলবে:—দেখো দেখো, আমাদের কারসাজি!' এমনও হতে পারে যে আমেরিকার গবেষকরা উড়ন্ত বস্তুগুলো যে উপাদানে তৈরী সে উপাদান কোথাও না কোথাও খুঁজে পেয়েছে এবং তারই

অনুকরনে ঐজাতীয় পদার্থ আবিষ্কার করেছে। না হয় ধরেই নিলাম আমেরিকা ওসব উড়ন্ত বস্তুর স্রষ্টা—কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সাহায্যেই কি আমরা ওপরের যে সব রহস্যঘন অপার্থিব বস্তুগুলোর আবির্ভাব তিরোভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললাম সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর মিলবে ? মিললে'ত ভালই। আমার কিন্তু মনে হয়, এতো সহজে ওসব রহস্যের কুল পাওয়া যাবে না।

যাক্. এখন আলোচনা করি কতকগুলো রহস্যময় মানুষের কথা। ১৯৬৯ সালের আগস্টের প্রথম দু'সপ্তাহে আমেরিকার ওহিও থেকে অনেক গুলো বিচ্ছিন্ন খবর পাওয়া গেল,--টেলিভিশন কেমন যেন বেতালে চলেছে। যেসব টি.ভি সেটের রঙ সাদা অথবা কালো সেগুলো থেকে অত্যুজ্বল রহস্যময় আলো ঠিকরে পড়ছিল, টি.ভি. প্রোগ্রামের সঙ্গে গরমিল অসংলগ্ন সব কণ্ঠস্বর এবং কথা বার্তা শোনা যাচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ঐ বছরে ওহিওতে অনেকগুলো উড়ন্ত বস্তুর আবির্ভাব তিরোভাব ঘটেছিল।

১৮২৮ সালের মে মাস। নুরেন বার্গে একটা হাঙ্গামা বেঁধেছিল। আজ কালকার উঠতি ছেলে মেয়েরা যে রকম রাস্তাঘাটে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে ওরকম আর কি। ঐ ছেলেগুলোর মধ্যে ছিল একটা কিশোর। বয়েস প্রায় ষোল। পুলিশ তাকে পাকড়াও করলো। পুলিশ তাকে প্রশ্ন করলো। কিন্তু তোতা পাখীর মতো সে শুধু সে কথাগুলোই আওড়ে গেল, কথার জবাব দিল না। সে বুঝতেই পারেনি পুলিশ তাকে কি জিজ্ঞেস করছিল। পুলিশ রেগে মেগে তাকে থানায় নিয়ে গেল। থানায় তাকে সার্চ করা হলো। তার কাছে পাওয়া গেল দুটো চিঠি। একটাতে লেখা আছে:—আমার এই ছেলেটার প্রতি যত্ন নিও। তার বাবা ছিল ষষ্ঠ ক্যাভ্যালরী'র একজন সৈনিক।' ষোল বছর আগেকার চিঠি! নিশ্চয় নয়। যে কালিতে লেখা ঐ চিঠি তা খুব বেশী পুরোন নয়। তাছাড়া, ষষ্ঠ ক্যাভ্যালরী নুরেন বার্গ শহরে যখন এসেছিল তখন ছেলেটার জন্মও হয়নি। সুতরাং পুলিশের সিদ্ধান্ত—চিঠিখানা জাল।

দ্বিতীয় চিঠিখানাও জাল। কাঁচা হাতের লেখা। যে লিখেছে তার পরিচয় ক্যাসপার হাউসের নিযুক্ত একজন চাকর। ঐ চিঠিখানা হাতের লেখা এবং বানান ভুলের নমুনা পরীক্ষা করে পুলিশ বুঝতে পারলো যে

কোন শিক্ষিত ধুরন্ধর ব্যক্তি নিজের পরিচয় গোপন রাখবার জন্যেই ঐ কাজটা করেছে।

অতএব জাল চিঠির অপরাধে পুলিশ ঐ ছেলেটাকে আটকে রাখলো। উদ্দেশ্য আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা। কিন্তু, কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ছেলেটার ভাব সাব দেখে আশ্চর্যবোধ না করে পারলো না। ছেলেটা যে হাঁটতেই জানে না ভাল করে। একটা চেয়ার দেওয়া হলো তাকে বসতে। সে ওটাতে লাফিয়ে উঠতে চাইলো এবং পড়ে গেল। তবে তার দৃষ্টি শক্তি খুবই প্রখর। তার দেহের রঙ ধবধবে সাদা। দেখে শুনে মনে হয় জীবনে কাজ কর্ম্ম সে কিছুই করেনি। তার পায়ের পাতা একটা শিশুর মতোই কোমল। পুলিশ যখন তাকে প্রথম ধরেছিল তখন তার পায়ে ছিলো মেয়েদের হাই হিল জুতো।

আরও একটা মজার ব্যাপার সে তাড়াতাড়ি পুলিশদের কথা বার্ত্তা বুঝতে শুরু করলো এবং বলতেও শিখলো। কিছুদিন পর পুলিশকে সে বললো—মাটির নীচে তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তাকে খাওয়ানো হতো ভাল করে; খেলনার জিনিসপত্রও এনে দেওয়া হতো যাতে ওগুলো নিয়েই সে আপন মনে মশগুল থাকতে পারে। তারপর একদিন তাকে একটা ক্যাবে তুলে দেওয়া হলো, এবং সেটা তাকে মুরেন বার্গে তুলে দিল।

পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করলো। পুলিশ জানতে পারলো একটা ছেলের কথা যে ১৮২৬ সালে একটা বোতল খুঁজে পেয়েছিল। ঐ বোতলের মধ্যে একটা কাগজে লেখা ছিল :—আমাকে বাঁচাও। রাইন নদীর ধারে একটা বন্দি শিবিরে আমি আটকা পড়ে আছি। কাগজের নীচে নাম লেখা ছিল—হেয়ারেস স্প্রাউকা।' পুলিশ ভাবলো—ওটে ক্যাসপার হাউসার'-এর সই নয়তো! কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সূত্র মিললো না। পুলিশ হাল ছেড়ে দিল।

তখন ইংলণ্ডের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছেলেটাকে তুলে দিলেন প্রফেসর ডউমারের হাতে। প্রফেসর ডউমার দেখলেন ছেলেটা দুধ পর্যন্ত চেনে না। ছেলেটা প্রথম যেদিন মোমবাতির আলো দেখতে পেলো বাড়ীতে সে দিনই সেটা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল দু হাত দিয়ে। ছেলেটাকে নিয়ে সবার মাথা ব্যথা। কিন্তু, কেউ যে জায়গাটায় তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সে জায়গাটা খুঁজে পেল না, চিঠিগুলো যারা লিখেছে তাদেরকেও।

চিঠিগুলো আবার কোন কাগজ টাগজ জাতীয় কোন জিনিসের ওপর লেখা ছিল না। খুবই পাতলা মসৃণ চামড়া।

শিল্পিরা ক্যাসপার হাউসার'-এর ছবি এঁকে ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। কিন্তু, কেউ তাকে চিনতে পারলে না। ১৮৩৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর কারা যেন ছেলেটাকে খুন করে বসলো। ঐ ফুলের মতো নির্মল নিষ্পাপ একটা শিশু। ব্যাপার কি! সে যদি কোন গোপন কথা ফাঁস করে দেয় এই ভয়ে নয়তো ?

এই ক্যাসপার হাউসার'এর সম্পর্কে ফায়ারবার্ক বলে ছিলেন :—ক্যাসপার হাউসার এ জগতের নয়। তাকে আমাদের কাছে আনা হয়েছে, সে অন্য গ্রহের প্রাণী, অন্য বিশ্বের বাসীন্দা সে।'

মাঝে মাঝে শোনা যায় কোথেকে যেন কে এসেছে। কিন্তু, কোথেকে তা সঠিক কেউ বলতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ক্যারাবো নামে একজন রাজকুমারীর খবর সবাই জানতে পেরেছিল। কোন দেশের রাজকুমারী ? যে দেশের নাম সে বললে তা পৃথিবীর মানচিত্রের কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তাহলে সে যা যা বলেছে সব মিথ্যা ? কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু সে নিরুদ্দেশ। কেউ কোথাও আর খুঁজে পেল না তাকে। তারপরের ঘটনা—প্যারিসে এমন একটা লোককে পাকড়াও করা হয়েছিল যার পকেটে পাওয়া গেছিলো একটা মানচিত্র—সে মানচিত্রটা একটা পৃথিবীর—কিন্তু, সে পৃথিবীর সঙ্গে এ পৃথিবীর একটুও মিল নেই—মানে, অন্য পৃথিবীর মানচিত্র।

১৯৫৪ সালের ঘটনা। টুয়ারেডের কাহিনী। জাপানে সে বছর খুবই মারাত্মক রকমের দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল। বিদেশী সন্ত্রাসবাদীদের কার্য কলাপ এই ভেবে জাপান সরকার সব বিদেশীদের পাসপোর্ট আটক করলেন তদন্তের জন্যে। জাপানের একটা হোটেলে পাওয়া গেল একজন লোককে। তার কাছ থেকেও একটা পাসপোর্ট আটক করা হলো। পাসপোর্টের ফটো থেকে সই টই সবই ঠিক আছে, কিন্তু, যে দেশ পাসপোর্টটা মঞ্জুর করছেন সে দেশের নাম টুয়ারেড। কোথায়, কোন সে দেশ! অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ'ত ও দেশের নাম কখনো শোনেননি। পৃথিবীর মানচিত্র খুঁজে দেখা হলো—কোথাও নেই। তবে!

লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। সে বললে :—কেন, দেশটাকে

আপনারা চেনেন না। আশ্চর্য! আফ্রিকার মানচিত্রটা নিয়ে আসুন। এই দেখুন মওরি টানিয়া থেকে শুরু করে সুদান প্রজাতন্ত্রের এই খান থেকে আলজিরিয়ার এই অংশ পর্যন্ত একটা বিস্তৃত অঞ্চলের নামই টুয়ারেড। এখানেই ত আরবের মুক্তি যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আরববাসীদেরকে অত্যাচার অবিচারের হাত থেকে বাঁচাবার সংগ্রাম। আর আমি এসেছি কেন জানেন, অস্ত্র কিনতে।

কর্তৃপক্ষ কিন্তু ঐ টুয়ারেড বলে যে কোন দেশ আছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারলেন না। তখন ভদ্রলোকটা বললেন—ঠিক আছে, প্রেস কনফারেন্স ডাকুন। আমি সাংবাদিকদেরকেই বুঝিয়ে বলছি। সাংবাদিক-রাও বোকা বলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তারা রাষ্ট্রসঙ্ঘে, আরব লীগে, ইউনেসকোয়—সর্বত্র ক্যাবল পাঠালেন টুয়ারেড' এর খবর জানতে। কিন্তু কেউ কোন খবর দিতে পারলো না। না, ওরকম কোন দেশ নেই—অন্ততঃ আমাদের পৃথিবীতে।

সবাই ভাবলো লোকটা পাগল—বদ্ধ পাগল। তাকে টোকিও'র একটা মানসিক হাসপাতালে আটকে রাখা হলো। সাংবাদিকেরা মাঝে মধ্যে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতেন। কিন্তু, তার সেই একই কথা। নতুন কোন কথা নেই তার মুখে। শেষ পর্যন্ত ঐ টুয়ারেড রহস্যের আর কোন কুল কিনারা হয়ে ওঠেনি।

বিভিন্ন পুলিশ সূত্র থেকে জানা যায় পৃথিবী থেকে প্রতি বছর ২০ লক্ষ লোক নিখোঁজ হয়ে যায় রহস্যজনক ভাবে। কোথায় যায় ওরা! এ ঘটনাগুলোতে যে একটা অস্বাভাবিকতা অলৌকিক ব্যাপার স্যাপার আছে তার প্রমাণ হলো গ্রেট্ ব্রিটেনের ওয়েলসে ১৯০৯ সালে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা।

ওলিভার থমাস। বয়েস এগার। একজন ধনী কৃষকের ছেলে। সে দিন সন্ধ্যা বেলা তার বাড়ীতে বেশ কয়েকজন লোক এসেছিল। তাদের মধ্যে ছিল একজন পশু চিকিৎসক, তার একজন বন্ধু। তারা মোটামুটি ভাল লোক। নেশা টেশা করেন না। সব সময়ই সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকেন। এ ছাড়া ও বাড়ীর একজন আত্মিয় এবং তার স্ত্রীও এসেছিলেন।

তখন রাত এগারোটা। ওলিভারকে পাঠানো হলো কূয়ো থেকে জল আনতে। সে গেল একটা বালতি নিয়ে। দশ সেকেণ্ড পরেই সবাই শুনতে পেলো একটা আর্তচীৎকার—বাচাও! বাঁচাও! সবাই ছুটে গেল সে

দিকে। প্যাস্টোর যাবার সময় একটা কেরোসিনের বাতি নিয়ে গেল। কিন্তু, কাউকে দেখা গেল না। কিন্তু, তারা শুনলো—আকাশের ওপর থেকে অলিভারের আর্ত চীৎকার "বাচাও, ওরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।' তারপর সব দিক নিস্তব্ধ। অলিভারের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে দেখা গেল সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগুতে না এগুতেই কারও খপ্পরে পড়েছিল।

কাছাকাছি শহর রাইয়াডার। তারা সেখানে গেল পুলিশকে ডাকতে। পুলিশ এসে আশ পাশের সব জায়গায় গৃহ তল্লাশি করলো। কুয়োর মধ্যে নেমে দেখলো। ছেলেটার ফটো ছড়িয়ে দিলে সর্বত্র। কিন্তু কোন খবরই পাওয়া গেল না তার। তারপরেও নানা ভাবে তদন্ত চললো। কেউ কেউ ভাবলো জুলে ভার্ণে তার গল্পে যে দৈত্যাকায় পাখীর কথা বলে গেছেন সে পাখীটাই তুলে নিয়ে যায়নি'ত! হেলিকপ্টার? কিন্তু, হেলিকপ্টার'ত তখনো আবিষ্কৃত হয় নি। আচ্ছা, কোন বেলুন থেকে কেউ তুলে নিয়ে যায়নি'ত! সব বেলুনগুলো পরীক্ষা করে দেখা হলো। না, ইংলণ্ডে সে রাত্রে কোন বেলুনই ওড়েনি। সবগুলো নিষ্কর্মা হয়ে শুয়ে শুয়ে রাত কাটিয়েছিল মাটিতে—আকাশ বিহার আর হয়ে ওঠেনি।

এভাবে কতো লোক যে উধাও হয়ে যাচ্ছে রহস্যজনক ভাবে তা কেউ জানে না। এ জাতীয় নিখোঁজের ঘটনা ঘটে স্থলে সমুদ্রে এবং আকাশে। গোটা জাহাজটাই নিখোঁজ হয়ে গেল—তার লোকজনও আস্ত। একটা এ্যারোপ্লেন কোথায় যেন হারিয়ে গেল পাইলট যাত্রী সহ মাটিতে এবং আকাশে কে জানে তার রহস্য! সমুদ্রের মধ্যে এমন কতকগুলো জায়গা আছে যে সব জায়গায় জাহাজ হারিয়ে যাবার ঘটনা ঘটে বেশী। উদাহরণ স্বরুপ, বারমুডা দ্বীপপুঞ্জের কথা বলা যায়।

১৯৬২ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে ম্যারী—সিলেস্টি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। চার্লস ফোর্ট, এরিক ফ্যাঙ্ক, রাসেল প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা বলেছিলেন—মনে হয় জাহাজটাকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকার সৈন্যদলের একটা বেলুনের আরোহীরাও এভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। ঐ বেলুনটা জার্মাণীর যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বেলুনটাকে পাওয়া গেল সশরীরে। কিন্তু তার হৃদয়ে উপবিষ্ট তিনজন লোক নেই। ওরা তিনজনই গিয়েছিল ঐ বেলুনে চলে। তাদের কাছে বেতার যন্ত্র ছিল। তারা তার

মাধ্যমেও'ত সংকেত বার্তা পাঠাতে পারতো সাহায্যের জন্যে যদি কোন শত্রু তাদেরকে বেলুন থেকে তুলে নিয়ে যাবার স্পর্দ্ধা দেখায়। কিন্তু, তারা চুপ চাপ ছিল। টু শব্দটিও করেনি।

মাত্র দু তিন বছর আগে রকি পর্বতের ওপর একখানা বিমান ভেঙ্গে পড়েছিল। বিমানে ছিল তেত্রিশ জন আমেরিকার সৈন্য। প্লেনটার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল সত্যি, কিন্তু ঐ তেত্রিশজন সৈন্যের কোন হদিসই পাওয়া যায় নি। তাদের মৃতদেহ, হাড় গোর, পোষাক পরিচ্ছদ কিছুই না। তাহলে তারা মরেনি! গেল কোথায়!

ক্যানাডা'র উত্তর দিকে অ্যানগিকুনি স্কীমোদের একটি গ্রাম। ১৯৩০ সালে সে গ্রামের সব লোকগুলো কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। ছেলে মেয়ে বাচ্চা কাচ্ছা, বুড়ো বুড়ী, নারী পুরুষ কেউ নেই। সাতটি কুকুর ছিল গাছের সঙ্গে বাঁধা। না খেতে পেয়ে শুঁকিয়ে মরেছে তারা। স্কীমোরা আর যাই করুক, কুকুরকে কোন দিন মরতে দেবে না না খেতে দিয়ে। এর চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার স্কীমোদের যে কবরগুলো ছিল সেগুলো খুঁড়ে দেখা গেল কবরস্থ মৃতদেহগুলোও নেই। স্কীমোদের পরম সহায় বন্ধুকগুলো পর্যন্ত নিয়ে যায়নি তারা। ব্যাপারটা কি!

আরও কিছু রহস্যের কথা বলছি।

১৮৮৭ সালের আগস্ট মাসের বিকেল। স্পেনের ব্যানজোস্ গ্রামে কয়েক জন চাষা মাঠে করছিল চাষ। হঠাৎ তারা দেখলো একটা গুহা থেকে উঠে আসছে একটা ছেলে, একটা মেয়ে। কচি বয়েস, মানে খুবই ছোট। ওরা যে পোষাক পরেছে সে সব পোষাক কৃষকদের অচেনা—যে বস্তুতে সে পোষাক তৈরী তাও। তাদের গায়ের চামড়া ছিল কচি গাছে কচি সবুজ পাতার মতো দেখতে। ঘটনাটা শুনলে মনে হবে কোন সায়েন্স ফিকসন লেখকের কাল্পনিক গল্প। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, এ রকম ঘটনা সত্যি সত্যিই ঘটেছিল।

বার্সিলোনা থেকে বিশেষজ্ঞরা এলেন। তারা বুঝতে পারলেন না ওদের ভাষা; বুঝতে পারলেন না কি জাতীয় কাপড়ে ওদের পোষাক তৈরী। শিশু দু'টোকে স্থানীয় একজন সম্ভ্রান্ত সহৃদয় ভদ্রলোকের কাছে গচ্ছিত রাখা হলো। তার নাম রিকার্ডো ভ্যা ক্যালনো। তিনি চেষ্টা করলেন তাদেরকে ঘষে মেজে সবুজ রঙটা তুলে ফেলতে দেহের চামড়া থেকে। কিন্তু, ঐটে ছো

কৃত্রিম কোন সজ্জা নয় যে ঘষলেই উঠে যাবে। ঠোঁটের লিপস্টিক উঠে যায় কিন্তু তার স্বাভাবিক রক্তিমাভা কিছুতেই উঠবার নয়।

পাঁচদিন ধরে তাদেরকে নানা রকম খাবার খেতে দেওয়া হলো। কিন্তু, সেগুলো তারা খেতে চাইলো না। খেলই না। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে কিছু মটর শুঁটি-সেদ্ধ এনে দেওয়া হলো। তাই তারা খেলো। ছেলেটা না খেয়ে না খেয়ে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মারা গেল। মেয়েটা বেঁচে রইলো। তার গায়ের চামড়া ধীরে ধীরে সবুজাভাটা হারাতে লাগলো। দেহের চামড়া হয়ে গেল সাদা।

কিছু কিছু স্পেনীশ ভাষা শিখে নিল সে। তাকে প্রশ্ন করা হলে কিন্তু তার জবাব রহস্যকে আরও ঘনিয়ে তুলল। সে বললে—সে এসেছে সেই দেশ থেকে যে দেশে কোন সূর্য নেই। সেখানে চলে সব সময়ই গোধূলীর রাজত্ব। ঐ দেশটাকে একটা নদী অন্য একটা দেশ থেকে পৃথক করে রেখেছে যে দেশে সূর্যের আলো প্রখরও পর্যাপ্ত। হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠলো তাদের গোধূলীর দেশে। চারদিকে শুরু হলো পরিত্রাহি চীৎকার। সেই প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে তারা উড়ে উঠলো আকাশে। ঝড়ে পড়লো এখানে।

মেয়েটা সহজে মরেনি অবশ্য। পাঁচ পাঁচটি বছর বেঁচেছিল!

রহস্য কি এর পেছনে? অনেকগুলো বছর কেটে গেছে ইতিমধ্যে তবুও রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করতে পারেনি কেউ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হলো :—ছেলে মেয়ে দুটো মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী। মঙ্গলে প্রাণীর বাস। সেখানে সূর্যের আলো কম বলেই সেখানকার অধিবাসীদের গায়ের রঙ সবুজ। যে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো তা অবশ্য ঐ অঞ্চলের যে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে তার সঙ্গে কিছুটা মেলে। কিন্তু, আমাদের প্রশ্ন হলো—একটা ঝড়, তা যতোই প্রবল উন্মাদ হোক না কেন, কি করে ওদেরকে একটা গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে উড়িয়ে নিয়ে আসতে পারে? মঙ্গলে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে না হয় স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু,...

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা বলছি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ছোট্ট গ্রাম, নাম ভার্জিনিয়া। সেখানে ফ্ল্যাটউডস্ বা ছোট ছোট বনভূমির ছড়াছড়ি। একদিন কতকগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—কিশোরকিশোরী হৈ চৈ শুরু করে দিলে :—একটা লাল রঙের বিরাট বলের মাঝখান থেকে একটা দৈত্যকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে তারা। একজন

সতের বয়স্ক ছেলের নেতৃত্বে ঐ গ্রামের কিশোরেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো বনের মধ্যে। এরা সামরিক পুলিশ ট্রেনিং পেয়েছিল যাতে সময়ে সময়ে গ্রামের বিপদে এগিয়ে আসতে পারে। বিস্তৃত একটা শক্তিশালী আলোকচ্ছটার মধ্যে ওরা দেখতে পেলো একটা জীব—বারো ফুট লম্বা। তার মাংসল শরীর একটা রাবারের পোষাকে আঁটো সাঁটো ভাবে লুকোনো। আলোতে চিক্ চিক করছিল সেই বিশেষ পোষাকটা। তার মাথায় আবার শিরস্ত্রাণও ছিল। তার মুখটা দেখতে লাল। তার চোখগুলো ইয়া বড়ো বড়ো—কমলালেবুর মতো রঙ সেগুলোর। তার দেহ থেকে কি রকম একটা বিদঘুটে গন্ধ উঠছিল। সেটা চলাফেরা সুরু করলো। কিন্তু তার পা দুটো নড়লো না। মাছ যেমন জলের মধ্যে সাঁতার কাটে, কিংবা মহাকাশচারী মহাকাশে ভাসেন ঠিক সেভাবে সে নড়া চড়া করতে লাগলো। সবাই 'ত ভয়ে অস্থির তখন। যে সতের বৎসর বয়স্ক ছোক্‌রাটা ঐ অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিল তার অতি সাহসী কুত্তাটা ভয়ে ছুটে পালালো বাড়ীর দিকে সর্ব প্রথম। তারা তখন অনন্যোপায় হয়ে স্থানীয় শেরীফকে টেলিফোন করলো। তিনি ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করলেন পরে। কিন্তু, সেই দানবটাকে দেখতে গেলেন না। কিন্তু গেলেন সেই বিদ্‌ঘুটে অপরিচিত গন্ধ আর দেখতে পেলেন, কতকগুলো অচেনা ছাপ বনভূমিতে।

বারো বৎসর থেকে সতের বৎসর বয়স্ক ছেলেদেরকে তখন তিনি জেরা শুরু করলেন আলাদা আলাদা ভাবে, জেনে নিলেন প্রতিটা খুঁটিনাটি তথ্য। প্রত্যেকের জবানবন্দী স্বীকারোক্তি একই রকমের। দানবটাকে যখন কোন দায়িত্বশীল পূর্ণবয়স্ক ভদ্রলোক দেখেননি তখন কি নিরীহ ছেলেগুলোর কথাগুলোকে যাচ্ছেতাই ভাবে উড়িয়ে দিলে চলবে? কিন্তু, এ জাতীয় খবর'ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রায়ই পাওয়া যায়—কেউ না কেউ ও জাতীয় প্রাণী দেখেছে।

১৯৬৩ সালের ২৩শে জুলাই ওরেগনে বেলা একটার সময় তিন জন লোক একটা গাড়ীতে করে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওরা দেখলো বারো ফুট লম্বা মানুষের মতো দেখতে সাদাচুলো একটা প্রাণী রাস্তার ওপার থেকে এপারে চলে এসেছে চকিতে। জেলেরা ওরগোনের পোর্টল্যাণ্ডের লিউইস নদীতে মাছ ধরছিল। তারা দেখলো নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে বারো ফুট লম্বা একটা দৈত্য। ১৯৬৩ সালের আগষ্ট মাস। ওরগোন জার্ণালের সাংবা-

দিকদের পাঠানো হলো ব্যাপারটা কি জানতে। তারা ঐ জাতীয় প্রাণীর প্রকাণ্ড পায়ের ছাপের ফটো নিয়ে ফিরলেন। ফটোগ্রাফের পায়ের সুস্পষ্ট ছাপ পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা দেখলেন ও জাতীয় প্রাণীর ওজন প্রায় চার'শ পাউণ্ডের মতো। পায়ের ছাপগুলো ঠিক কোন দৈত্যাকায় মানুষের মতো। একই মাসে লুইস নদীর এলাকায় পায়ের ছাপের ফটো নেওয়া হলো। ও সব ছাপ আরও বেশী বড়ো। বিশেষজ্ঞরা বললেন ঐ প্রাণীটার ওজন হবে সাত-শ পাউণ্ডের মতো।

আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের মতো একটা বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেশে এ জাতীয় জীব বিশেষজ্ঞদের আড়ালে থেকে যাবে এ কি করে সম্ভব? ওখানে প্রতি নিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। সেখানকার বনাঞ্চলগুলোকে সব সময় হেলিকপ্টারগুলো চোখে চোখে রেখেছে—কোন না কোন ভাবে আগুনে পুড়ে যাতে বনজ সম্পদ নষ্ট না হয়ে যায়। বারোফুট লম্বা আদিম মানুষের দল যদি বনের মধ্যে বাস করে থাকে'ত সেটা নিশ্চয় তাদের চোখে পড়ে থাকবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বনাঞ্চলে এমন কোন দৈত্যাকায় মানুষের কথা সভ্য সমাজের জানা নেই, যারা লতাপাতা দিয়ে ঘর তৈরী করে বাস করে, কিংবা গুহায় থাকে। যে সব দৈত্যাকায় মানুষদেরকে দেখা গেছে তারা যদি চিরস্থায়ী ভাবে ঐ অঞ্চলে বাস করতো তাহলে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকতো নিশ্চয়। তাছাড়া তাদের মাথায় মহাকাশচারীর মুখোস কেন? এর থেকে কি আমরা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারি না যে ওদেরকে যেখানেই নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানেই তারা নেবেছে, কিছুক্ষণ থেকেছে, পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে,—তারপরই তাদেরকে তুলে নেওয়া হয়েছে?

উপরে যে সব রহস্যজনক ঘটনাগুলোর কথা বললাম সেগুলো ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে কি একথাটাই মনে হয় না যে সভ্য মনুষ্য সমাজের অগোচরে আর একটা সু-সভ্য উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে পৃথিবীতে? ওরা কারা? তারা কি অন্য গ্রহের বাসীন্দা? অন্য গ্রহের প্রাণীরা আগেও আসতো এখনো আসে পৃথিবীতে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত অলোচনা করছি। ইতিমধ্যে কোলকাতা মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে গিয়েছিলাম। আলাপ করলাম সুপারিনটেন-ডেণ্ট মিস্টার সিনহার সাথে। জিজ্ঞেস করলাম এমন কোন প্রমাণ

আছে কি আপনাদের হাতে যাতে একথাটা প্রমাণ করা যেতে পারে যে গ্রহান্তরের মানুষ আসতো পৃথিবীতে? আমার প্রশ্ন শুনেই ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। মানে এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু—সাদা কথায় মোটেই কোন খবর রাখেন না। তবুও কিছুক্ষণ আলাপ সালাপ করলেন। শেষ পর্যন্ত একটা প্রস্তাব দিলেন আমাকে—আপনি এক কাজ করুন। ভূ-তত্ত্ববিদদের সঙ্গে আলাপ করে দেখুন। জানবার চেষ্টা করুন এমন কোন পাথর পাওয়া গেছে কিনা পৃথিবীতে যার জন্ম স্থান পৃথিবী নয়, তাকে আমদানি করা হয়েছে অন্য কোন গ্রহ থেকে। মাথা পেতে নিলাম তার প্রস্তাব।

জিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে গেলাম। আলাপ করলাম কয়েকজনের সঙ্গে। ভাল করে আলাপ করবার ধৈর্য তাদের নেই। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবরও ওরা রাখেন না। সুতরাং, তাদের কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরলাম। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে মিস্টার সিনহার কথামত সেই দুর্লভ পদার্থের খোঁজ পেয়ে গেছি বিদেশী সূত্রে। লুইস পাওয়েল'এর থেকে জানলাম, ব্রাসিলের ম্যাগনেসিয়া এস্ এর ডাইরেক্টর মিগুয়েল কাহেন একখণ্ড অপার্থিব, মানে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না এমন একখণ্ড স্ফটিক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। মিস্টার কাহেন সেই ধাতু খণ্ডটাকে পাঠিয়ে দিলেন জ্যাক্স বার্জিয়ারের কাছে। বার্জিয়ার ধাতুটা খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। ধাতুটার অপার্থিবতা লক্ষ্য করে চমকে উঠলেন। ঐ ধাতুটা অপার্থিব রকমের স্বচ্ছ ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেইট দিয়ে তৈরী। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও ভাল ভাবে আলোচনা করেছি।

এদিকে টেকটাইট নামক এক প্রকার ধাতু নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা খুবই মুশকিলে পড়েছেন। পূর্বে এ প্রকার বস্তুকে স্বর্গীয় মনে করা হতো। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে একে বলা হয় অগ্নি মণি। অনেক সময় এ টেক্টাইটের দখল নেবার জন্যে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। জাভাতে ঘটেছিল এরকম একটা ঘটনা। এই টেকটাইটের কিভাবে জন্ম হলো সে সম্বন্ধে ভূ-তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা কিছুই জানেন না। তাদের সিদ্ধান্ত এ জাতীয় পদার্থ আকাশ থেকে এসে পড়েছে পৃথিবীর বুকে—পৃথিবীর হাতে জন্ম হয় নি তার। সুতরাং, টেক্টাইটের কথা ভাল বলতে পারবেন

নক্ষত্রবিদ্ বা নক্ষত্রবিজ্ঞানীরা—আকাশ মহাকাশ নিয়ে যাদের নিরন্তর গবেষণা।

কিন্তু বেচারীদের কাহিল অবস্থা। তারা বলেন—দেখুন'ত কী ঝামেলা। এ সমস্যাটার সমাধান আবার আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল কেন! আমরা'ত পরীক্ষা করে দেখলাম। আমাদের মতে পৃথিবীর বুকেই টেক্‌টাইটের জন্ম। অতিরিক্ত উত্তাপের ফলেই ও জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং, এ রহস্য উন্মোচনের প্রকৃত দায়ীত্ব ভূ-তত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের। এ জাতীয় কাঁচের যে জন্ম হতে পারে মহাকাশে সে সম্বন্ধে মহাকাশ—বি'শেষজ্ঞদের কিছু নিশ্চিত হয়ে বলা মুশকিল। অষ্ট্রেলিয়াতে এমন কতকগুলো টেক্-টাইট্ পাওয়া গেছে যেগুলোকে দেখতে অশ্রুবিন্দু এবং ফ্ল্যাঞ্জ বা চাকার উচু কানার মতো। কোন পদার্থ পৃথিবীর আবহ-মণ্ডলের মধ্যে গিয়ে প্রবল বেগে নেমে আসবার পথে ওরকম আকৃতি পেতে পারে। কিন্তু, এ জাতীয় সামান্য একটু অনুমানের সাহায্যে টেক্-টাইট্ রহস্যের কোন মীমাংসা করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। এবং আমাদের কাঁধে এ দায়িত্বটা চাপিয়ে দেওয়া ভূ-তত্ত্ববিশেষজ্ঞদের একটা অন্যায় জেদ্। আমরা জানি উল্কাগুলো যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে দ্রুত নেমে আসে পৃথিবীর বুকে তখন তারা সাধারণতঃ গোচাকৃতি বস্তুর আকার নেয়। আমাদের মনেহয়—উল্কারা, ফ্ল্যাঞ্জ বা চাকার উচু কানার আকৃতি নিতে পারে না।(১৮")

তাহলে মজা দেখুন। শুধু দায়ীত্ব এড়ানোর পালা। আমাদের পৃথিবীতে এমন অনেকগুলো ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে যেগুলোর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে একটা কঠিন সমস্যা। কিন্তু, মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কোন একটা রহস্য বুঝে ওঠা মুশকিল বলে'ত সেটাকে-আর অলিক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সেটার বাস্তবতাকে'ত অস্বীকার করা যায় না। অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীতে মাহাকাশ-যানগুলো আসে'—এ রকম একটা বিশ্বাস ইউ. এফ, ও (বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে 'অউদ্র'—অর্থাৎ অচেনা উড়ন্ত দ্রব্য)—বিশেষজ্ঞ-দের। তাদের এ বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চয় হালকা করে দেখতে পারেন না। টেলিফোন আবিষ্কারের পরও নাকি ব্রিটেনের এক বিজ্ঞানী ব্যাপারটিকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন—পাগল! এ কখনো হতে পারে

নাকি!' মানুষ মহাকাশে উড়বে, চাঁদে যাবে এ সম্ভাবনাটাকে অনেক নামকরা বৈজ্ঞানিকও স্রেফ্‌ অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আজ? বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার দামআছে, কিন্তু, বৈজ্ঞানিক সন্দিগ্ধ-মনের দাম কানাকড়ি।

মহাকাশের অন্য গ্রহের প্রাণী সত্যি সত্যিই কি পৃথিবীতে আসতে পারে না? এ ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা আমাদের আজকের সীমিত ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বিচার করতে চাই। আমরা ভাবি অন্যান্য গ্রহের সভ্য জীবরাও আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও সীমিত জ্ঞান নিয়ে কয়েক লাইট-ইয়ার বা আলোক বৎসর অতিক্রম করে পৃথিবীতে আসতে পারে না—আমরা যখন পারিনা তখন তারা পারবে কি করে? অন্য গ্রহে যে সভ্য উন্নত প্রাণী আছে বিজ্ঞান কি তা আদৌ স্বীকার করে? আলোচনা করা যাক্‌।

মুরে'তে (murray) যে উল্কা পড়েছিল সেই পাথর খণ্ড থেকে আমেরিকা'র বৈজ্ঞানিক ডঃ সিসলার এবং ডঃ ওয়ান্টার নিউটন অদ্ভুত অপার্থিব ধরণের ব্যাক্টীরিয়া বা বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর খোঁজ পেয়েছিলেন। আমেরিকার কেনটাকী'র মুরেতে উল্কাটা পড়েছিল ১৯৫০ সালে। উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয় সেই পাথরটাকে সংগ্রহ করলেন। সেই পাথরের উপরি ভাগটাকে অতি-বেগুনী আলো, হাইড্রোজেন প্রোক্সাইড্‌ এবং পারদের বাইক্লোরাইডে'র সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করলেন। তারপর সেই পাথরটাকে ঢোকালেন একটা জীবাণুমুক্ত গবেষণাগারে। সেটাকে গুড়ো করা হলো। তারপর তাকে রাখা হলো একটা পুষ্টিকারক কালচারের (যার সাহায্যে পরীক্ষাগারে জীবাণু বৃদ্ধি করা হয়) ওপর। কয়েক মাস পর ঐ তরল পদার্থের রঙ হয়ে উঠলো মেঘাবৃত অথবা তার রঙ হলো মেঘের মতো। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এবার বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখলেন সেখানে কোটি কোটি অসংখ্য ব্যাকটীরিয়া—কিন্তু, পৃথিবীতে উৎপন্ন ব্যাকটিরিয়া থেকে সেগুলো সম্পূর্ণ আলাদা।

১৮৬৪ সালে ফ্রান্সের ওরগুয়ালে যে উল্কাটা পড়েছিল সেটাকে নিউ ইয়র্কের ফোরঢাম ইউনিভার্সিটির বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখলেন ১৯৬১ সালে। তারা আবিষ্কার করলেন এমন এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ—যাকে পৃথিবীতে জৈব হিসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে—কোলেস্টারোল এবং চর্বির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে সেই তরল অঙ্গারকের দ্রাবকের সঙ্গে। বৈজ্ঞা-

নিকেরা তখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন. কোন গ্রহ কতগুলো উল্কাপিণ্ডে পরিণত হবার আগে যে নিম্নশ্রেণীর জীবাণু ধারণ করে থাকে তারই অবশিষ্টাংশ ঐ প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য। সুতরাং, এখন বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত যে মঙ্গলে এবং চাঁদের আবহাওয়া যতোই শীতল, যতোই উষ্ণ হোক্ না কেন—বায়ু না থাকলেও কিছু যায় আসে না—সেখানে রয়েছে ব্যাকটীরিয়া, জীবাণু এবং এক কোষী প্রাণীর অস্তিত্ব।

মহাকাশে কি আমাদের মতো অন্য কোন সু-সভ্য প্রাণী আছে? ৪০০ খৃঃপূর্বাব্দে মেট্রো ডোরোস বলেছিলেন ঃ—অনন্ত মহাকাশের বুকে যে পৃথিবীই একমাত্র প্রাণী ধারণ করতে পারে, মানুষের মতো সু-সভ্য প্রাণী, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন সতেজ সজীব গ্রহে নেই একটিও এ ধারণা করা, আর একটা কৃষিক্ষেত্রে ধান কিংবা গমের বীজ ফেলে একটি মাত্র বীজই গজাবে মনে করা ঠিক একই কথা।'

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও মহাকাশে সু-সভ্য প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাচ্ছেন! ১৯৭০ সাল থেকে এই তর্ক বিতর্কটা আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াতে যে উল্কাটা পড়েছে সেটা থেকে আমেরিকায় গবেষণারত সিংহলের বিজ্ঞানী পোন্নামপেরুমা ১৭ প্রকারের অ্যামিনো এ্যাসিড্ আবিষ্কার করতে পেরেছেন। পোন্নাম্-পেরুমা স্বীকার করলেন গবেষণাগারের বীকারে মানুষের একটা মাত্র আঙুলের ছাপ থেকেও টেস্ট টিউবে অ্যামিনো এ্যাসিডের আমদানি হতে পারে। কিন্তু তিনি অতি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন এবং এমন সব প্রমাণ দেখালেন যে গবেষণাগারের বীকারে একটা আঙুলের ছাপও যাতে না পড়তে পারে ঠিক সেইভাবে তিনি গবেষণাটা চালিয়েছেন।(১৯)

অ্যামিনো অ্যাসিডে'র সঞ্চয় হতে আরে দু'ভাবে—আয়নায় কারও বাঁ হাতটা যেমন ডান হাতের মতো দেখায়, এবং ডান হাতটা বাঁ হাতের মতো তেমনি পৃথিবীর অ্যামিনো এ্যাসিড'এর অধিকাংশেরই বহিরাকৃতি বাঁ-ঘেষা হয়ে পড়ে—অর্থাৎ মেরু অভিমুখী যে আলোক-লহরী তার মধ্যে বয়ে যায় তা ঈষৎ বাঁ ঘেষা হয়ে অবস্থান করে। কিন্তু, উল্কা থেকে পোন্নামপেরুমা যে অ্যামিনো এ্যাসিড্ সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্যে সম পরিমাণ লেঙা (বাঁ-ঘেষা) এবং ডান-হাতা মোলিকিউল পাওয়া গিয়েছিল। এর থেকেই ভালভাবে প্রমাণ হয় যে ঐ অ্যামিনো এ্যাসিড পার্থিব নয়, অপার্থিব।

গবেষণা যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততোই বেশী প্রমাণ হচ্ছে—যে কয়টি উপাদান উন্নততর জীবন সৃষ্টির জন্যে দরকার তার সব কয়টিই পাওয়া যাচ্ছে সৌর জগতের বাইরে। ১৯৬৮ সালে, কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল বৈজ্ঞানিক একটা রেডিও-টেলিস্কোপ ফেলেছিলেন আমাদের ছায়া পথে —যেখানে বালুকা বেলার অসংখ্য বালুকারাশির মতো নক্ষত্র কুল বিরাজ করছে অগুন্তি। বৈজ্ঞানিকেরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন সেই মস্ত বড়ো টেলিস্কোপটার ইলেকট্রোনিক-ইয়ার নির্গমণ শব্দ (emission) কুড়িয়ে নিচ্ছে। এইরকম সংকেতের জন্ম দিতে পারে একমাত্র অ্যামোনিয়া মোলিকিউল। বিকিরণ প্রক্রিয়ায় নাস্তানাবুদ হয়ে মোলিকিউল এমন কতকগুলো সংকেতের সৃষ্টি করে যেগুলোকে সনাক্তকরণ কাজে আঙুলের ছাপের মাতা সমান কার্যকর হিসেবে ব্যবহার করা চলে। ১৯৬৮ সালেই পৃথিবী সর্বপ্রথম জানতে পারলো যে নক্ষত্র বা সূর্যগুলোর মাঝখানকার জায়গাগুলোতে যে গ্যাসীয় মেঘের ধুম্রমাল খেলা করে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক দিক দিয়ে দীর্ঘজীবি মোলিকিউল। এই মজার আবিষ্কারের পর থেকে মহাশূন্যে প্রায় ডজন দুই মেলিকিউল আবিষ্কৃত হয়েছে—যাদের মধ্যে রয়েছে কার্বন মনোক্সাইড্, ফোরম্যালডিহাইড্, ইথিল অ্যালকোহল এবং জল।

এসব উপাদানগুলোর অধিকাংশই উন্নত প্রাণীর সৃষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক। সুতরাং, বিজ্ঞানীরা এখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন যে রাসায়ণিক যোগসূত্র পৃথিবীতে প্রাণীর জন্ম দিয়েছে সেই যোগসূত্রই সমগ্র মহাকাশের আনাচে কানাচে প্রাণীকুলের জন্ম দিয়ে থাকবে। সৌরজগৎ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্ণওয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কার্ল স্যাগন বলেছেন:— 'The building block of life is lying around everywhere'— অর্থাৎ জীবন গড়বার পর্যাপ্ত মাল-মসলা ছড়িয়ে আছে সবত্রই।

১০,২,৭৫-এর খবর মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বৃহস্পতির বাষ্পমণ্ডলে জলের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন—সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহটিতে কোন না কোন ধরনের জীবন থাকতে পারে কিনা, সে প্রশ্নের মীমাংসার পথে এই আবিষ্কারকে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা চলে। অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হ্যারল্ড ল্যারসন এক সাক্ষাৎকারে বলেন:— 'সন্দেহ নেই ওখানে জল রয়েছে।' এর আগে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয়

দশকেই বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে এমন কতকগুলো রাসায়ণিক পদার্থের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল যেগুলো পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির আদি পর্বে প্রয়োজন হয়েছিল। এদ্দিন পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহের জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণায় জলের অস্তিত্ব শুধুমাত্র অনুমান করে নেওয়া হয়েছিল। এবারে তার প্রমাণ মিললো।

তবে অন্যান্য পৃথিবীর জীবন যে হুবহু পৃথিবীর সঙ্গে মিলে যাবে তা নয়। পৃথিবীর আবহাওয়া থেকে সেখানকার আবহাওয়া ভিন্নতর হতে পারে, সেখানকার রাসায়নিক উপাদানগুলোর যোগসূত্র হতে পারে ভিন্ন প্রকারের। বৈজ্ঞানিকেরা এখন স্বীকার করছেন বর্তমান পৃথিবীর লোক সংখ্যা যতো কোটি ন্যূনতমপক্ষে ঠিক ততো কোটি সুসভ্যপ্রাণীধারী পৃথিবী রয়েছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে।

কিছু দিন আগে (আজ ১৭. ৪' ৭৫) এক সোভিয়েত বিজ্ঞানী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি প্রতি এক'শ দিন পর পর মহাকাশ থেকে সংকেত পাচ্ছেন। অতীতেও অনেক বৈজ্ঞানিক এ রকম সংকেত ধরতে পেরেছেন। রেডিও স্টোনমার'রা এ সব সংকেত ধরতে পেরে চমকে উঠেছেন বেশ কয়েক বার। কারণ, এতে যে মহাজাগতিক কোন প্রবল শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ হচ্ছে! ১৯৬০ সালে প্রোজেক্ট ওঝমা নামে একটা অপারেশন চালাবার সময় ফ্র্যাঙ্ক ড্রেইকের নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিকেরা ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গ্রীন ব্যাঙ্ক রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে রীতি মতো সংকেত ধরতে পেরেছিলেন।

এখন প্রশ্ন তোলা যাক, পৃথিবীর মানুষের পক্ষে কি ওসব পৃথিবীতে পদার্পণ করা সম্ভব? ধরা যাক্ এক সেকেণ্ডে আট কিলো মিটার গতিবেগ সম্পন্ন একটা মহাকাশযান পাঠানো হলো। এই গতিতে সে যদি পৃথিবীর সব চেয়ে নিকটবর্তী কোন সৌর—জগতে পা দিতে চায়'ত তার সময় লাগবে ৮০.০০০ বছর। এই নিকটবর্তী নক্ষত্র বা সূর্যটার নাম প্রোক্সিমা সেন্টরাই। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব ৪'৩ লাইট ইয়ার বা আলোক—বর্ষ। তাহলেই বুঝে দেখুন অবস্থাটা কি। আমাদের সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্য সৌরজগতে পদার্পণ করা বর্তমান যুগে মানুষের পক্ষে একটা অসম্ভব কাজ। মানুষের এই জ্ঞান বিজ্ঞান এ দিক দিয়ে নিতান্তই তুচ্ছ।

আর আমরা যদি রেডিও সংকেত পাঠাই মহাকাশে? গত পনেরো বছর ধরে মানুষ ক্রমাগতঃ শক্তিশালী বেতার সংকেত পাঠিয়ে চলেছে মহাকাশে।

মহাকাশে কোন যান্ত্রিক কলা কৌশল সমৃদ্ধ উন্নত প্রাণী বাস করে'ত আমাদের থেকে কুড়ি আলোক বর্ষ দূরে তাহলে ঐ সংকেত ধ্বনি তারা ধরতে পারবে ১৯৭৬ সালে। এবং ঐ বার্তা পাওয়া মাত্র তারা যদি উত্তর পাঠায় সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে তাহলে তা পেতে পেতে আমাদেরকে আরও কুড়ি বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ তাদের সংকেত পাবে পৃথিবীর মানুষ ১৯৯৬ সালে।

এ সব হোল মানুষের হিসেব। তাদের হিসেব মতে অন্য গ্রহ থেকে অন্য সৌরজগৎ থেকে যে পৃথিবীতে নভশ্চররা আসবেন তা হতে পারে না। কিন্তু কেন? আমরা পারিনা বলে অন্য কেউ পারবে না—এ বক্তব্যে কোন যুক্তি আছে? কিছুকাল আগে বৈজ্ঞানিকেরা বলেছিলেন মঙ্গল গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ১৯৭৩ সালে 'মেরিনার নয়' পাঠাবার পরই তাদের এ ধারণা পাল্টে গেল। মেরিনার নয় মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের পূর্ববর্তী সব অভিজ্ঞতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষক দলের প্রধান হ্যারল্ড ম্যাসাবস্কি'র ওপর ছিল 'মেরিনার নয়' যে ছবিগুলো পাঠাতো সেগুলো পরীক্ষা করে দেখবার ভার। ছবিগুলো পরীক্ষা করে তিনি বললেন—নদীর মতো যে চ্যানেলগুলো এঁকে বেঁকে চলে গেছে এ ধার থেকে ওধারে তাতে যে অন্ততঃ কিছুদিন আগেও (recent past) ঐ গ্রহে জলের অস্তিত্ব ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডঃ কার্ল স্যাগনও 'মেরিনার নয়' এর বিশেষজ্ঞ। তিনিও স্বীকার করলেন:—হ্যাঁ, জল আছে মঙ্গল গ্রহে। সব কিছু বিবেচনা করে তিনি একটা ব্যাখ্যা দিলেন:—ঐ গ্রহটার আবর্তনের কৌণিক দূরত্বের যে হের ফের ঘটে সময় সময় তাতে সেখানকার আবহাওয়া থাকে পরিবর্তনশীল। এতে হিম যুগ আর অতীত উষ্ণ যুগ'এর মাঝা মাঝি একটা পর্যায় সেখানে বর্তমান আছে। এ অবস্থাটা প্রাণীর উৎপত্তির পক্ষে সবিশেষ সহায়ক।' এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার পৃথিবী আদিম অবস্থায় যখন খুব উত্তপ্ত ছিল তখন পৃথিবীতে কোন প্রাণী জন্ম নিতে পারে নি। আবার হিম যুগে পৃথিবী যখন খুব শীতল ছিল তখনও পৃথিবীতে কোন সভ্য উন্নত জীবের অস্তিত্ব ছিল না। আমাদের পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা খুব বেশী ঠাণ্ডাও নয়, আবার খুব বেশী গরমও নয়।'

সুতরাং অন্য গ্রহ থেকে এ পৃথিবীতে যে কোন সভ্য প্রাণী আগমন করতে

পারে না বৈজ্ঞানিকদের এই সন্দেহ অমূলক মাত্র। উপরের হিসেবে আমরা দেখেছি পৃথিবীর মানুষের অন্য গ্রহে এবং অন্য সৌর জগতে যেতে গেলে শত শত, হাজার হাজার বৎসরের প্রয়োজন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন লণ্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ কালার ম্যাগাজিনে বৈজ্ঞানিক অ্যাড্‌ভিয়ান বেরী। তিনি হাইপার স্পেশ সম্বন্ধে পর পর কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তিনি তুলেছিলেন প্রফেসর জন্‌. এ. হুইলার আইস্টানের আপেক্ষিকবাদতত্ত্বের (সকল গতিই আপেক্ষিক এবং স্থান-কাল চতুর্থ মাত্রা, আইনস্টাইনের এই মতবাদ) যে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার কথা। এই আলোচনার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বেরী দেখালেন যে হাইপার স্পেশের ধারণাটা—অলীক কিছু নয়—এ ধারণার পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা রয়েছে। ডঃ হুইলার প্রিস্টন বিশ্ব বিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক এবং হাইড্রোজেন বোমার সহ-আবিষ্কারক।

১৯৬২ সালে প্রফেসর হুইলার লিখেছিলেন:—মহাশূন্যে আছে উত্তপ্ত গহ্বর অথবা অন্য বিশ্বে প্রবেশের প্রবেশ পথ। এই প্রবেশ পথকেই তিনি নাম দিয়েছিলেন সুপার-স্পেশ—অনেকটা সায়েন্স ফিকসন লেখকদের হাইপার স্পেশের মতো।

আইনস্টাইন দেখিয়ে গেছেন সোজা সরলরেখা বলতে কিছুই নেই। মহাশূন্যটা বাঁকানো, তারও আছে আঁকা বাঁকা পথ, তবে এই বক্রতা অভাবনীয় রকমের একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে। মহাশূন্যের সব কিছু বক্র কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়:—হেতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব।

ডেইলি টেলিগ্রাফ কালার ম্যাগাজিন ডঃ হুইলারের একটা ছবি ছেপেছিল। ছবি থেকে দেখা যায় তার হাতে রয়েছে একটা ডো-নাট। তার মাঝখানে একটা ছিদ্র। আরও একটা ডো-নাটের ছবিও তারা ছেপেছিল বিশ্বের প্রতীক হিসেবে। তারপরই লিখেছিল:—

ডো-নাটের বক্র শক্ত পৃষ্টের ওপরই রয়েছে সব নক্ষত্র এবং ছায়াপথ। ডোনাটের ভেতরের যে অপেক্ষাকৃত ফাঁপা অংশ সেটাই হলো রহস্যময় সুপারস্পেশ-স্থানকাল বলতে সেখানে কিছু নেই। সুতরাং ঐ সুপার-স্পেশের মধ্যে যাতায়াত খুবই সহজ। চোখের নিমিষেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যায়। এই সুপার স্পেশের মধ্যে দিয়ে যদি কোন মহাকাশযান কিংবা সংকেত পাঠানো যায় তাহলে গুরুত্ব্যাস্থলে

পৌঁছুতে বস্তুতঃ তার কোন সময় লাগবে না। কিন্তু, ঐ ডো-নাটের বক্র পৃষ্ঠ ধরে দি ওগুলোকে পাঠানো হয় তাহলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে তাদের সময় লেগে যাবে শতো শতো বৎসর।

এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ব্রিনস্‌লি লে পুর ট্রেঞ্চ বলেছেনঃ— সোজা কথায় বলতে গেলে স্পেশ মানে শূন্য নয়, এটাও শক্ত একটা কিছু। একটা সুমসৃণ আসবাবপত্রের ওপর শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে চোখ ফেললে তার মধ্যে যে রকম অসংখ্য ফাঁক ফোকর দেখা যায় ঠিক সে রকম মহাশূন্যেও অসংখ্য ফাঁক ফোকর রয়েছে।

এই হাইপার স্পেশ আমাদের মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেননি এখনো। তাই মহাকাশ যাত্রাটা তাদের কাছে এখনো এক বিভীষিকা। কিন্তু, অন্য গ্রহের সু-সভ্য প্রাণীরা হয়তো এই সুপার স্পেশটার সঙ্গে খুবই পরিচিত—তারা জানে সব ফাঁক ফোকরের কথা। তাই হয়তো মহাকাশযাত্রা তাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। তাই, যখন তখন তারা পৃথিবীতে আসতে পারে যেতে পারে। উড়ন্ত বস্তুগুলোর তাই হয়তো এতো সহজ সাবলীল ভঙ্গি।

জন ডব্লিও ক্যাম্পবেল একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ্ এবং সায়েন্স ফিক্‌সন লেখক। তিনি মহাজাগতিক কতকগুলো ক্ষুদ্রখণ্ড বা পরমাণু নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এসব ক্ষুদ্র কণা মহাকাশ থেকে ভেসে এসেছিল। সেগুলো ছিল প্রচণ্ড শক্তিতে ভরপুর। ১০২৭ ইলেকট্রন ভোল্টে পৌঁছুতেও তারা সমর্থ। এই সব কণা হাইড্রোজেন আইয়ন পর্যন্ত নানাবিধ পদার্থে গঠিত। কিন্তু, এই সামান্য পদার্থ কণা কি করে অসম্ভব রকম অবিশ্বাস্য গতিতে পৃথিবীতে এসে পড়তে পারে? ওদের গতিবেগ দেখলে মনে হয় গ্রহগুলোর মাঝখানে যে গ্যাস রয়েছে তাকেই যেন কে দম দিয়েছে এবং আলোর গতিকেও হার মানিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসছে। এই যে পদার্থকণাগুলো আলোর গতিকেও হার মানিয়ে তীব্রতম গতিতে পৃথিবীতে নেমে আসছে তা কার কারসাজিতে? কে তাদের প্রেরক? এমন যান্ত্রিক কলা কৌশল কার হাতে? ফার্মি, ক্লোভ্‌স্কি (Chklouski) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ক্যাম্পবেলের ব্যাখ্যা হল এই রকমঃ-সমগ্র বিশ্বটাই মহাকাশযানে

ভর্তি। আলোর গতিতেই তারা চলাফেরা করছে মহাকাশে। দুটো গ্রহের মাঝামাঝি গ্যাসকে তার গতিবেগ যখন প্রচণ্ড প্রকোপে উড়িয়ে নিয়ে যায় তখন দেখা যায় একটা পুচ্ছ। এবং ঐ গ্যাসের উত্তেজনার ফলেই জন্ম নেয় মহাজাগতিক রশ্মি যা পৃথিবী থেকে দেখতে পান বৈজ্ঞানিকেরা।

আমেরিকার পদার্থবিদ্ রবার্ট বুসার্ড একটা মহাকাশযানের পরিকল্পনা রচনা করেছেন। সে মহাকাশযানটা দু'গ্রহের মধ্যবর্তী গ্যাস 'আহরণ করবে বা হজম করবে একটা স্কুপের সাহায্যে। এই স্কুপটা থাকবে একটা বক্রাকৃতি বস্তুর মধ্যে। এই বক্রাকৃতি বস্তুর মধ্যে থেকে ওটা ফিউশনের সাহায্যে শক্তি উৎপন্ন করবে এবং এই রাসায়নিক পরিবর্তনের সাহায্যে যে প্রোপালশন ফ্লুইড তৈরী হবে তা ব্যবহার করবে। এই প্রোপেল্যান্টটা যুক্ত থাকবে মহাকাশযানের পশ্চাদভাগের সঙ্গে।

বৈজ্ঞানিকদের অনুমান—বিবিধ রকমের রহস্যময় যে সব বস্তুকে পাল্সার (pulsar) নামে অভিহিত করা হয় সেগুলো মহাকাশযানগুলোকে মহাকাশের অন্ধকারে পথ দেখাবার সংকেত ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং নক্ষত্রজগৎগুলোর মাঝখানে মধ্যিখানে যে অনেকগুলো মহাকাশযান ভেসে বেড়াচ্ছে ক্যাম্পবেলের এই সূত্রটা উড়িয়ে দেবার নয়।

প্রফেসর রোল্যাণ্ড ব্র্যাসওয়েল একজন জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি অস্ট্রেলিয় সরকারের অধীনস্থ রেডিও-টেক্‌নোলোজি সংস্থার ডাইরেক্টর। তিনি এবং আরও অসংখ্য বৈজ্ঞানিক একটা বিষয় নিয়ে অনেকদিন ধরে গবেষণা করে আসছেন। ১৯২৯ সাল থেকে তিনি এবং তার সহযোগীরা লক্ষ্য করে আসছেন:—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে যে বেতার বার্তা বা অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে অস্বাভাবিকভাবে সেগুলোর বিলম্বিত প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই একই ব্যাপার তারা লক্ষ্য করে আসছেন টেলিভিসনের ক্ষেত্রেও ১৯৫০ সালের পর থেকে। রোল্যাণ্ড ব্রাসওয়েল এবং তার সতীর্থরা এমন কতকগুলো টেলিভিসন প্রচার শুনতে পাচ্ছেন যেখান থেকে সে সব অনুষ্ঠান প্রচারিত হবার কথা সেই সব কেন্দ্রগুলো তিন চার বছর ধরে বন্ধ আছে। যে বেতার বার্তা প্রচারিত হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে তা শোনা যাচ্ছে সম্প্রতি। এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আসছেন স্টারমার এবং ভ্যান্-ভার পোল ১৯৩০ সাল থেকে। ব্র্যাসওয়েল এসব কিছু খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে

বিস্তৃত গবেষণা চালিয়েছেন। তার মতে আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহের মতো কতকগুলো কৃত্রিম স্বয়ংক্রিয় যান আমাদের বেতার সংকেত, বেতার বার্তা অনুষ্ঠান প্রভৃতি সংগ্রহ করছে এবং সেগুলো কোন অজানার উদ্দেশ্যে পুনঃপ্রচার করে চলেছে।

অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মতে ব্র্যাসওয়েলের এ ব্যাপারটা সন্তোষজনক। কারণ, বেতার বার্তা, রেডিও এবং টেলিভিসন—অনুষ্ঠানের বিলম্বিত প্রতিধ্বনির অন্য কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মহাশূন্যে এমন কোন বস্তু নেই যার ওপর বেতার তরঙ্গ প্রতিবিম্বিত হতে পারে এবং কয়েক মিনিট কয়েক মাস অথবা এক বছর পর ফিরে আসতে পারে পৃথিবীতে। সুতরাং, যারা এই সব বেতার বার্তা ও অনুষ্ঠান সংগ্রহ করছে তাদের রিকর্ডার বা নিবেশকগুলোর অধিকাংশ যে এ পৃথিবীর বুকে স্থাপিত তাতে সন্দেহ করার অবকাশ থাকতে পারে না।

পৃথিবীর বুকে অন্য গ্রহের প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা, অপার্থিব কোন সভ্যতার অস্তিত্ব থাকা এবং অন্য গ্রহের প্রাণীদের এ পৃথিবীতে আসা যাওয়ার এটা কি একটা গুরুতর প্রমাণ নয়?

গ্রহান্তরের মানুষদের উপনিবেশ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাপ্তেন কুক্ লিখেছিলেন :—

পৃথিবীর সর্ব দক্ষিণের অর্থাৎ দক্ষিণ-মেরুর অন্তর প্রদেশের রহস্য কে উদঘাটিত করতে পারে? কার আছে সে সাহস, সদিচ্ছা যে পারবে ঐ সব দেশ আবিষ্কার করতে? যে পারবে এ কাজটা করতে আমি তাকে অভিবাদন জানাব।

কাপ্তেন কুক্ যে দায়ীত্ব দিয়ে গেছেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের তা তারা আংশিক পূরণ করেছেন, ১৯৩৮—৩৯ সালে কাপ্তেন রিটচার'এর নেতৃত্বে যে অভিযাত্রী দল বেরিয়েছিল তাদের দুজন অভিযাত্রী সী-প্লেন থেকে একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলেন। একটা পার্বত্য জায়গা, শুধু বরফমুক্তই নয়, সুন্দর তক্‌তকে জলরাশি ঢেউ খেল বেড়াচ্ছে সেখানে। তাদের সেই অভিজ্ঞতার কথা সভ্য দুনিয়া কিছুটা জানলো। বিশেষজ্ঞ মহল ব্যাপারটাকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন অবশ্য। কিন্তু ১৯৪৭ সালে বির্ড'এর বৈমানিকেরা পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্যকে জোরালো সমর্থন জানালেন এবং সভ্য সমাজের কাছে তার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরলেন। জায়গাটার নূতন নাম হলো :- "গার্ডেন অব কুইন মেরী ল্যাণ্ড"। জায়গাটাতে পর পর কতকগুলো পাহাড়, অনুচ্চ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন, এখানে ওখানে সুদৃশ্য মনোলোভা সরোবর।' আমেরিকার ঐসব বৈমানিকেরা ওরকম তেইশটা সরোবর আবিষ্কার করলেন এবং বৃহত্তম তিনটে সরোবরের স্বচ্ছ জলে জল কেলী করে বেড়ালেন মুক্ত মনে। একটা স্বর্গীয় অনাবিল আনন্দ। বিমান থেকে ঐ রাজ্যের দৃশ্য দেখতে খুবই চমৎকার।

নীচে স্বচ্ছ জলের প্রবাহ। শুধু জল আর জল। খুবই নীল, আবার লাল এবং সবুজও দেখতে। নীচে অবতরণ করে তারা বুঝতে পারলেন লাল নীল সবুজ জলরাশি দেখবার কারণের পিছনে আছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অ্যালগি— সরোবরের ওপরে সবুজের জাল বিস্তার করে তারা ভাসছে। কিন্তু, শীঘ্রই তারা আর একটা আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা লাভ করলেন : ঐ অপূর্ব সুন্দর দেশের সরোবরের জলে হাত ডোবাতেই ওরা অনুভব করতে পারলেন জলের ঈষৎ উষ্ণতা। শুধু তাই নয়, আইচ বার্গ বা বরফের চাঁইয়ের নিকটবর্তী

সরোবরের কোন কোন অংশের জল বেশ গরম, কারণ কি? বরফের রাজ্যের জল গরম!

দুটো কারণ খুঁজে বের করলেন বিশেষজ্ঞরা। প্রথমতঃ আগ্নেয় লাভার-কারসাজি, দ্বিতীয়তঃ তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় অনুমানটা যদি ঠিক হয় (পিটার-কোলোসিমের মতে) তাহলে আমাদেরকে ধরে নিতেই হয় ঐখানকার মাটির নীচে অফুরন্ত ইউরেনিয়াম সম্ভার লুকিয়ে আছে। এগুলো হলো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। কিন্তু, এমন আরো অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন এবং যারা প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তাদের মতে ব্যাপারটা তা নয়। উইলিয়াম বেনেটের মতেঃ-ঐ পাহাড়, ঐ সরোবর, কনিফারের বাগান সবই হলো গ্রহান্তরের মানুষদের বাগান নগরীর একটা অংশ বিশেষ। ঐসব গ্রহান্তরের মানুষেরা ওখানে বাস করে আসছেন হাজার হাজার বৎসর ধরে। তাদের মেট্রোপলিশটা লুকিয়ে আছে অ্যাণ্টার্কটিকার বরফরাশির নীচে। সেখানে তাদের হাতে আছে শক্তিশালী শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। ওসব কেন্দ্রের শক্তিশালী তাপমাত্রাই ঐ অঞ্চলকে বরফের হাত থেকে মুক্ত করে রেখেছে। ষষ্ঠ মহাদেশে আমাদের অচেনা অথিতিদের হয়তো বিরাট একটা কস্‌মোড্রোম রয়েছে—যেখান থেকে তারা অন্য গ্রহে পাড়ি দেয় এবং অন্যগ্রহ থেকে অবতরণ করে। এই কথা কয়টি বলেছিলেন বেনেট ১৯৬৫ সালে।

তার এসব কথাগুলো কি অর্থহীন? তাহলে এ্যাণ্টার্কটিকায় অতো-বেশী উড়ন্ত পিণ্ডের আঁবির্ভাব ঘটে কেন? অতো সব অপ্রাকৃত দৃশ্যের অবতারনা হয় কেন? বেনেট অবশ্য এ কথা কয়টি বলেছেন তিব্বতীয় উপাখ্যানের সূত্র ধরে। তিব্বতের উপাখ্যানে আছে লেঙের কথা। লভ্‌ক্রাঁফ্টের পুনরাবৃত্তি করে বেনেট বললেন, লেঙ এশিয়ার কোথাও হতে পারে না। ওটা লুকিয়ে আছে এণ্টার্কটিকায়। জায়গাটার আর একটা রহস্য যতোই ওপরে ওঠা যায় ততোই উষ্ণতা অনুভব করা যায় বেশী। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম কেন? পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায় ঐ অঞ্চলের ঘনত্ব অর্ধেক মাত্র। এ জন্যেই কি ওখানকার উদ্ভিদ জগতে কান রকম পোকা মাকড়ের উপদ্রব নেই? বিশেষজ্ঞদের অভিমতঃ-মূলতঃ সমুদ্রের প্লাংকটন জাতীয় উদ্ভিদ খেয়েই ঐ অঞ্চলের প্রাণীরা বেঁচে থাকে। ঐ উদ্ভিদের আবার পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। সুতরাং, ঐ

অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীকে কোন সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকদের এই ব্যাখ্যাটা কিন্তু মোটেই সন্তোষজনক নয়। তাহলে উচুঁ ধরনের কোন রকম এন্টিসেপটিক ওখানকার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ? অনেকের বিশ্বাস ঐ অঞ্চলে এমন কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা মাকড় আছে যেগুলোকে হয়তো অন্য গ্রহ থেকে আমদানি করা হয়েছে। ঐসব ক্ষুদ্র জীব পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। ওরা শুধু বহাল তবিয়তে আছে অ্যান্টার্কটিকাতেই। তাহলে কি এ সিদ্ধান্তই নিতে হয় যে, যে সব গ্রহের প্রাণী ওরা সে সব গ্রহের প্রকৃতি পরিবেশ আবহাওয়ার সঙ্গে অ্যান্টার্কটিকার যথেষ্ট মিল?

একটা পুরোনো দিনপঞ্জী অনুসারে ৩১ শে জুলাই এবং ১লা আগষ্টের রাত্রিগুলোতে বিশেষ করে ভোর বেলায় কিউস্ দ্বীপপুঞ্জের সাগরে একটা অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। অসংখ্য কমলা রঙের বাতি জলের উপরে ভাসতে থাকে। সাগরের জলে কে যেন হাজার হাজার বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে—এমন একটা অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। ওসব কি জেলে নৌকোর আলো? অতোগুলো জেলে নৌকো? না হয় জেলে নৌকোই হলো, কিন্তু যে সময় সমুদ্রে কোন জেলে নৌকোর অস্তিত্বই থাকার কথা নয় সে সময়েই কেন চোখে পড়ে ঐসব বাতিগুলোকে?

এই অলৌকিক ঘটনার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে জাপানের টাইমস্ লিখেছিলেনঃ—কতকগুলো মন্দিরকে সাজিয়েছে যেন কেউ অদ্ভুত সুন্দর কতকগুলো উজ্জ্বল গোলাকার পদার্থ দিয়ে। এসব গোলাকার পদার্থ পৃথিবীর (মনুষ্য সমাজে) কোথাও দেখা যায়না, মানুষের সৃষ্ট কোন পদার্থের সঙ্গেই এর তুলনা চলেনা। তাদেরকে দেখলে মনে হয় কতকগুলো উজ্জ্বল চাকতি। যে অত্যুজ্জ্বল আলোয় বিচ্ছুরিত ওসব চাকতি তা দেখলে মনে জাগে একটা অপার্থিব রেশ। জোমোন চাকতির সঙ্গে ওসব চাকতির অবশ্য অনেকটা মিল। পুরাবস্তুবিদ্‌রা ঐ জোমন চাকতিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহাকাশযান বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি রহস্যজনকভাবে যেসব জাহাজ সমুদ্রের মাঝখান থেকে হারিয়ে যায় তাদের কথা। ১৮৭২সালের নভেম্বর মাস। জেনোয়া অভিমুখে পাড়ি দিয়েছিল মেরী সেলিস্টে নিউইয়র্ক থেকে।

তাতে ছিল বারোজন নাবিক। ডিসেম্বরের দু'তারিখ ওটাকে দেখা গিয়েছিল ইউরোপের উপকূলে। ডিসেম্বরের চার তারিখ ওটাকে দেখেছিল ব্রিটীশ জাহাজ ডি, গ্র্যাসিয়া। কিন্তু, ডি, গ্র্যাসিয়ার কাপ্তেন আশ্চর্য হলেন মেরী সেলিস্টে থেকে তার দেওয়া সিগন্যালের প্রত্যুত্তর না পেয়ে। ব্রিটিশ জাহাজটা আরও কাছে এগুলো। ডেকে অথবা হালে কাউকে দেখা গেল না। জাহাজটাতে কোন সাড়া শব্দ নেই। জনমানবশূন্য জাহাজটা। কিন্তু, এরা সব গেল কোথায়? জাহাজের অবস্থা থেকে বুঝবার জো নেই যে সাংঘাতিক কিছু হয়েছে। টেবিলের ওপর প্রাতঃরাশ, ডেক্‌টা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তক্ তকে, লাইফবোটগুলো সঠিক জায়গায় ঝুলছে। এই মাত্র ধোয়া কাপড় চোপর শুকোতে দেওয়া হয়েছে। স্টোররুমে পর্যাপ্ত খাদ্য দ্রব্য। ব্রিটিশ নাবিকেরা জাহাজটার আপাদমস্তক তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু একটা মৃত দেহের অথবা একটা জীবিত লোকেরও খোঁজ পেলেন না। ব্যাপারটা কি? যদি নাবিকদেরকে কেউ বাধ্য করতো জাহাজটা ত্যাগ করতে তাহলে তারা জীবনতরী বা লাইফবোটগুলো ব্যবহার করতে পারত; নাবিকদের মধ্যে যদি বিদ্রোহ দেখা দিতো তাহলে একটা বিশৃঙ্খলার লক্ষণ পরিস্ফুষ্ট হয়ে উঠতো জাহজের বুকে। জাহাজের কাপ্তেন তাব সামনের বোর্ডে যা লিখেছেন তার শেষের একটা বাক্য থেকে গেছে অসম্পূর্ণঃ-অত্যাশ্চর্য একটা ঘটনার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি আমরা!

সোভিয়েত জার্নাল টেক্‌নোলোজি এণ্ড ইয়ুথ এবং লেখক জর্জ ল্যাঙ্গিল্যান তার লেস্ ফেইট্‌স ম্যানডিট্‌স' নামক বইতে এরকম রহস্য-জনক অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৯৪৫ সালের ৫ই ডিসেম্বরের বিকেল বেলা। ফ্লোরিডার ল্যানডার-ডেইল দুর্গ থেকে পাঁচটে টর্পেডো বোম্বার রওয়া হয়ে গিয়েছিল। আবহাওয়া ছিল খুবই ভালো, সমুদ্র ছিল শান্ত। বেলা তিনটে পঁয়তাল্লিশে সেগুলো যখন রুটিন মাফিক ওড়া শেষ করে ফিরে আসছিল তখন দুর্গের র‍্যাডার থেকে দেখা গেল তারা সঠিক পথে আসছে না। তারপরই কণ্ট্রোল টাওয়ার পাইলটের কাছ থেকে সামঞ্জস্যহীন একটা খবর পেল:—তারা তীরভূমি দেখতে পাচ্ছেনা এবং তারা জানেনা তারা কোথায়। পর পর আরও কতকগুলো বার্তা ধরা গেল, সেগুলোও সামঞ্জস্যহীন। কণ্ট্রোল

টাউয়ারের ভদ্রলোক মহাশয় ভড়কে গেলেন। তার মনে হলো পাইলটরা সব পাগল হয়ে গেছে। তারা একটুও ভীত সন্ত্রস্ত নয়। তারা পরস্পরের মধ্যে এমন সব কথা বার্তা বলাবলি করছিল যার পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হচ্ছিল না ভদ্রলোকের পক্ষে। তবে এটে ঠিক বোঝা গিয়েছিল তারা বাহামাস এবং বারমুডার মধ্যিকার সমুদ্রাঞ্চলে (বারমুড়া ট্র্যায়নগলে) ছিল। চারটে পঁয়তাল্লিশের সময় একটা স্পষ্ট বার্তা ভেসে এলোঃ—আশ্চর্যজনক সমুদ্র, অস্বাভাবিক সমুদ্র, অস্বাভাবিক অপূর্ব দৃশ্য!' মেরী সিলেস্টের কাপ্তেনও'ত লিখে গেছেন এই অত্যাশ্চর্য দৃস্যের কথা। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ থেকে মস্ত বড়ো একটা সীপ্লেন পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ওটে উত্তর পূর্ব দিকে উড়ে গেল তের জন সমুদ্র-অনুসন্ধান বিশেষজ্ঞদের নিয়ে। দশ মিনিট পরেই ওটের সঙ্গে বেতার সংকেত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। ওটাও নিখোঁজ হয়ে গেল!

আশ পাশের সব নৌ-কেন্দ্রে খবরটা ছড়িয়ে দেওয়া হলো। কয়েক ডজন প্লেন বারমুড়া ট্র্যায়নগলে উড়ে বেড়াল, তার সঙ্গে দুশোর উপর জেলে নৌকো, ইয়কট (yachts) এবং যুদ্ধ জাহাজ। সমুদ্রের প্রত্যেক জলকণা অনুসন্ধান করা হলো বুঝি। তবুও একটিরও খোঁজ মিললো না। আকাশ ছিল তখন সুনির্মল। সমুদ্র ছিল সুশান্ত, বায়ু প্রবাহ ছিল খুবই স্বাভাবিক। আমেরিকার নৌ-বাহিনী এ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট বের করলেন তাতে বলা হলো :—কেউ জানে না ১৯৪৫'র ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ কী ঘটেছিল।

এ ছাড়া আরও কয়েকটা নিখোঁজের খবর দেওয়া যেতে পারে। ১৯৪৯'র ১৭ই জানুয়ারী একটা মস্ত বড়ো বিমান বারমুড়া থেকে জামাইকার পথে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৩'র ফেব্রুয়ারীতে নিখোঁজ হয়েছিল মেরীন সালফার কুইন। ১৯৬৩'র জুলাইতে নিখোঁজ হয়েছিল 'স্নো বয়, নামে একটা ট্রলার। ১৯৬৯'র ২৮শে আগস্ট নিখোঁজ হয়েছিল দুটো ট্যাঙ্কার প্লেন।

কী এ সব অন্তর্দ্ধানের রহস্য? যারা এ সব ঘটনাবলীর নায়ক তাদের তুলনায় পৃথিবীর সভ্য মানুষ যে অবোধ শিশুমাত্র এ উক্তিটা কি আতিশর্য দোষে দুষ্ট?

ফেব্রুয়ারীর বারো তারিখ নিউজিল্যাণ্ড 'স্পেশভিউতে' একটা খবর বেরিয়েছিল :—একজন পাইলট কাইটারার অকল্যাণ্ড বিমানক্ষেত্র থেকে পরীক্ষামূলক বিমান চালনা শুরু করেছিলেন। পশ্চিম উপকূল বরাবর কিছুটা নীচুতে তিনি প্লেনটা চালিয়েছিলেন। কাইপারা বন্দরের কাছাকাছি

জায়গায় তিনি কি যেন একটা দেখলেন—প্রথমটা মনে হয়েছিল ফাঁদে-পড়া একটা তিমি। আরও নীচে নামলেন। এবারে দেখলেন—না তিমি নয়, কোন জন্তুই নয়, ধাতুতে গড়া একটা যান। ওটে দেখতে মোটেই একটা সাবমেরিনের মতো ছিল না।

তার আরও আগেকার একটা ঘটনা। ১৯৫৫ সালের ১১ই এপ্রিল মেলবোর্ণের দক্ষিন পশ্চিমে ওনথাগি শিলার ওপর বসেছিল দুজন লোক। তারা দেখছিল কি ভাবে তাদের মাছ ধরার নৌকাটা ডুবে যাচ্ছিল। এমন সময় তারা দেখলো দুটো আশ্চর্য রকম বস্তু পিণ্ডকে জলের উপরে উঠে আসতে। ঐ দুটোকে অবশ্য তাদের মনে হয়েছিল দুটো ডুবো জাহাজ। অষ্ট্রেলিয়ার নৌ কতৃপক্ষকে খবরটা জানাতেই তারা ব্যাপারটা স্রেফ অস্বীকার করে বসলেন। 'না মশায়, কোন সাবমেরিন এখন সমুদ্রে নেই। এ অঞ্চলে আদৌ কোন সাবমেরিনের অস্তিত্ব নেই।' (২১)

এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি রহস্যজনক ভাবে যে সব জাহাজ সমুদ্রের মাঝখান থেকে হারিয়ে যায় তাদের কথা। কারা ওসব জাহাজকে টেনে নিয়ে যায় মানুষের দৃষ্টি শক্তির বাইরে? আচ্ছা, সমুদ্রের নীচে কি কোন নগরীর পত্তন হতে পারে না? সমুদ্রের নীচে কি থাকতে পারে না গ্রহান্তরের মানুষদের উপনিবেশ?

একসময়, রবার্ট চার‍্যাউস্ক লিখেছিলেন:—পসিডনের ঘোড় সোয়ারদের (Horsemen of Poseidon) কথা। ১৫০০০ হাজার লোকের গুপ্ত নাজী বাহিনীর একটা প্ল্যান হলো তারা সমুদ্রের গর্ভে অপ্রকাশ্য একটা নগরী গড়বে। সে নগরীর থেকে তারা বিরাট সামুদ্রিক অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে। তারা তখন ফ্রান্সের, ব্রিটেনের, আমেরিকার পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন জলযানগুলোকে অপহরণ করবে এবং নতুন নগরীটার জন্য পর্যাপ্ত পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহ করবে সেগুলো থেকে।'

নাজিরা যদি সমুদ্রের নীচে উপনিবেশ গড়তে পারে কিংবা গড়বার পরিকল্পনা করতে পার তাহলে গ্রহান্তরের মানুষ পারবেনা কেন?

পর্বতে পর্বতেও আছেন গ্রহান্তরের মানুষেরা। এদের কাছ থেকেই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলো সভ্যতার সম্পদ আহরণ করেছে। আমাদের শঙ্করাচার্য থেকে বুদ্ধদেব সবাই ঋণী ঐ হিমালয়ের কাছে।

চীনা কাব্যে এবং পুরাণেও উড়ন্ত রথ বা বিমানের উল্লেখ আছে।

খৃঃ পূর্ব তিন'শ চার'শ বছর আগে চু'ইয়ান যে 'লি সাও' কাব্য রচনা করেছিলেন তাতে উল্লেখ আছে :—তিনি যখন সম্রাট সান'এর কবরে নতজানু হয়ে বসেছিলেন তখন একটা রথকে টেনে নিয়ে এসেছিল চারটে প্রকাণ্ড দৈত্য। তিনি সে রথে উঠে বসলেন। সেটা তীব্র বেগে উড়ে চলে গেল কুন্‌লুন্ পর্বতের দিকে।

১৭৭৬ খৃঃ পূর্বাব্দে সাঙ্গ রাজবংশের সম্রাট চেঙ্গ টাঙ্গ নাকি কঙ্গসাকে একটা উড়ন্ত রথ তৈরী করবার জন্যে আদেশ দিয়েছিলেন। তার আদেশ মতো ঐ রকম একটা রথ তৈরীও হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো এই বিমান তৈরীর সু-উন্নত কলা কৌশল চীনারা শিখেছিলেন কার কাছ থেকে? ঐতিহাসিকদের মতে চীনাদের ঐ সময়ে অতো উন্নত কলা কৌশল আয়ত্ব করার ও থাকার কথা নয়।

তাহলে? চীনা সম্রাট এবং চীনা পণ্ডিতরা অতো ঘন ঘন কুঙ্গ লুঙ্গ পর্বতে উড়ে যেতেন কেন? তাহলে কি চীনাদের যারা সভ্য করে তুলেছিল, বিভিন্ন জ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিল তারা কুঙ্গ লুঙ্গ পর্বতে বাস করতেন?

হ্যাঁ, এখনো বাস করেন শুধু কুঙ্গ লুঙ্গ পর্বতেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বত মালায় তাদের বাস। এ বিষয়ে আরও একটু বেশী আলোচনা করা যাক্।

মানুষের পরমারাধ্য দেবতারা (হিন্দু শাস্ত্র মতে তেত্রিশ কোটি) এখনো পৃথিবীতে বাস করেন এবং তাঁদের বাসস্থানের যে বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে সে সম্বন্ধে ভারতবর্ষ, তির্বত, রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খবর পাওয়া গেছে।

রাশিয়ার জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটীর (১৯০৩) জার্নালে কোরো—লেংকোর লেখা 'য়ুরালের কোসাকদের বেলভোডিয়ে রাজ্য ভ্রমণ নামে একটা প্রবন্ধ বেরোয়। ঠিক একই ভাবে কৌতুহলী হয়ে পশ্চিম সাইবেরিয়ার ভৌগলিক সমীক্ষা সমিতির বোলাশ্লিউ ভোভ ১৯১৬ সালে 'বোলো ভাডিয়ের ইতিহাস' নামে একটা বই লেখেন। দুটো প্রবন্ধেই রাশিয়ার পুরানোপন্থীদের মধ্যে যে সব অদ্ভুত আশ্চর্য রকমের প্রথা সব প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর কথা পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস পৃথিবীর স্বর্গ রয়েছে 'বেলোভেডিয়ে' অথবা 'বেলোগোরিয়ে'র কোথাও—ওটা হলো সাদা জল এবং শ্বেত পর্বতের দেশ। এ প্রসঙ্গে আমরা যদি স্মরণ করি যে, উত্তর সম্বল শ্বেত দ্বীপটার ওপর অবস্থিত তাহলে তা কিছুটা অর্থবহ হবে নিশ্চয়। (২২)

আচ্ছা, সাগর মহাসাগরে গ্রহান্তরের কি মানুষদের কোন ঘাঁটি আছে? সাগরের জলে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বিস্ফোরনের শব্দ শোনা যায়। কিসের বিস্ফোরণ? এ বিস্ফোরণের শব্দ বেশী শোনা যায় সেই সব অংশেই যেখানে প্রায় সময়ই কোন না কোন রকম অপ্রাকৃত দৃশ্য চোখে পড়ে। অদৃশ্য কামান বা বরিসালের কামানের কথা কেউ শুনেছেন? গঙ্গা নদীর মোহনায় সুন্দরবন অঞ্চলে এ রকম শব্দ নাকি শোনা যায়। এই বরিসালের কামানের শব্দ শুধু বাংলা দেশেই শোনা যায় না। শোনা যায় অস্ট্রেলিয়াতে, শোনা যায় আইসল্যাণ্ডে, শোনা যায় রকি পর্বতে, হিমালয় পর্বতে।

বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে সাগরে আছে গ্রহান্তরের মানুষদের সাবমেরিন এ্যাস্ট্রোপোর্ট। এখানেই এসে নামে গ্রহান্তর থেকে বড় বড় সব মহাকাশ-যান। কিন্তু কোন মহাকাশযান কি সমুদ্রে নামতে পারে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তা নেওয়া যাক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা যান আবিষ্কার করতে চেয়েছিল যেটা জলের মধ্যে ডুব দেবে সাবমেরিন বা ডুবো জাহাজের মত। কখনো বা জলের উপরে ভাসবে হাঁসের মতো, কখনো বা হংস বলাকের মতো উড়ে যাবে আকাশে। কিন্তু, আমেরিকা এ ধরনের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে। আমেরিকা না পারলেও অন্য গ্রহের সুসভ্য মানুষের পক্ষে এ রকম যান আবিষ্কার করা কি অসম্ভব?

আর্জেন্টিনার সামরিক কর্তৃপক্ষকে ক্রুশ্চেভ নাকি একটা চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন নুয়েভো উপসাগরে একটা রহস্যজনক বস্তুর ওপর বোমা বর্ষণের কথা সত্য কিনা। আর্জেন্টিনা কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন বোমা বর্ষণের সাহায্যে ঐ রহস্যজনক বস্তুটাকে বাগে আনতে। ঐ উপসাগরকে এমন ভাবে ঘিরে ফেলা হয়েছিল যাতে কোন দিকে কোন কিছু পালিয়ে যেতে না পারে—সে বস্তুটা যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন। হাঁক ডাকে কোন কাজ হবে না জেনে কর্তৃপক্ষ সাগর জলের গভীরে বোমা বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু জলের মধ্যে থেকে উঠে আসলো না কোন কিছুই। তদুপরি চারিদিকে রটে গেল আরও দুখানা ডুবো জাহাজ প্রথমটার সংগে গিয়ে মিশেছে। জলের নীচে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হতে লাগলো, আর কালো দেখতে কতকগুলো প্রাণী ঢেউয়ের আনাচে কানাচে, জাহাজের তলা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

দ্বিতীয় বারের জন্যে আরও প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের যখন প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল তখন কিন্তু সোনিক ডিভাইসের সাহায্যে জানা গেল জাহাজের তলায় কোন রকম রহস্যজনক বস্তুর অস্তিত্ব নেই। (২১)

১৯৬০ সালে পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্রে এ রকম আরও অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারী কয়েকজন আমেরিকাবাসীকে তাড়া করেছিল একটা নাম না জানা বস্তু, যার গতি ছিল অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষিপ্র। ঘটনাটা ঘটেছিল ক্যারিবিয়ান সাগরে। তারপরের দিন ভূমধ্য সাগরে প্রেসীডেন্ট নাসেরের একটা ইয়টকে তাড়া করেছিল একটা ডুবো জাহাজ। ১৫ই মার্চ সিয়াটলের অদূরে সমুদ্র গর্ভে দেখা গিয়েছিল অচেনা একটা বস্তুকে। নিউইয়র্ক বন্দরে পেট্রল ট্যাঙকার অ্যালফাইড-এর সংঘর্ষ হয়েছিল (জুলাই মাসে) অজানা অচেনা অর্ধডুবন্ত বস্তুর সংগে। এ সংঘর্ষে পেট্রল ট্যাঙ্কারটার খুবই ক্ষতি হয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাসে এই রহস্যজনক বস্তুগুলো উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভেসে উঠেছিল। অক্টোবর নবেম্বর মাসে সেগুলোকে দেখা দিয়েছিল হাওয়াইতে বহিয়া ব্ল্যাঙ্কাতে এবং টেরাডেল্ ফুয়েগের উপকূলে।

মানুষের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্টতর জীব যে পর্বতে পর্বতে বাস করেন আমেরিকার আদিবাসীদের ও সে বিশ্বাস। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের পুরাণ কাহিনী অনুসারে কালিফোর্নিয়ার সাস্তা পর্বতের এমনি একটা মাহাত্ম্য আছে। একটা উপাখ্যানে আছে, সর্বগ্রাহী বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে রাজা কোরোটি সাস্তা পর্বত শিখরে আরোহণ করেছিলেন। বন্যার জল তাকে তাড়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারিনি তাকে। সেই পর্বতের শিখরটাই শুধু ছিল শুষ্ক। কোরোটি আগুন জাললেন সেই শিখরে। যখন বন্যার জল সরে গেল তখন কোরোটি আগুন উপহার দিয়েছিলেন তাদেরকে যারা বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন। এসব উপাখ্যানে এমন তথ্যও আছে যে আকাশের দেবতাদের প্রধান সস্ত্রীক সপরিবারে সাস্তা পর্বতে অবতরণ করতেন। পৃথিবীর থেকেও যে মানুষ আকাশ রাজ্যে পরিভ্রমণের জন্যে যেতেন তাও জানা যায় ওসব উপাখ্যান থেকে।

আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস, সাস্তা পর্বতে এখনও দেবতারা বাস করেন। তাদের এ বিশ্বাসের অনুকূলে কিছু বলা যাক। কালিফোর্নিয়াতে

নতুন স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার অব্যবহিত পরের ঘটনা। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজন স্থানীয় কৌতূহলী লোক বললে :—সাস্তা পর্বতে তারা এক রকম রহস্যময় আলোকচ্ছটা দেখতে পেয়েছে। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশের নীচে ও রকম আলোচ্ছটা মাঝে মাঝে দেখা যায় ঐ পর্বতে। দিনটা মেঘমুক্ত ছিল বলে এটে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে আকাশের বিজলীর চমকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। ঐ অঞ্চলের ধারে কাছে কোথাও তখনো বিজলি বাতি যায়নি। তাহলে কিসের ঐ আলোকচ্ছটা? এই'ত গেল অতীতের কথা, মাউন্ট সাস্তায় এখন মোটর চলাচলের পাকা রাস্তা হয়েছে—সভ্য সমাজের কাছে খুলে গেছে তার দ্বার। কিন্তু, যে সব প্রাইভেট কার ঐ পর্বতে ওঠে তাদেরকে ইগ্‌নিসন ট্রাবলের সম্মুখীন হতে হয়—(অর্থাৎ এঞ্জিনে বিস্ফোরক গ্যাস সমূহ মিশ্রনের ফলে আগুন জ্বলে ওঠে) বিশেষজ্ঞরা এর কোন সহজ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

১৯৩১ সালে একটা দাবানল প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছিল সাস্তা পর্বতে। সে দাবানল অনেকেই দেখেছিল। কিন্তু, দাবানল বেশীদূর ছড়িয়ে পড়বার আগেই কোত্থেকে রহস্যময়—কুয়াশার আবির্ভাব। ঐ দাবানলের বিধ্বংসী তাণ্ডবের চিহ্ন মানুষের চোখে পড়েছিল বহু বছর ধরে: সেই দাবানলের পোড়া দাগটা সম্পূর্ণ বক্রাকারে রূপ পেয়েছিল। মাঝখানকার অংশে কোন ক্ষয় ক্ষতি করেননি অগ্নিদেব।

১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলস টাইমসে একটা প্রবন্ধ বেরোয়। লেখক এডওয়ার্ড ল্যানসার। তিনি সাস্তা পর্বতে যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছিলেন যে ঐ পর্বতে অপ্রাকৃত একটা সম্প্রদায় বাস করে আসছে বহু বছর ধরে। এ জাতীয় লোকেরা দেখতে ধবধবে সাদা, বেশ লম্বা চওড়া, কোঁচানো চুল, কপালের মাঝখানটাতে ডোরাকাটা—দেখলে একটা সম্ভ্রমভাব জাগে মনে। আশ পাশের দোকানদাররাও বলে :—হ্যাঁ, ওরা আসে জিনিস পত্তর কিনতে—তবে কচিৎ। তাঁরা জিনিসের বদলে টাকা দেয় না, দেয় সোনার তাল। তাই ব্যবসায়ীদের আফশোষ—ওরা যদি ঘন ঘন আসতো আর সোনার তাল দিয়ে জিনিস পত্তর কিনতো! ওরা পরে সাদা পোষাক। বনের মধ্যে যদি মানুষ দেখে ত চটপট আত্মগোপন করে, আর সামনা সামনি পড়লে অদৃশ্য হয়ে যায় হঠাৎ।

অপূর্ব সুন্দর সব গরু ছাগলেরা পর্বত গাত্রে চড়ে বেড়ায় মাঝে মাঝে। আমেরিকার কোন গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে তাদের মিল নেই। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়; রকেটের মত দেখতে বায়ুযানও দেখা যায় সাস্তা পর্ব্বতে। সে সব যানের কোন পাখা নেই, শব্দও নেই। কোন কোন সময় ঐ সব যান প্রশান্ত মহাসাগরে একটা মাছরাঙা পাখীর মতো ডুব দেয় নিঃশব্দে—ডুবো জাহাজের মতো সমুদ্রের তলায় ভেসে বেড়ায়।

এরাই কি তাহলে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের উপাখ্যানের সেই সব দেবতারা? মেক্সিকোতেও এ রকম রহস্যময় লোকেরা বাস করে মনে করা হয়ে থাকে। হ্যারল্ড টি উইলকিনস্ লিখেছেন: (২৫) কোন এক অজানা দেশের লোক রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে হামেশাই দ্রব্য বিনিময় করে। তারা জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কোন নগরীর নাগরিক হবে হয়তো।

বিশের দশকে সাঙ্গ হাইয়ের একটা সংবাদ পত্রে ডাঃ লাউসিনের লেখা একটা প্রবন্ধ বেরোয়। বিষয়টা ছিল মধ্য এশিয়ার স্বর্গরাজ্যে পরিভ্রমণ। ঘুরতে ঘুরতে এই কৃতী শল্য চিকিৎসক একজন নেপালী যোগীর দেখা পেয়েছিলেন। দুজনেই উৎসাহী। নির্জন পরিত্যক্ত উত্তর তিব্বতের পার্ব্বত্য প্রদেশে তারা ঘুরছিলেন আপন মনে। হঠাৎ তারা একটা উপত্যকা দেখতে পেলেন। উপত্যকাটা সহজে চোখে পড়বার মত নয়। নিতান্তই তাদের বরাত ভাল তাই। তারা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন:— উপত্যকার আশে পাশে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া, কিন্তু উপত্যকার ভেতরটা বেশ উষ্ণ, যেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের চমৎকার কৌশল জানে এই উপত্যকার বাসিন্দারা। ডঃ লাউ সিন সেখানে 'সম্বলের স্তম্ভ' দেখেছিলেন। সেখানকার অধিবাসীরাও তাকে আপ্যায়িত করেছিলেন, দেখিয়েছিলেন তাকে তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। ঐ উপত্যকার অধিবাসীদের বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তি ও আবিষ্কার দেখে ডঃ লাউসিন বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি দেখলেন এই উপত্যকার অধিবাসীরা টেলিপ্যাথির সাহায্যে অনেক দূর দূরান্তরের সংগে সংযোগ রেখে চলেছে। ঐ উপত্যকার অধিবাসী, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের সভ্যতা সম্বন্ধে ডঃ লাউসিন হয়তো অনেক কিছুই বলতেন। কিন্তু, তিনি ঐ উপত্যকাবাসীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পৃথিবীর দাম্ভিক মানুষের কাছে তিনি তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবেন না। (২৩)

উত্তর সম্বলের প্রাচ্য কিংবদন্তি অনুযায়ী— যেখানে আজ শুধু লবণাক্ত

হ্রদ আর ধূ ধূ বালি সেখানে (মধ্য এশিয়ায়) নাকি এক সময় বিরাট একটা সাগর ঢেউয়ের খেলায় মত্ত থাকতো। সে সাগরের মাঝখানে ছিল একটা দ্বীপ। সে দ্বীপটা এখন শুধু পার্ব্বত্যময়, বন্ধুর। কিন্তু ঐ শ্বেত দ্বীপটাতে এক সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। উর্ধাকাশের অনেক উঁচু থেকে —আকাশের নীল থেকে কি যেন একটা প্রচণ্ড শব্দে নেমে আসছিল। তার চারদিকে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। আকাশটা সেই প্রদীপ্ত দহনে হয়ে গিয়েছিল লালে লাল। ঐটে ছিল অগ্নি পুত্রদের রথ। সে রথটা ঘুরতে ঘুরতে এসে নামলে. গোবি সমুদ্রের শ্বেত দ্বীপটাতে, দ্বীপটা তখন হাসছিল আনন্দে—মঙ্গল গ্রহ থেকে দেবতাদের আগমন বলে কথা।

এটে কি শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের একটা মন মাতানো গল্প? তাহলে সাইবেরিয়ার টাঙ্গাসকায় সম্প্রতি একটা অপ্রাকৃত রহস্যময় আকাশযান ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল— এবং যা নিয়ে তর্ক বিতর্কের ঝড় উঠেছিল চারদিকে সে জিনিসটা কি? উপরোক্ত এ ঘটনা যে আজ বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে প্রসঙ্গটা আলোচনা করেছি পূর্ব অধ্যায়ে।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। টাওয়িষ্টদের পিতা লাউ সো, দেবী সি ওয়াঙ্গ মূ'র খোঁজে বেরিয়েছিলেন। এবং তাঁকে পেয়েছিলেন। টাওয়িস্টদের মতে দেবীরা হাজার হাজার বছর আগে অমর ছিলেন। অমরত্ব লাভ করবার পর দেবী ওয়াঙ্গ মূ কুংলুং পর্ব্বতে গিয়ে আশ্রয় নেন। চীনা সন্ন্যাসীদের মতে ঐ কুং লুং পর্বতে এমন একটা আশ্চর্য সুন্দর উপত্যকা রয়েছে যেটাকে দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। তবে কোন ভ্রমণকারী সেটে চিনে নিতে পারবেন না স্থানীয় লোকদের সহায়তা ছাড়া। ঐ উপত্যকায় রাজত্ব করছেন সি ওয়াঙ্গ মূ। তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন দেবতাদের।

স্থানীয় লোকদের এ সব কথা না হয় হেসে উড়িয়েই দিলাম, কিন্তু কারা কোরাম পর্বতে রুরিচ (Nicholas Rocrids) অভিযাত্রী দল যে অপূর্ব আকাশযান প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা কি যথেষ্ট অর্থবহ নয়? ঐ আকাশযানটা হয়তো দেবতাদের কোন এ্যারোড্রাম কিংবা স্পেশড্রোম থেকেই এসেছিল। ঐ কারা কোরাম পর্বত আবার কুং লুং পর্বতমালার সন্নিকটেই।

নিকোলাস রুরিচ সতীর্থদের সঙ্গে আটলাই পর্বতে পরিভ্রমণ করবার সময় জানতে পেরেছিলেন প্রশস্ত সব হ্রদ আর সু উচ্চ পর্বত মালার ওপারে

রয়েছে একটা 'গুপ্ত উপত্যকা'। অনেকেই সে বেলোভেডিয়েতে যাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি তাদের কেউ। অবশ্য পুন্যাত্মাদের কেউ কেউ সেখানে গেছেন, কিছুদিনের জন্যে বসবাসও করেছেন সেখানে। নিকোলাস রুরিচের মতে দুজন ভদ্রলোক গিয়েছিলেন সেই স্বর্গরাজ্যে, বসবাস করেছিলেন ক্ষণস্থায়ী ভাবে। তারা ফিরলেন, বললেন তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বিস্ময় বমুগ্ধ। কিন্তু, অনেক কিছুই বললেন না। সব কিছু বলা নিষেধ।

খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ট শতাব্দীতে লাউ সে যে অভিজ্ঞতার কথা বলে গেছেন উনবিংশ শতাব্দীর ভদ্রলোক দুজনের অভিজ্ঞতার সংগে তার মিল আছে। বিভিন্ন পর্বতমালার গুপ্ত উপত্যকাগুলোতে যারা বাস করে তারা যে বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নত সে সম্বন্ধে একটা গল্প বলেছেন রুরিচ। একজন তিব্বতী লামা ওরকম একটা উপত্যকা থেকে তার ধর্ম্মশালায় ফিরছিলেন। তার সংগে দুজন লোকের দেখা। তারা একটা সরু পার্বত্য পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সংগে একটা মেষ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশু প্রজননের জন্যেই ওটাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। (২৪)

ভ্যাটিক্যানের গীর্জাবাসীদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব প্রচারক ধর্ম্ম প্রচারে বেরিয়েছিলেন তাদের কতকগুলো মূল্যবান তথ্য আছে। ঐ তথ্য থেকে জানা যায় চীনের সম্রাটরা নাকি পর্বতের দেবতাদের কাছে প্রতিনিধি-দল প্রেরণ করতেন। তবে মিশনারীদের ঐ সব দলিলে চীনা সম্রাটের লোকেরা কোন পর্বতে যেত তার সঠিক কোন উল্লেখ নেই। তবে, চাঙ টাঙ্গ, কুনলুঙ অথবা হিমালয় পর্বতেই যে তারা যেতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এল্ ট্যাইলর লিখেছেন এক আমেরিকা দম্পতির অভিজ্ঞতার কথা। ইউকটান্ জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল দুজনে একটা প্রাইভেট প্লেনে করে বেশ কয়েক বছর আগে। বিমানের জ্বালানি গেল ফুরিয়ে। বাধ্য হয়ে তাই তাদেরকে নেমে পড়তে হলো সেই জঙ্গলে। জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তারা একটা পুরোনো শহরে এসে পড়লো। সেটি ম্যায়াদের শহর। আকাশ থেকে বিমানে করে সমীক্ষা চালাবার সময় ঐ সুপ্রাচীন শহরটা চোখে পড়েনি বিশেষজ্ঞদের। পড়লে কি আর ঐ শহরটা এমনি করে জঙ্গলের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে পারতো? ঐ জঙ্গলে স্বামী স্ত্রীকে দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছিল। ম্যাক্সিকোর সেই তারা আধুনিক সভ্য সমাজের ছোঁয়া বাঁচিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বাস করলেও

নৈতিক দিক দিয়ে যেমন তারা সুন্দর, তেমনি চিন্তা বুদ্ধির দিক দিয়েও সভ্য সমাজের থেকে তারা উন্নত মহিমান্বিত। ঐ দম্পতি ওসব প্রাচীন অধিবাসীদের সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন বিবরণ রাখেনি। নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। (২৬)

পেরু এবং বলিভিয়ার ইণ্ডিয়ানরা বলে থাকে আন্দিজ পর্বতে অনেক-গুলো ভূ-গর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাহলে কি আন্দিজ পর্বতের পাতাল রাজ্যে এখনো কোন জাতি রাজত্ব করে চলেছে নির্বিবাদে? রুবিচের বিবরণ থেকে জানা যায় পর্বত থেকে নাকি চীনের সিংকিয়াং প্রদেশে নর নারীরা নেবে আসে। জিনিষ পত্র কেনে, পুরোনো স্বর্ণমুদ্রা দেয় পরিবর্তে। এদের চালচলন অদ্ভুত—দেখলেই মনে হয় এরা অন্য লোকের বাসীন্দা।

পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বতে যদি সু-সভ্য মানুষ বাস করে থাকে তাহলে আমাদের ঐ হিমালয় পর্বতে যে মানুষরূপী দেবতারা বাস করেন তা মিথ্যে রটনা হবে কেন? হিমালয়ের ঐ কাঞ্চন জঙ্ঘা, ঐ নন্দাদেবী, ঐ কৈলাস হিন্দুদের কাছে স্বর্গের মতো পবিত্র। হিমালয়ের তুষার রাজ্যে হয়তো এখনো রাজারা রাজত্ব করেন—সেখানে হয়তো এখনো উমার জন্ম হয়, গৌরীর বিয়ে হয়, কাঞ্চন জঙ্ঘার শিখর দেশ থেকে লক্ষ্মীদেবী হয়তো এখনো স্বর্গের দিকে উড়ে যান। ঐ কাঞ্চন জঙ্ঘাতেই আবার কখনো কখনো শিব এসে বসেন।

অভিযাত্রিরা বলে থাকেন আমাজানের ঘন গভীর জঙ্গলে (যেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারেনি এখনো) রয়েছে সুসভ্য মানব সমাজের অস্তিত্ব। এদের মধ্যে 'জেড' (z) নগরী রূপকথার নগরীর মতো স্বপ্নের নগরী অভিযাত্রিদের কাছে। অনুমান নগরীটা ১৯°৩০´ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১২°৩০´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কনোলেন পার্সি এইচ্ ফাউসেট্ ১৯২৫ সালে এ অঞ্চলে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার নোট বুকে লিখে গিয়েছিলেন:—আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের উৎপত্তির ইতিহাস এবং প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাকে নিয়ে আজ যে আমাদের মাথা ব্যথা—আমাদের যে একটা সমস্যা সেটা দূরীভূত হবে যদি আমরা সূর্য সংস্কৃতি বা সূর্য সভ্যতার ধারক বাহক পুরোনো নগরীগুলোকে পুনরাবিষ্কার করতে পারি। কারণ,

তখনই সম্ভব হবে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা। কারণ, আমি মনে করি এসব নগরীর অস্তিত্ব রয়েছে—মাটির নীচে কবরস্থ নয়, তারা এখনো সপ্রাণ প্রাণোচ্ছল।' রেড্ ইণ্ডিয়ানরাই ফাউসেট্‌কে বলেছিলেন নগরীগুলোর কথা। সেখানে লোকজন বাস করে, রাত্রি বেলা ঝলমলে আলো জ্বলে। (২৯)

আজ্ঞাব বাইজানের তলহীন কুপটার কথা শুনেছেন? ওটা থেকে এক রকম ঈষৎ নীলাভ আলো বেরিয়ে আসে এবং তার ভেতর থেকে ভেসে আসে যেন কাদের গোঙ্গানির শব্দ; কখনো কখনো কে যেন বাঁশির শিষ দিয়ে বেড়ায় তার অভ্যন্তরে। স্থানীয় লোকদের ঐ কুপটাকে নিয়ে নানা রকম ভয় কুসংস্কার দানা বেঁধে উঠেছে। ওদের ধারণা কোন অপদেবতা কি সু-দেবতা বাস করে ওখানে। ওদের বদ্ধমূল ধারণা এবং কুসংস্কার সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের নাড়া দিল। তারা এক সময় কোমর বেঁধে নাবলেন কুয়োর ভেতর— দেখাই যাক্ কি রহস্য লুকিয়ে আছে সেখানে। কুয়োর তলদেশে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করলেন গোলক ধাঁধার মতো সুড়ঙ্গ পথ। সেই সব সুড়ঙ্গ পথ গিয়ে মিলেছে পর্বতের পাদ দেশে। ঐ ভূ-অভ্যন্তরের পথগুলো যে কোথায় গেছে তা সঠিক খুঁজে বের করতে পারেননি বৈজ্ঞানিকেরা। তবে, একটা বড় সুড়ঙ্গ পথকে তারা পরিস্কার করতে পেরেছিলেন। সেটা ধরে তারা গিয়ে পড়েছিলেন পাতাল রাজ্যের একটা বিরাট হলঘরে। ওটার উচ্চতা ৬৫ ফুট। ঐ হলঘরটা যে কোন সু-সভ্য প্রাণী নির্মাণ করেছে তাতে কোন সন্দেহ রইলো না বৈজ্ঞানিকদের। কিন্তু, কি উদ্দেশ্যে সেটা তৈরী করা হয়েছে তা তারা ঠিক বলতে পারছেন না। যে সুড়ঙ্গ পথগুলো ধরে এগুনো যাচ্ছে না সেগুলোর বাঁধা অপসারিত হলে হয়তো রহস্যের মূলে প্রবেশ করা যাবে।

আশ্চর্যের বিষয় মধ্য আমেরিকার যে সুড়ঙ্গ পথগুলোর কথা আমি প্রসঙ্গক্রমে বলেছি সেগুলোর সঙ্গে আছে এগুলোর চমৎকার মিল। সোভিয়েত পুরাতাত্ত্বিকদের কারউ কারউ বিশ্বাস এই সুড়ঙ্গপথগুলো চলে গেছে ইরান আফগানিস্থান পর্যন্ত— এমন কি মধ্য এবং পশ্চিম চীনের পাতাল রাজ্যের গোলক ধাঁধাগুলোর সঙ্গে গিয়েও তারা মিলতে পারে। সম্বল কি এ অঞ্চলেরই পাতাল রাজ্য? (৩০)

তিব্বতীদের বিশ্বাস ঐ পাতাল রাজ্যের লোকেরা এমন একটা শক্তি থেকে

তেজ আলো শক্তি আহরন করে যে তাদের আর সূর্য্যের আলো প্রয়োজন হয় না। সেই পাতাল রাজ্যে তারা ঐ কৃত্রিম শক্তির সাহায্যে উদ্ভিদ জন্মায় এবং নিজেরাও বেঁচে থাকে। ঐ রাজ্য থেকে নাকি বেরিয়ে আসে এক রকম সবুজ আলো। আমেরিকার আদিবাসীরাও এ কথাটা বলে থাকে। আমাজানের জঙ্গলে এক অভিযাত্রী একটা ভূ-অভ্যন্তরের বা পাতাল রাজ্যের গোলক ধাঁধার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন। ঐ রাজ্যে তিনি এক প্রকার অদ্ভুত স্নিগ্ধ আলো দেখতে পেয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল কোন পান্নাসূর্যই যেন সেই রাজ্যটাকে আলোকিত করে রেখেছে। কিন্তু, তিনি ঐ রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি। দৈত্যাকায় একটা মাকরশা তাকে তাড়া করেছিল। আত্মরক্ষা করবার জন্যে ছুটে পালাবার আগেই কিন্তু তিনি সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন ছায়া সদৃশ মানব বা ছায়া মানব সেই সুড়ঙ্গ পথের ভেতরে। ওরা ছায়া মানব নয়, অনেক দূর থেকে দেখতে হয়েছিল বলে মানবাকৃতি কোন প্রাণীকে ছায়ার মতো মনে হয়েছিল—এটেই আমার ধারণা।

ওখানে যে সত্যিই সত্যিই মানুষ বাস করে, ঐ সব ছায়া যে কোন ভূত-প্রেতের নয় সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে বলছেন পিটার কলোসিমো। কালিফোর্নিয়ার একজন পথপ্রদর্শক (ভ্রমণকারীদের) টম্ উইলসন। তার ঠাকুর্দা দক্ষিণ আমেরিকার গল্প উপাখ্যানগুলো সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন। একবার তিনি সেখানকার জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একটা সুন্দর সুদৃশ্য নগরীর মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন। বেশ কিছুকাল ছিলেনও নাকি তিনি সেখানে কতকগুলো অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের সঙ্গে, পৃথিবীর মানব মানুষের সঙ্গে যাদের কোন মিল নেই। তার বর্ণনা মতে ঐ লোকগুলো পরেছিল এমন এক জাতীয় পোষাক—মনে হয় চামড়া দিয়ে তৈরী কিন্তু ঠিক চামড়া নয়। ঘটনাটা ১৯২০ সালের। তখন কি পৃথিবীর মানুষ প্লাষ্টিকের কথা জানতো? মনে হচ্ছে ঐ সব লোকেরা প্লাষ্টিক জাতীয় কোন উপাদানে তৈরী পোশাকই পরতো। তারা যে খাবার খেয়ে থাকে তাও নাকি অপার্থিব ধরণের।

উপরোক্ত, প্লাষ্টিক জাতীয় পোশাকের কথা যে মিথ্যে নয় তা প্রমাণ দিচ্ছেন পিটার কলোসিমো পুরাতাত্ত্বিক আবিস্কারের সাহায্যে। ১৯৩৫ সালে হোয়াইট্‌ নামে একজন স্বর্ণ শিকারী একটা গোরস্থানের মধ্যে গিয়ে

পড়েছিলেন। সেখানে বিরাট একটা হল ঘরের মতো জায়গাতে তিনি শতো শতো মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। তাদের দেহে ছিল চামড়ার মতো কোন উপাদানে তৈরী পোশাক পরিচ্ছদ। সে জায়গাটা ছিল সেই সবুজ আলোকে আলোকিত; সেই অপার্থিব আলোকের মধ্যে কতকগুলো স্বর্ণময় মূর্তিকে তিনি জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলতে দেখেছিলেন।

ভদ্রলোকের বিবৃতিকে যাচাই করে দেখবার জন্যে একটা অভিযাত্রিদল গেলেন সেখানে। কিন্তু, তারা সেই জায়গাটায় পৌছুতেই পারেননি। কিন্তু একজন বৃদ্ধ কামিন বা খনির কুলি বললে সে জানে এই জায়গাটার কথা। সে নাকি ভয়ে ঐ কথা প্রকাশ করেনি কারও কাছে। অভিযাত্রিদলকে সে বললে :—হ্যাঁ, সে পরে তাদেরকে নিয়ে যেতে পারে যে কোন সময় ঐ জায়গায়। সে যে বর্ণনা দিলো জায়গাটার তার সঙ্গে হোয়াইটে'র বর্ণনার হুবহু মিল।

এই সুড়ঙ্গ পথগুলো সম্বন্ধে রেড-ইণ্ডিয়ানদের প্রধান বা বয়োজ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ কোন রেড ইণ্ডিয়ানকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে যারা ঐ সুড়ঙ্গ পথগুলো তৈরী করেছে তারা এ পৃথিবীর বাসীন্দা নন। আকাশে ঐ যে তারাগুলো দেখা যাচ্ছে তাদের কাছাকাছি কোন রাজ্যে তাদের বাস। তারা এমন একটা রশ্মির সাহায্যে ঐ সুড়ঙ্গপথগুলো তৈরী করেছে যে রশ্মির সাহায্যে অতি সহজে পাথররাশিকে বিগলিত করা যায়।

আলফিউস হায়াট আর একজন দুঃসাহসিক অক্লান্ত অভিযাত্রি। অজানাকে জানবার প্রবল স্পৃহা—অতীতের প্রতি আর রয়েছে একটা অকৃত্রিম আকর্ষণ। মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে তিনি একশ'টার ওপর বই লিখেছেন। এই তিনিও কিন্তু আমাজানের ঘন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেননি। ভয় ছিল বুঝিবা তিনিও হারিয়ে যাবেন কলোনেল ফাউসেটের মতো। ঐসব জঙ্গল সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করেছেন তিনি। তিনি মারা যাবার পরে তার বিধবা স্ত্রী ঐ গবেষণা চালিয়ে যান। ডিউক অব্ মেডিন্যাচেলি'র কাছে যে সব গোপন দলিলপত্র ছিল তাই তাদের গবেষণার প্রধান সম্বল। কলম্বাস যে তালিকা ব্যবহার করেছিলেন তাও নাকি তাদের সঙ্গে ছিল। ঐ সব দলিল পত্রে আমেরিকার অভ্যন্তর ভাগের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। মুখ্যতঃ ঐ সব দলিলের সাহায্যেই আলফিউস হায়াট এবং তার স্ত্রী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় সুসভ্য সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের বংশধরেরা এখনো সশরীরে সুসভ্য জীবন যাপন করে চলেছে। গবেষকরা আলফিউসের এ দাবী খতিয়ে দেখছেন। তারা পরীক্ষা করে দেখেছেন ফিনিস দেশীয় অক্ষর, প্রাচীন পেরুবাসীরা গ্রেনাইট্ পাথর কাজে লাগাবার জন্যে যে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করতেন তাও। এখন একালের সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত গবেষকরা ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে বাধ্য হচ্ছেন:—হ্যাঁ, দাবীটা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

ব্রাসিলের ম্যাগনেসিয়া এস্ এ'র ডাইরেক্টর মিগুয়েল কাহেন বরাবরই শিল্পজ ধাতু—বিশেষ করে ম্যাগনেসিয়া জাত দ্রব্যাদির প্রতি ভীষণ অনুরক্ত। কোম্পানীর প্রোস্পেক্টরদের একজন একদিন টেরা প্রোহিবিডা বা নিষিদ্ধ দেশের (যার কথা আমরা উপরে আলোচনা করলাম) সীমান্তে একখণ্ড অপার্থিব স্ফটিক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। মিগুয়েল কাহেন সেই ধাতুটা নিতান্ত কৌতূহলী হয়ে পাঠিয়ে দিলেন ফ্রান্সের জ্যাক্স বার্জিয়ারের কাছে। বার্জিয়ার সেটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন। ধাতুটার অপার্থিবতা লক্ষ্য করতে পেরে আঁৎকে উঠলেন। ধাতুটা অপার্থিব রকমের স্বচ্ছ ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বোনেইট্ দিয়ে তৈরী।

ধাতু বিদ্যায় এ রকম কোন পদার্থের বর্ণনা পাওয়া যায় না। বার্জিয়ার তখন সেটাকে ফ্রান্সের এ্যারোনটিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন ধাতুটা কৃত্রিম অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। তাহলে কে ঐ ধাতু তৈরী করলো?

ও গ্লোবো সংবাদ পত্রের মহিলা সাংবাদিক চিচিলিয়া প্যাজাক। তিনি ব্রাসিলিয়ার সাংবাদিক। ভদ্রমহিলার রিপোর্ট থেকে এটেই জানা যায়, ১৯৫৮ সাল নাগাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সব জার্মাণ সৈন্য ব্রাসিলে পালিয়ে গিয়েছিল তারা সামরিক আদালতে বিচারের ভয়ে টেরা প্রহিবিডাতে বা নিষিদ্ধ এলাকায় পালিয়ে গিয়েছিল। সাধারণতঃ যারা এই নিষিদ্ধ এলাকায় পা দিয়ে থাকে তারা আর ফিরে আসতে পারে না। তারা একেবারে নিখোঁজ হয়ে যায়। কিন্তু, এসব নাজি সৈন্যদের ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটলো অন্য রকম। তাদের পরিবারের অন্যান্য যারা ব্রাসিলে বসবাস করছিল তারা ঐ নিরুদ্দেশ সৈন্যদের কাছ থেকে রীতি মতো চিঠিপত্র পাচ্ছিল। তারা বন্দী। কিন্তু কোন রূপ অমর্যদা নেই, অত্যাচার নেই—নিরুদ্বেগে

স্বচ্ছন্দে চলেছে জীবন যাত্রা। কাদের হাতে বন্দী ওরা? প্রশ্নটা সবার মনে। কিন্তু ওরা কোন দিনই খুলে লিখলো না সেই তাদের কথা। ওদেরকে নাকি নিষেধ করা হয়েছে আসল রহস্য ফাঁস করে না দিতে কারুউ কাছে। (৩১)

এরা কারা? গ্রহান্তরের মানুষ? নাজি সৈন্যরা কি গ্রহান্তরের মানুষদের কলোনিতেই বন্দী?

অন্য গ্রহ থেকে মানুষেরা কি এই পৃথিবীতে তাদের কলোনিগুলোতে যাওয়া আসা করে? হ্যাঁ, করে। সাইবেরিয়া, অ্যান্টার্কটিকা, আর্জেন্টিনা, গ্রীণল্যাণ্ড, সাগরে, মহাসাগরে, পর্বতে পর্বতে রয়েছে গ্রহান্তরের মানুষদের কলোনী বা উপনিবেশ। এবং সেখানেই তারা যাওয়া আসা করে মানুষের অগোচরে। এটে আর অনুমানের ব্যাপার মাত্র নয়। বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি রয়েছে এর পেছনে। ১৯০৯ সালে সাইবেরিয়ায় বিস্ফোরণটার কথা নিশ্চয় মনে আছে। ওটা কিসের বিস্ফোরণ? আমেরিকার ইনিস্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার রিসার্চ সাইবেরিয়ার টাঙ্গাসকা অঞ্চল থেকে ঐ বিস্ফোরণে প্রজ্জলিত বৃক্ষরাশির ভস্মস্তূপ থেকে কিছু ছাই এনে রেডিও কেমিক্যাল এনালাইসিস এর সাহায্যে এই সিদ্ধান্তেই পৌছেছেন যে এ্যান্টি-মেটারের সঙ্গে মেটারের সংস্পর্শের ফলেই ঐ বিস্ফোরণটা ঘটেছিল। বৈজ্ঞানিকেরা এটুকু বলেই ক্ষান্তি দিলেন না। তারা সরাসরি স্বীকার করলেন: অন্য কথায় আমাদের এ সিদ্ধান্তেই পৌছুতে হচ্ছে (সেটা যতই মন্দ হোক্ না কেন, আমরা নিরুপায়, সত্যকেই স্বীকার করতেই হবে) যে টাঙ্গাসকার ধ্বংস যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল একখানা মহাকাশযানের ক্র্যাশ-ল্যাণ্ডিং-এর ফলেই। ঐ মহাকাশযানটা চলছিল এন্টিমেটার ফিউয়েলের সাহায্যে। (৯০)

মহাকাশের মানুষ আসতেন

মহাকাশ থেকে সুসভ্য মানুষ আগে এসে থাকলে এখন আসবে না কেন? পৃথিবীর মানুষ আগে চাঁদে যেতে পারলে এখন পারবেনা কেন? নিতান্তই সঙ্গত প্রশ্ন। কারণ, সভ্যতা ক্রমশঃই এগিয়ে চলে সামনের দিকে। পৃথিবীর মানুষ চাঁদে যেতে পারতো তো এখন তার মঙ্গল গ্রহে যাবার কথা। কারণ, মহাকাশ বিদ্যায় উত্তরোত্তর সে আরও বেশী করে হাত পাকাচ্ছে। তাই, এখনো মহাকাশ থেকে গ্রহান্তরের সুসভ্য জীব আমাদের পৃথিবীতে আসে এ কথাটা প্রমাণ করতে না পারলে হাজার হাজার বছর আগে যে তারা আসতো এ যুক্তিটার ভিত্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার প্রাচীনকালে নেবে আসতো পৃথিবীর বুকে অন্য গ্রহের মানুষ এ কথাটা প্রমাণ করতে পারলে বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকেও যে তারা আসছে এ কথাটা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

এ যুগে উড়ন্ত চাকিগুলোকে নিয়ে পড়ে গেছে হৈ চৈ। অনেক দায়িত্বশীল প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন তারা দেখেছেন অন্য গ্রহ থেকে আসা বা অপার্থিব মহাকাশযান এবং তাদের আরোহীকেও; সে রকম ইতিহাসের পাতা থেকেও খুঁজে পাওয়া যায় অজস্র বিবরণ, অনেক দায়িত্বশীল প্রত্যক্ষদর্শীর স্বীকারোক্তি।

ফ্রান্স এবং ইটালীর প্রাচীন গল্পে পাওয়া যায় ম্যাগোনিয়া রাজ্যের কথা। মেঘের আড়ালে ঢাকা অপার্থিব সে রাজ্য, আর অপার বিস্ময় তার রাজধানী ম্যাগোনিয়ার। ওখান থেকে নেবে আসে জলধ-জাহাজ। কখনো কখনো উড়ে বেড়ায় এখানে ওখানে সে জাহাজ, কখনো কখনো নেবেও পড়ে পৃথিবীর বুকে, কিন্তু ধর্মপ্রাণ যাজক গোষ্টি ঐ ম্যাগোনিয়াকে ভাবতো ডাইনীদের ক্রীড়া ক্ষেত্র। যাদুবিদ্যার সাহায্যে ওরা আকাশের সেই রাজ্য থেকে কখনো কখনো পৃথিবীর বুকে নিক্ষেপ করে প্রবল বৃষ্টি. ঝড় ঝঞ্চা প্রভৃতি। উদ্দেশ্য পৃথিবীর ক্ষতি এবং শস্যক্ষেত্রের সর্বনাশ করা।

কিন্তু, দশম শতাব্দীর আর্চ বিশপ, লাইয়ন্সের অ্যাগোবার্ড ছিলেন সংস্কার বিবর্জিত মানুষ। তিনি বিশ্বাস করতেন না ডাইনী এবং যাদুবিদ্যার কথা। তিনি মেঘের রাজ্য থেকে উড়ে আসা ও সব হাওয়াই জাহাজের

কথা লিখে গেছেন। সেগুলোর বর্ণনা তিনি এমনভাবে দিয়েছেন পড়লে মনে হয় যেন এ যুগের উড়ন্তচাকির কথাই পড়ছি। তিনি বললেন ঐ সব হাওয়াই জাহাজে করে যারা নেবে আসতো তারা যে ঐন্দ্রজালিক, কিংবা ঐন্দ্রজালিকদের সঙ্গে রয়েছে তাদের যোগসূত্র এই সাধারণ বিশ্বাসটা ভুল।

বিশপ অন্য জায়গায় লিখে গেছেন কি ভাবে তিনি চারজন লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন তার বর্ণনা। তাদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, একজন নারী। স্থানীয় লোকেরা মনে করেছিল ওরা নেবে পড়েছে হাওয়াই জাহাজ থেকে এবং ওরা ডাইনী বা ঐন্দ্রজালিকদের চর ছাড়া অন্য কিন্তু নয়। অতএব সবাই মিলে ঐ চারজন নর-নারীকে ঢিল ছুড়ে ছুড়ে মেরে ফেলবার বিরাট আয়োজন করছিল। এমন সময় বিশপ তাদের মধ্যে ছুটে গেলেন। রক্ষা করলেন ঐ চারজন নিরীহ প্রাণীকে। (৩২)

প্রাচীন লেখকেরা অনেকেই লিখে গেছেন আকাশে অতিপ্রাকৃত বস্তু সব দেখবার কথা। এসব অতিপ্রাকৃত বস্তুর নাম—তাদের ভাষায় জ্বলন্ত-পাঁতিহাস, দেখতে অনেকটা আগুন ঝরানো মেঘের মতো—যেটা অতি দ্রুত আকাশ চিড়ে মিলিয়ে যেতো দিগন্তে। অনেকের ভাষায় এগুলো আবার 'উড়ন্ত ড্রাগন'। এ রকম অনেকগুলো 'উড়ন্ত ড্রাগন্' দেখা গিয়েছিল ১৫৩২ সালে। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে একটা বই বেরিয়েছিল—নাম 'দি কন্‌টেম্‌প্লেশন অব্ মিসটিরিস'। ঐ বইটার মতে :—ঐ সব উড়ন্ত বস্তুগুলো শয়তানের সৃষ্টি—ধুরন্ধর ধাপ্পাবাজদের চালাকি। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এ জাতীয় উড়ন্ত বস্তু দেখা গিয়েছিল আকাশে। বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ মহল অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করবার চেষ্টা করলেন :—আবহাওয়ার তারতম্যের জন্যেই এহেন টুক্‌রো টুকরো জ্বলন্ত দৃশ্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে আকাশে। কিন্তু, ঐ সব উড়ন্ত পাঁতিহাস বা উড়ন্ত ড্র্যাগনগুলো আকাশে উড়বার সময় যে জাতীয় শব্দের জন্ম দিতো আধুনিক সত্তর দশকের উড়ন্ত বস্তুগুলোর শব্দ ও ধরন ধারণও সেই রকম।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লিনিও রহস্যজনক উড়ন্ত বস্তুগুলোর কথা লিখে যেতে ভোলেন্‌নি। তার লেখা থেকে কতকগুলো উদ্ধৃতি দচ্ছি :—

'অত্যুজ্জল আলোকশিখা আকাশটাকে উদ্ভাসিত করলো সহসা। ল্যাসিডোমোনিয়ার অধিবাসীরা গ্রীক্-সাম্রাজ্য হারিয়েছিল যে মারাত্মক

নৌ যুদ্ধে হেরে যাবার পর সেই যুদ্ধের সময়ও সৃষ্টি হয়েছিল আকাশে এ রকম এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য' (২৬ পরিচ্ছেদ)।

'তিনটে চাঁদ সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আকাশে,—জি. ডোমিজিও এবং জি ফ্যাম্নিও র দূতাবাসে।' (পরিচ্ছেদ ৩২)

'একটা আলোকবিন্দু ছুটে আসলো একটা তারা থেকে; যতোই পৃথিবীর কাছাকাছি এগিয়ে এলো সেটা ততো বেশী তার ভয়ংকর রূপ। পূর্ণিমার চাঁদের মতো পূর্ণ হতে না হতেই একরাশ ধোঁয়া ছুড়ে মারলে আকাশে। তারপর একটা সার্চলাইটের মতো মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে।' (পরিচ্ছেদ ৩য়)

তৃতীয় শতাব্দীর পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক জুলিয়ান দি ওব্‌সেকুইয়াস লিখেছিলেন তিনটে চাঁদ দেখতে পাওয়ার কথা। ওগুলোকে প্রথমে দেখা গিয়েছিল রিমিনির আকাশে; তারপর উপদ্বীপের বিভিন্ন জায়গায়। ঘটনাটা ২২২ খৃ; পূর্বাব্দের।

এই ভদ্রলোক আরও লিখেছেন :—স্পোলেটার মাটিতে একটা প্রকাণ্ড স্বর্ণকান্তি অগ্নিগোলক গড়াগড়ি দিয়েছিল। ক্রমশঃ ওটা বৃহত্তর আকার ধারণ করলো। মাটির ওপর গড়াতে গড়াতে পূর্ব দিকে চলে গেল। এতো প্রকাণ্ড ছিল সেটা সূর্যকে পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছিল। (৯১ খৃঃ পূর্বাব্দের কথা)।

প্রথম শতাব্দীর ইউরোপীয় ঐতিহাসিক টিটো লিভিও লিখেছেন :—'গোলাকার ছত্রে'র মতো বস্তুগুলো উর্ধ্বাকাশের অনেক ওপরে লাট্টুর মতো শুধু ঘুরপাকই খায়নি; ফ্যালেরী ভিটারেসে শুধু অদ্ভুত রকম সব ভূতুরে মূর্তিই দেখা যায়নি,—আকাশে উঠেছিল প্রচণ্ড শব্দ, মনে হয়েছিল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে বুঝি আকাশটা। তখন চারদিক আলোকিত হয়ে উঠেছিল কয়েক জোড়া সূর্যের প্রচণ্ড তাপ বিকিরণে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিল কতকগুলো প্রাণী পৃথিবীর সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্কই নেই। (ঘটনাটা ২১৯ খৃঃ পূর্বাব্দের)।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের জন্মদাতা হিসেবে চিহ্নিত সেণ্টবীড। তার জন্ম হয়েছিল ৬৭২ খ্রীস্টাব্দে। Historia Eacclesiastica Gentis Anglorum' গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন: ৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা ঘটেছিল। একদিন রাত্রে একজন সন্ন্যাসী প্রার্থনারত (থেমসের কাছে বার্কিং মন্যাস্টিতে) এমন সময় দেখলেন প্রকাণ্ড একটা

আলোকগুচ্ছ নেমে পড়লো আকাশ থেকে। সেই আলোকমণ্ডিত বস্তুটা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল মঠের পাশে। একটু পরে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশে।

অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন: 'চারটে উজ্জ্বল পদার্থকে ভাসতে দেখা গেছে আকাশে'—তারা খুবই উজ্জ্বল এবং চটপটে।

এ্যাঙ্গ্‌লো স্যাক্সন ক্রেনিক্যালে লেখা আছে—৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে নর্দামব্রিয়ার অধিবাসীরা সচকিত হয়ে উঠেছিল কতকগুলো অপার্থিব বস্তু দেখতে পেয়ে। সেগুলো অত্যুজ্জ্বল ; এবং রক্তবর্ণ দানবদের আকাশে ভাসতে দেখা গিয়েছিল একই সঙ্গে।

ফ্লোরেন্স হিস্টোরিআমে বেনেডিক্‌টাইন রোজার অব্‌ ওয়েনডোভার লিখেছেল:—৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে ছোট ছোট গোলাকার কতকগুলো উজ্জ্বল বস্তুকে সূর্যের চারপাশে ভাসতে দেখেছে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা সর্বত্র।

তবে, লি কোম্‌টে ডি. গ্যাব্যালিস (we Comteede Gabalis) নামক বইতে ধর্মযাজক মোন্‌টফউকন যে অবিশ্বাস্য কাহিনী লিখে গেছেন তা পড়লে চমৎকৃত হতে হয়:—পৃথিবীর মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত দিশেহারা হতে দেখে সেই সব অপার্থিব লোকের দেবতারা কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন। বিরাট একটা মহকাশ যান ছিল তাদের সঙ্গে। তারা কয়েক জন নারী পুরুষকে বেছে নিলেন তাদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেবতা বানাবেন বলে।...... ও সব নর নারীরা যখন পরে ফিরে এসেছিল পৃথিবীতে আকাশের পথ বেয়ে তখন তাদেরকে মনে করা হয়েছিল শয়তানের চর। তারা এসেছে পুকুরের জলে, শস্যক্ষেত্রে বিষ মিশিয়ে দিতে। বন্দী করা হলো তাদেরকে। অমানুষিক নির্যাতন করা হলো তাদের ওপর। অনেকেই মারা গেল। যারা বেঁচে রইলো তারা নিরুপায় হয়ে সারা দেশে বলে বেড়াতে লাগলো:—'আমরা গ্রিম্যালডো'র লোক। যাদুবিদ্যা বিশারদ ডিউক অব্‌ বেনেভেণ্টোর লোক আমরা। এসেছি আপনাদেরকে ফ্রাঙ্কদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে।' কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মানুষ তাদেরকে বিশ্বাস করলো না। শেষ পর্যন্ত আকাশ থেকে আবার নেবে এলেন সেই সব অপার্থিব লোকেরা। নানা রকম অলৌকিক কাণ্ড দেখালেন পৃথিবীর মানুষকে। তারপর উধাও হয়ে গেলেন পৃথিবীর মানুষের হাতে অত্যাচারিত শিষ্যদের নিয়ে।'

১৫৫৭ সালে উড়ন্ত বস্তু দেখা গিয়েছিল ভিয়েনাতে। ঐ একই বছরে পোল্যাণ্ডে এবং নুরেনবার্গে দেখা গিয়েছিল 'সবুজ সূর্য, 'লাল সূর্য.' 'জ্বলন্ত

চাকৃতি।' অস্ট্রিয়ার আকাশে ১৫৫৮ সালে নাকি দুটো উজ্জ্বল গোলাকার বস্তুর মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছিল—যুদ্ধ বিমানের মতো ছোঁ মেরে মেরে উড়ছিল দুটোতে। সুইডেনে ১৫৪৭ সাল থেকে ১৫৫৮ সাল পর্যন্ত যে সব উড়ন্ত বস্তু দেখা গিয়েছিল সেগুলোর আকৃতি খোদাই করে রেখে গেছেন নক্শা খোদাইকারী উয়েক (Wieck)।

এখন হয়তো আপনাদের কাছে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আকাশে উড়ন্ত গোলক কিংবা উড়ন্ত চাকৃতি কিংবা মহাকাশযান দেখার ঘটনা নিতান্ত আধুনিক কালের ঘটনা কিছু নয়। এদের আনাগোনা চলছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। বাইবেল থেকেও এদের কথা জানা যায়। সুতরাং, এসব রহস্য-জনক বস্তু আমেরিকা কিংবা অন্য কোন সভ্য দেশ গোপনে আবিষ্কার করেছে এবং পৃথিবীকে মাঝে মাঝে ভেল্কিবাজী দেখাচ্ছে এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল।

প্রাচীন লেখক এবং ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে আমরা শুধু মহাকাশ-যানের কথাই পাচ্ছি না, এ কথাটারও উল্লেখ পাচ্ছি যে সে সব মহাকাশযানে করে মহাকাশের লোক এসে নাবতো পৃথিবীতে আর যারা জানে না লেখাপড়া, যারা অজ্ঞ মূর্খ তাদের মুখে মুখে বংশপরম্পরায় অমর হয়ে থেকেছে মহাকাশ থেকে লোক নেবে আসার ঘটনাসব পুরাণ কাহিনী উপকথা উপাখ্যান হিসেবে। কুইন চারলোটে দ্বীপপুঞ্জের হাইডা ইণ্ডিয়ানদের জিজ্ঞেস করুন, তারা বলবে :—(৩২) বড়ো বড়ো সব মহাপুরুষেরা নেবে এসেছিলেন আকাশ থেকে জলন্ত বস্তুগুলোতে চড়ে। ন্যাজাভোদের (Najavas) জিজ্ঞেস করুন, তারা বলবে :—হ্যাঁ, দেবতারা আসতেন অন্য গ্রহ থেকে। তারা পৃথিবীতে অনেকদিন থাকতেন আবার ফিরে যেতেন। কখনো কখনো আবার পৃথিবী থেকে তাদেরকেও নিয়ে যেতেন যারা স্ব-ইচ্ছায় যেতে চাইতো।"

এমনকি ব্রাজিলের জঙ্গলের আদিবাসীরাও আপনাকে বলবে উড়ন্ত আগন্তুকদের কথা, উড়ন্ত নৌকোর কথা। এই হতভাগ্য লোকগুলো এখনো তাদের দেবতাদের জন্যে বসে আছে যেন হাত জোর করে। তাদের বিশ্বাস মহাকাশ থেকে ওরা আবার আসবেন। তাদের জন্যে তারা পূজার্ঘ রেখেছে সাজিয়ে।

কিন্তু, ক্যানাডা'র এ্যালগনকিন রেডস্কিনদের অতো ধৈর্য নেই। তাদের মতে সত্যি সত্যিই মহাকাশ থেকে এসেছিলেন তাদের দেবতা

গ্লুস্ক্যাপ্। গ্লুস্ক্যাপ্ তাদেরকে সুশিক্ষিত সুসভ্য করে তুলেছিলেন। তাদেরকে শিখিয়েছিলেন কি করে চাষ করতে হয়, কি করে ঘরবাড়ী প্রাসাদ শ্রেণী তৈরী করতে হয়, কি করতে শত্রুকে প্রতিহত করতে হয়, কি করে অসুস্থ লোককে সুস্থ করতে হয় এই সব। একদিন কিন্তু তাদের পরমারাধ্য অতি প্রিয় দেবতা গ্লুস্ক্যাপ্ চলে গেলেন। তার আত্মীয়-পরিজনদের জন্যে মনটা খারাপ হয়ে পড়েছিল বুঝি বিদায় বেলায়। তাই বার বার করে বলেছিলেন :—'আবার আসিব ফিরে!' পরমারাধ্য দেবতার অন্তর্দ্ধানের পরও বহুদিন ধরে রেড ইণ্ডিয়ানরা তাকে পূজো দিতো, তাকে আহ্বান জানাতো কাতর হৃদয়ে। কিন্তু যখন দেখলো দেবতা আর আসছেন না তখন মিছে মিছি মায়া মরীচীকার পেছনে ছুটে মরতে তারা আর ব্যস্ত হয়ে থাকবার প্রয়োজন মনে করলো না। তারা তাদের দেবতাকে বিসর্জন দিলো। যে দেবতা কথা দিয়ে কথা রাখেন না সে মিথ্যেবাদী দেবতার পূজো করে লাভ?

আমাজানের টুপিরাও আজ হতাশ। তারা তবুও হতাশ কণ্ঠে বলে :—হে দেবতা, হে আকাশ এবং বায়ুর দেবতা, আসবে না তুমি!'

অশিক্ষিত নিরীহ লোকগুলোর এসব কথা কি শুধুই গল্প,—মিথ্যা কল্পনা?

প্লিনি তার ন্যাচারোলিষ্ট হিস্টোরিয়ায় (Chap 33) লিখেছেন উল বৃষ্টি, দুধ বৃষ্টি, রক্ত বৃষ্টির কথা, মাংস বৃষ্টির কথা, লোহ বৃষ্টির কথা। তিনি লিখে গেছেন শক্ত পোড়া ইঁটের বৃষ্টির কথা।

এসব কথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু, ঐতিহাসিক প্লিনি পণ্ডিত ব্যক্তি, সত্যানুসন্ধানী। মিছেমিছি হাস্যকর উক্তি করে তিনি হাস্যাস্পদ হবেনই বা কেন? পৃথিবীতে যখন উড়ন্ত বস্তুগুলোর বেশ আনাগোনা চলেছে তখনই এক এক সময় দেখা গেছে উল বৃষ্টি হতে, অন্য সময় দেখা গেছে লৌহ বৃষ্টি হতে। উড়ন্ত বস্তুগুলো আমেরিকা এবং ইউরোপের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার পর পেন্সিলভ্যানিয়াতে রক্ত বৃষ্টি হয়েছিল ১৯৪৭ সালের জুন মাসে এবং লিমুরিয়াতে ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে। উল বৃষ্টি হয়েছিল সেস্টো ফ্লোরেনটিতে ফ্লোরেন্সে এবং ভিয়েনাতে ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে।

এ সব আজগুবি ব্যাপার নিয়ে গবেষণা চালাবার জন্যে চার্লস হাই-ফোর্ট অমর হয়ে আছেন। ১৯১০ সালের কথা। ত্রিশ বৎসর বয়সে

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মুদির দোকানটা বিক্রি করে দিয়ে তিনি এই গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। সে সব ঘটনা অপাতঃদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয় অথচ যেগুলো ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য সে সব ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করে যেতে লাগলেন।

১৮১৯ সলে লাল বৃষ্টি ঝরেছিল ব্ল্যান্‌কেন্‌বার্গ' এর ওপরে। ১৯০২ সালে ট্যাসম্যানিয়ার ওপর ঝরেছিল কাদা বৃষ্টি। ১৮৯২ সালের ৩০ই জানুয়ারী বার্মিংহামে হয়েছিল ব্যাঙ্‌ বৃষ্টি। ১৮৮০ সালের ৩০শে নবেম্বর প্যালারমো'র আকাশে পরীর মতো পাখাওয়ালা জীবদের ভাসতে দেখা গিয়েছিল। ১৮২১ সালের ২২শে নবেম্বব মাসে ন্যাপল্‌সের উর্ধাকাশ থেকে ভেসে এসেছিল চেঁচামেচি শোরগোল। ১৮৬১ সালে সিঙ্গাপুরে হয়েছিল মৎস্য বৃষ্টি। কোন এক বছরের ১০ই এপ্রিল ঘটেছিল শুষ্ক পাতার প্রবল বর্ষণ। সুমারিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র হাল্‌কা কুঠারাকৃতি লৌহখণ্ড ঝড়ে পড়েছিল আকাশ থেকে। এ ছাড়া জীবন্ত প্রাণীরাও নেমে পড়ে আকাশ থেকে। তারা পৃথিবীর মানুষকে ধরে নিয়ে যায় এমন ঘটনাও ঘটেছে। উজ্জ্বল জ্বলন্ত চাকা ভাসতে দেখা গেছে সমুদ্রে। মাংস বৃষ্টি, গন্ধক বৃষ্টির ঘটনাও ঘটেছে। এডিনবার্গের সু-উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় পাওয়া গিয়েছিল অন্য পৃথিবীর ছোট ছোট মানুষের শবাধার বা কাফিন।

মাঝে মাঝে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়েছে প্রাণীদের দেহাবশেষ,—সিরিশ জাতীয় পদার্থ—তার সঙ্গে পচা দুর্গন্ধ। এ রকম ঘটনা ঘট্‌বার কারণ কি? তাহলে কি এটেই স্বীকার করতে হয় যে মহাকাশে ভাসছে বিস্তৃত আঠাঁলো সিরিশযুক্ত অঞ্চল? এতে কি এটাই প্রমাণ হয় যে অন্যগ্রহের সুসভ্য প্রাণীদের গুদামঘর রয়েছে মহাকাশের এখানে ওখানে? মহাকাশ পরিভ্রমণের সময় ওরা ওসব জিনিস জমা রাখে নিজেদের ব্যবহারের জন্য: হয়তো মহাকাশে অন্যগ্রহের মহাকাশ কেন্দ্রেই জমা থাকে এসব বিভিন্ন মাল মশলা। তাই হয়তো উড়ন্ত চাকি বা অপার্থিব মহাকাশ-যানগুলোর আনাগোনা যখন বেশী হয় তখনই এরকম অদ্ভুদ ধরণের অপ্রাকৃতিক বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে।

কী আশ্চর্য! চার্লস হোই কোর্ট লোকটার স্পর্দ্ধা কম নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন বিজ্ঞান বিশ্বাস করতোই না যে আমাদের

পৃথিবীর মতো সতেজ সপ্রাণ আরও অগুন্তি. পৃথিবী রয়েছে মহাকাশে তখন কিনা তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন :—বজ্রপাত যখন হয় তখন লক্ষ্য করে দেখেছেন কি? কখনো কি তাকে অর্থবহ মনে হয়েছে? লক্ষ্য করেছেন কি সেখানে বিশেষ রকমের দাগ এবং চিহ্ন? এর অর্থ কি এই যে অন্য পৃথিবীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে সাংকেতিক ভাষায় কথা বার্তা বলতে চান? আমাদের সঙ্গে না হোক অন্ততঃপক্ষে পৃথিবীর কয়েকজনের সঙ্গে? তারা হয়তো তাদেরই লোক যারা আত্মগোপন করে আছে এই পৃথিবীতে। ………এ ভাবে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করবার অসংখ্য চেষ্টা চলে আসছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। এসব কি নক্ষত্রবিদদের নজরে পড়েনি? আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ এবং নাবিকরাও দেখে থাকবেন এ ধরণের দৃশ্য; বৈজ্ঞানিক এবং দক্ষ পর্যবেক্ষকরাও অসংখ্যবার লক্ষ্য করে থাকবেন এ এ ধরণের কাণ্ড কারখানা। এ সব নিয়ে তাদের মনে কৌতূহল জাগে কিন্তু তারা সে কৌতূহল মেটাতে পারেন না। কারণ, সভ্য পৃথিবীর মতে এ সব অপার্থিব কাণ্ডকারখানা অবৈজ্ঞানিক। যারা একান্তই স্বপ্নপিপাসু, কল্পনা-প্রবণ তাদেরই একচেটে হয়ে থাক এহেন অনুসন্ধিৎসা। (৩৫)

সুদূর অতীতে পৃথিবীতে এসে থাকবে অন্যগ্রহের সু সভ্য লোকেরা। আগে এসে থাকবে যদি এখন আসবে না কেন? প্রশ্নটার উত্তর দেওয়াও অবশ্য খুব একটা দুরুহ কাজ নয়। আমরা যদি পারতাম তাহলে কি আমরা শুকর, হাঁস, গোরু মোষগুলোকে শিক্ষিত সুসভ্য করে তুলতাম না? এবং তাই করে পরে কি আমরা তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতাম?

আমার মতে আমরা হলাম তাদের সম্পত্তি। এক সময় পৃথিবী ছিল মালিকহীন সম্পত্তির মতো। তখন অন্যান্য গ্রহগুলো থেকে দুঃসাহসী অভিযাত্রিরা এসে পৃথিবীর এ অংশ ও অংশ আবিষ্কার করেছিলেন, বসতি গেড়েছিলেন, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মারামারি লাঠালাঠি সুরু করেছিলেন। কিন্তু, এখন তো পৃথিবীটা মালিকহীন সম্পত্তি নয় যে এখানে অন্য গ্রহ থেকে যে কেউ এসে ভূ-সম্পত্তি দখল নেবার জন্যে মারামারি কাটাকাটি করবে? সৃষ্টির একটা নিয়ম নীতি আছে বৈকি। এখন যখন পৃথিবীতে মানুষের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে তখন অন্যান্য গ্রহের লোকদের হুঁসিয়ার করে দেওয়া হয়েছে;—খবরদার! তফাৎ যাও, বে-আইনী দখলদার সেজোনা।

কলম্বাস যেভাবে অবাধ গতিতে বুক ফুলিয়ে এসে নেবেছিলেন স্যানশাল ভেডরে ঠিক তেমনি ভাবে অন্য গ্রহ থেকে কোন প্রাণী সর্বসমক্ষে চক্ষুলজ্জা খুইয়ে নেবেছে কিনা আধুনিক পৃথিবীতে কখনো তা আমার জানা নেই। কিন্তু, আধুনিক যুগে লুকিয়ে চুকিয়ে গোপনে যে অন্য গ্রহের প্রাণীরা আসছেন যাচ্ছেন,—কেউ বা আসছেন দূত সেজে, কেউবা অভিযাত্রি, পর্যটক হিসেবে. এবং তারা যে সযত্নে মানুষ এবং মানব সমাজের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলেছেন তার হিসেব যদি সযত্নে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় সে ড্যাটা বা স্বীকৃতি তথ্য অর্থনীতিবিদ বা পরিকল্পনা রচয়িতাদের স্বীকৃত তথ্যের চেয়ে কোনও অংশে কম বিশ্বাসযোগ্য হবে না।

আমার মতে অসংখ্য পৃথিবী থেকে তারা এসেছেন গেছেন। তারা একা একা এসেছেন, দলে দলে এসেছেন; সময় সময়ে এসেছেন, রীতিমত এসেছেন—তারা এখানে মধুযাপন করেছেন, বনভোজন করেছেন, শিকার করেছেন, খনিজ সম্পদ আহরণ করেছেন,—তাদের কেউ কেউ এই পৃথিবীতে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু, এখন পৃথিবী মানুষের বাসস্থান। পৃথিবীতে যখন কেউ ছিলনা তখন না হয় অন্য কথা ছিল; কিন্তু এখন তারা যা খুশী তাই করতে পারেন না। তারা আসেন সঙ্গোপনে চুপিসারে, মানুষের ওপর লক্ষ্য রাখেন আড়াল থেকে।

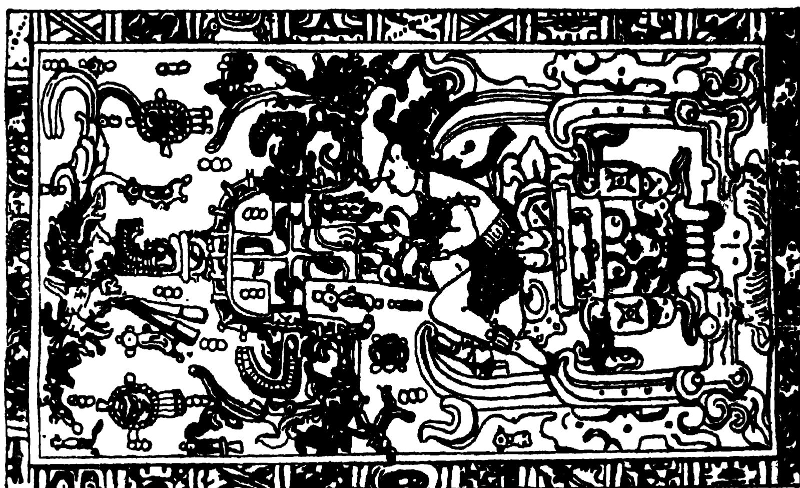
চার্লস হোই ফোর্ট এ সব কথা লিখে গেছেন সেই কবে—যে যুগে পৃথিবীর আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে মহাকাশে পাড়ি দেবার কথা ভাবতেই পারতো না পৃথিবীর মানুষ। চাঁদে পাড়ি দেওয়া তখন ছিল রূপকথার গল্প। কিন্তু এখন, এ যুগে? চার্লস হোই ফোর্টের বক্তব্যকে নতুন ভাবে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা চলেছে বিভিন্ন মহলে।

একটা চিত্র পাওয়া গেছে,—পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা যার নাম দিয়েছেন, 'চ্যাভিন্‌ ডি, হুয়ানটারের দুর্গ'। দেখলে মনে হয় একখানা তিনতলা প্রাসাদ। কিন্তু, প্রাসাদের কোন দরজা জানালা নেই কেন? শুধু আছে বিশেষভাবে নির্মিত কতকগুলো বায়ু চলাচলের পথ। সুতরাং, বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ওটা মোটেই একটা দুর্গ নয়, মহাকাশে চলাচলের উপযোগী করেই বিশেষভাবে নির্মিত একখানা মহাকাশযান।

থম্‌সন এবং স্পেন্‌সার নামে দুজন পুরাতত্ত্ববিদ্‌ তিব্বতের নানা জায়গায় প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতি চিহ্নের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। তিব্বতীয় লামাদের

যে সব কাফিন তারা উদ্ধার করেছেন সে কাফিনের মধ্যে তারা এমন একটা রহস্যজনক মানুষের মস্তক উদ্ধার করেছেন—ঠিক মাথা নয়, মহাকাশ শিরস্ত্রাণের মতো দেখতে। মুখোসের মতো করেই সেগুলো নির্মিত।

পালঙ্কে ম্যায়াদের একটা পুরোনো মন্দির থেকে এমন একটা চিত্র উদ্ধার করা গেছে যে চিত্র থেকে দেখা যায় একটা মহাকাশযানের যন্ত্রাংশের সব খুঁটি নাটি তথ্য। দেখা যাচ্ছে চালক বসে আছেন, যন্ত্রটাকে চালিয়ে নিচ্ছেন সবেগে। প্রথম চিত্রটা পালেঙ্কের মন্দির থেকে। দ্বিতীয় চিত্রে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক ক্যাসানজেভ ঐ যন্ত্রাংশের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে দিয়ে এটাই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ওটা একটা রকেটের যন্ত্রাংশের প্রতিচ্ছবি মাত্র। (৮৩ : পৃ)



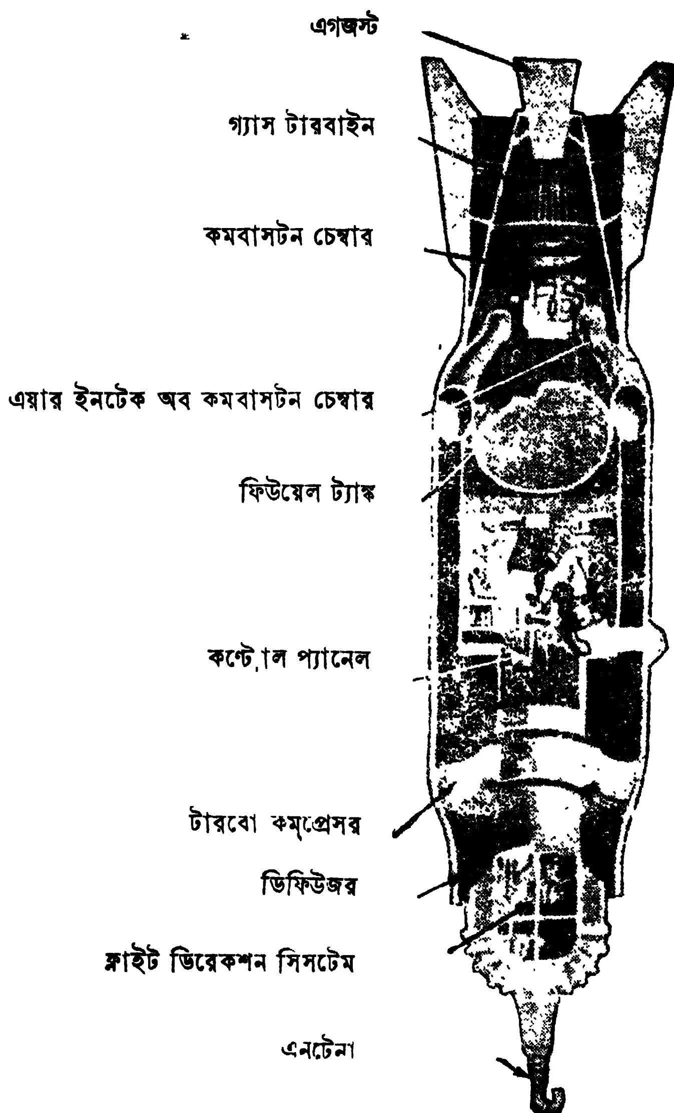
একটা রুপোর মাথা পাওয়া গিয়েছে সাহারার এন্ এজ্জার নামক উপত্যকায়। অনুসন্ধান চালিয়েছেন ১৭৫৬ সালে হেনরী লোথ। বিশেষজ্ঞ-দের অনেকেরই বিশ্বাস সুপ্রাচীন যুগে যে সব গ্রহান্তরের মানুষ আসতো পৃথিবীতে তাদের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করে রাখবার জন্যেই শিল্পিরা হয়তো পাথরে এঁকেছেন সেই ছবি, অথবা অন্য পদার্থ খোদাই করে রূপ দিয়েছেন তাদের চেহারা। এ ছাড়া সাহারায় যে নারী মূর্তি পাওয়া গেছে (যার নাম দিয়েছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা 'হোগার' এর শ্বেতনারী) তার পোষাক পরিচ্ছদ দেখেও মনে হয় সে যেন কোন গ্রহ থেকে সদ্য নেমে এসেছে, কিংবা অন্য

গ্রহে পাড়ি দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। মহাকাশচারীদের পোষাকের সঙ্গে সেই নারীর পোষাকের এতো চমৎকার মিল। (৩৮)

সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই এই গবেষণায় মন প্রাণ সঁপে দিয়েছেন। ওদের মধ্যে প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ এবং পদার্থবিদ্ প্রফেসর মিখাইল আগরেষ্টের নাম উল্লেখযোগ্য। তার দৃঢ় ধারণা সোডোম্ এবং গোমরাহ নগরী দুটো দশলক্ষ বছর আগে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বাইবেলে লেখা আছে এই নগরী দুটোর অধিবাসীরা কি ভাবে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। আকাশ থেকে গন্ধক রাশি ঝরে পড়েছিল—আগুন শুধু আগুন। লট্ এবং তার পরিবার কিন্তু বেঁচে গিয়েছিল। লটের স্ত্রীর কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ। দেবতাদের নিষেধ ছিল তাদের কেউ যেন ধ্বংসস্তূপের দিকে পিছন ফিরে না তাকায়। লটের স্ত্রী পেছন ফিরে তাকাতে না তাকাতেই একটা লবণ-স্তম্ভে পরিণত হয়ে গেল। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস সোডম এবং গোমরাহ নগরী দুটো আজ থেকে চার হাজার বছর আগে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে থাকবে। কিন্তু, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলেই যে তাদের ধ্বংস হয়েছে এমন কথা বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করতে পারছেন না। কেন? কারণ তারা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্পের ধ্বংসকার্যের কোন নিদর্শন খুঁজে পাননি। তাহলে? আগরেষ্টের মতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্পের ফলে নগরী দুটো যখন ধ্বংসই হয়নি তখন সেরকম নিদর্শণ খুঁজে পাওয়া যাবে কি করে? ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে মস্কো "লিটোরেটুরন্যায়া" নামে সরকারি সংবাদপত্রে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধের উপর সোভিয়েত বেতার ভাষ্যকাররাও যথেষ্ট আলোকপাত করেছিলেন। আগরেষ্টর মতে বিস্ফোরণটা ঘটেছিল এভাবে—অন্য গ্রহ থেকে মহাকাশচারীরা আসছিল মহাকাশযানে চড়ে। এক সময় অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে তাদেরকে কিছু পারমাণবিক জ্বালানি ফেলে দিতে হলো। এবং তারা সেই পারমাণবিক জ্বালানি পৃথিবীতে ফেলবার আগে সেখানকার লোকদেরকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছিল।

সাইবেরিয়ায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে এ গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদেই যে আলোচনা করেছি সে বিস্ফোরণটাও এ জাতীয় মনে করার কারণ আছে।

বিস্ফোরণের পর বিরাট লম্বা একটা পুচ্ছ কেন থেকে গিয়েছিল আকাশে? ঐ পুচ্ছ ধরেই কি মহাকাশযানটা পারমাণবিক জ্বালানি ফেলে দিয়েই



হাওয়া হয়ে গিয়েছিল আকাশে? অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটেছিল সাইবেরিয়ার 'টাইগাতে', ঐ এলাকাটাও জনমানবহীন অপ্রবেশ্য। জায়গাটা সিখোটে

অ্যালিন পর্বতমালার কাছাকাছি। সাইবেরিয়ায় প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯০৯ সালে এবং দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে।

এখন আসল কথায় আসি। আগরেস্টের মতে বাইবেলে যে অগ্নিবৃষ্টি জলন্ত গন্ধকের কথা লেখা আছে—সে বর্ণনার সঙ্গে এ যুগের পারমাণবিক বিস্ফোরণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। হিরোসীমার অধিবাসীরা যদি অল্প শিক্ষিত হতো তাহলে তারা যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের শিকার হয়েছিল তার বর্ণনা দিতো হয়তো ঠিক এই ভাবেই:—জলন্ত গন্ধক প্রচণ্ড উত্তাপ বিকিরণ করেছিল এবং তা যার গায়ে গিয়ে পড়তো তাকে গলিয়ে জল করে দিচ্ছিল। লটের স্ত্রী'র লবণ স্তম্ভে পরিণত হওয়ার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আগরেষ্ট এইভাবে:—ঐ লবণ স্তম্ভ আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দেয় হিরোসিমার জমাট বদ্ধ পিণ্ডগুলোকে কাঁচের মতো জিনিসে পরিণত হওয়ার কথা। সোডোমে ছিল প্রচুর পাথুরে লবণ। বিস্ফোরণের ফলে ঐ পাথরগুলো গুঁড়ো হয়েই লটের স্ত্রীর সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলেছিল। এবং তাকে দেখতে মনে হচ্ছিল—ঠিক যেন একটা লবণের স্তম্ভ। (৪১)

এখন আমার একটা প্রশ্ন—সোভিয়েত বিজ্ঞানী পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে সোডোম এবং গোমরাহ নগরীর ধ্বংস কর্য্যের সঙ্গে মহাকাশযানকে যুক্ত করলেন কেন? সে যুগে পৃথিবীর মানুষও তো যুদ্ধকার্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করতে পারে। আমাদের পুরাণে মহাকাব্যে তার উল্লেখ আছে। সেকালের লোক শুধু পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারই জানতো না, সুপার এটোমিক বা অত্যুৎকৃষ্ট পারমাণবিক শক্তির অধিকারী ছিল। ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যে এর অনেকগুলো বর্ণনা চোখে পড়ে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তবে এ শতাব্দীতে সাইবেরিয়ায় দুদুটো বিস্ফোরণের ঘটনার কথা স্মরণ করলে আগরেস্টের উপরোক্ত সূত্রটাকে যুক্তি যুক্ত মনে হয়। অনেকের মতে সাইবেরিয়ায়, এ্যান্টার্কটিকায় আর্জেন্টিনায়, গ্রীণল্যাণ্ডে রয়েছে গ্রহান্তরের মানুষদের কলোনী বা উপনিবেশ। সাইবেরিয়াতে হয়তো এখনো গ্রহান্তরের মানুষেরা আসে এবং সেখান থেকে মহাকাশ পাড়ি দেবার সময়ই ঘটেছিল দুর্ঘটনা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কিংবা ইতিহাসের সুপ্রাচীন যুগে মহাকাশের অধিবাসীরা হয়তো পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে অবতরণ করতো। কিন্তু, এখন তারা সভ্য দাম্ভিক মানুষের বাইরের জগতে পদার্পণ করে। গোপনে আমাদের সঙ্গে মেশে, আমাদের উপর নজর রাখে।

প্রথম পরিচ্ছেদের শেষের দিকে আমি টেক্‌টাইটের কথা বলেছিলাম। এই পদার্থটা অপার্থিব মানে এই পদার্থটা আমাদের পৃথিবীর তৈরী নয় তবে ঐ সব পদার্থ কি কোন মহাকাশযান নিয়ে এসেছে অন্য গ্রহ থেকে? সেগুলো কি কোন মহাকাশযান থেকে প্রক্ষিপ্ত বস্তু বা গোলা? নাকি সেগুলো কোন মহাকাশযানের ধ্বংসাবশেষের বিক্ষিপ্ত অংশ মাত্র? এ সম্পর্কে আগরেষ্টের ব্যাখ্যা হলো:—কোন মহাকাশযান যখন পৃথিবীর আবহাওয়ায় প্রবেশ করে তখন তার সঙ্গে মহাকাশযানের সংঘর্ষ হয় এবং তার ফলে প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি হয়। ঐ উত্তাপের ফলে মহাকাশযানের বহিঃস্তরের খোল যে ধাতুতে তৈরী সে সব ধাতুর কিছু কিছু অংশ বাইরে ঠিক্‌রে পড়ে। স্পুটনিক দুই'য়ের ক্ষেত্রেও এ রকম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। স্পুটনিক দুইয়ের অঙ্গ থেকে যদি পার্থিব পদার্থ সব ঝরে পড়তে পারে পৃথিবীর বুকে তাহলে অপার্থিব মহাকাশযান থেকে অপার্থিব পদার্থ সব ঝরে পড়তে পারবে না কেন পৃথিবীর বুকে? পিটার কলোসিমো বলছেন:—টেক্‌টাইট যদি মহাকাশযান থেকেই পড়ে থাকে সত্যি সত্যি তাহলে ঐ সব মহাকাশযান ছিল আমাদের পার্থিব মহাকাশযানগুলোর তুলনায় অনেক বেশী প্রকাণ্ড রকমের বড়।

এ রকম প্রকাণ্ড আকারের মহাকাশযান কি অতীত যুগে পৃথিবীতে আসতো? তার নজির আমি দেখাতে পারি পিটার কলোসিমোকে। মহাভারতে 'ইন্দ্রলোক গমন' পর্বে এ রকম একটা বৃহৎ প্রকাণ্ড যানের উল্লেখ আছে। এই মহাকাশযানে চড়েই ইন্দ্রালয়ে গিয়েছিলেন অর্জুন। বৈশম্পায়নের বক্তব্যের উদ্ধৃতি আমি 'দিচ্ছি':—

'দিক পালগণ চলে গেল। শত্রু বিজয়ী অর্জুন ইন্দ্রের রথ আসবার অপেক্ষায়। এক সময় মহামেঘের গম্ভীর শব্দে চতুর্দিক বিদীর্ণ করে মেঘরাশিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে আকাশ রাজ্যটাকে তমসাবৃত করে মহা প্রভাবশালী ইন্দ্ররথে চড়ে মাতালি আগমন করলেন অর্জুনকে নিয়ে যাবার জন্যে। সে রথের ভেতরে ছিল ভীষণ তরবারি ও শক্তি, ভয়ংকর গদা, অলৌকিক প্রভাব সম্পন্ন মহাপ্রভাবশালি বিদ্যুৎ, নির্ঘাতের তুল্য শব্দকারী বজ্র। তার ভেতরে ছিল দশ সের ওজনের এক একটা গোলা নিক্ষেপ করতে সক্ষম সুবৃহৎ কামান। আর সেই বিমানে ছিল দশ হাজার চালক-যন্ত্র বা ইঞ্জিন। ঐ যন্ত্রগুলোই সেই মহাকাশযানকে বহন করতো।'

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে একটা মহাকাশযানে কি করে দশ হাজার ইঞ্জিন থাকতে পারে? মহাভারতে আছে অশ্ব বা অশ্বাকৃতি যন্ত্রের উল্লেখ। তাহলে কি দশ হাজার অশ্বশক্তির কথাই বলা হয়েছে?

ভিট্রিফিকেশন অর্থাৎ কাঁচের মতো জিনিসে পরিণত হওয়ার নমুনা সোভিয়েত অভিযাত্রী দল আবিষ্কার করেছেন গোবি মরুভূমিতে, কালিফোর্ণিয়া এবং নেভ্যাডার মধ্যবর্তী মৃত্যু-উপত্যকায়। সোডোম এবং গোমোরাহ প্রভৃতি স্থানেও বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদল আবিষ্কার করেছেন পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংসের নমুনা। নিকারাগুয়া সাধারণতন্ত্রের সৈন্যাধ্যক্ষ ১৮৫০ সালে মৃত্যু উপত্যকার কথা লিখেছিলেন এইভাবে:—একটা বিরাট প্রাসাদের চতুর্দিকে এক মাইল পরিবৃত স্থানে শুধু ধ্বংসের চিহ্ন। সব দেখে মনে হচ্ছে এখানে একটা আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়েছিল প্রবল রোষে। কতকগুলো পদার্থ পুড়ে কালো হয়ে গেছে, আর কিছু কাচের মতো জিনিসে পরিণত হয়ে গেছে। ভয়ংকর রকমের একটা ধ্বংসকার্য এতে কোন সন্দেহ নেই। এ জায়গাটাকে দেখলে জাপানের 'পম্পি' হিসেবে ভুল হয়। এই শহরের কেন্দ্রস্থলে ২০থেকে ৬০ ফুট উঁচু একটা প্রস্তর নির্মিত জায়গার ওপর রয়েছে মহাকায় একটা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ। সর্বদক্ষিণে যে প্রাসাদশ্রেণী সেগুলোকে দেখলে মনে হয় তারা যেন এক একটা প্রকাণ্ড জলন্ত গহ্বরের মধ্যে স্থাপিত ছিল। যে পাথর দিয়ে তৈরী সে সব প্রাসাদগুলো সে পাথরগুলো প্রচণ্ড উত্তাপে বিগলিত হয়ে গেছে। আশ্চর্য বটে, এই বিরাট ধ্বংসস্তূপ, এ মৃত নগরীটা সম্বন্ধে রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কোন উপখ্যান উপকথা প্রচলিত নেই। তারা এ সম্বন্ধে বেশি কিছু জানে না, ওদের মনে এই জায়গাটা সম্বন্ধে কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্ক।'

প্রধান সেনাপতি উইলিয়াম নাগাসিকা হিরোসিমা দেখেননি। যে সময় তিনি মৃত উপত্যকাটা আবিষ্কার করেছিলেন সে সময় পর্যন্ত মানুষ পারমাণবিক শক্তির কথা জানতোই না। জানলে হয়তো তিনি ঐ জায়গাটাকে পম্পির সঙ্গে তুলনা করতেন না। পিটার কলোসিমা এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন:—ঐ জায়গাটায় কোনদিন কোন অগ্ন্যুদ্গীরণ ঘটেনি, আর কোন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত তা যতোই সাংঘাতিক হোক না কেন পাথরকে বিগলিত করতে পারে না, কাঁচের মতো

পদার্থের জন্ম দিতে পারে না, এবং যে জায়গাটা খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল সে জায়গাটাকে এমন ভাবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে না।

তাহলে ওখানে কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল ?

পৃথিবীর এখানে ওখানে পাথরের ওপর বৈজ্ঞানিকেরা খুঁজে পেয়েছেন পেয়ালার মতো জিনিসের চিত্র। এ জাতীয় চিত্র সম্বন্ধে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক চার্লস হাই ফোর্ট এবং ফ্রান্সের লুইস পাউয়েল যে মন্তব্য করেছিলেন তার সারাংশ নীচে দিচ্ছি।

তাদের মতে ওগুলো যোগাযোগের প্রতীক। কাদের মধ্যে যোগাযোগ ? এগুলো দিয়ে ' পৃথিবীর এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগ চলতো বা কথাবার্তা চলতো তা নয়। কিভাবে বোঝা গেল যে এগুলো পার্থিব নয় ? মিস্টার ফোর্টের যুক্তি:—তা যদি হয় চীন, স্কটল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সব জায়গার পেয়ালা-চিহ্নগুলো একই রকম হবে কেন ? এক এক দেশের বার্তা পদ্ধতি 'ত এক এক রকম ।

পেয়ালা চিহ্ন হলো পেয়ালার মতো কোন জিনিসের ছাপ, যে ছাপ পড়ে রয়েছে পাথরের গায়ে। কোন কোন ছাপের চারদিকে আছে আংটির মতো বৃত্ত চাপ আঁকা, আর কোন কোনটিতে অর্দ্ধবৃত্ত। চীনের উঁচু পাহাড়গুলোতে এ রকম অসংখ্য পেয়ালা চিহ্ন রয়েছে। ইটালীতে স্পেন এবং ভারতবর্ষেও এ রকম দৃশ্য খুব বেশী চোখে পড়ে।

এখন প্রশ্ন হলো এই পেয়ালা চিহ্নগুলো কাদের এবং কিসের ? মিস্টার ফোর্টের যুক্তি কোন মহাকাশচারী যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো, পথ হারিয়ে ফেলতো, তখন তাদেরকে খুঁজে বের করবার জন্যে, তাদেরকে পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে ওপর থেকে ফেলা হতো সার্চলাইট বা সন্ধানী আলোক রেখা। ঐ বৈদ্যুতিক শক্তিই পাথরের গায়ে পেয়ালা চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। ওপর থেকে এতো বেশী তীব্র আলোক রেখা ফেলা হতো যাতে সেগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাদের কোনটা না কোনটা পথহারা পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এই উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়তঃ এমনও হতে পারে যে এ পৃথিবীর কোন একটা জায়গার বিশেষ ধরনের একটা পাথরের পৃষ্ঠদেশ বা বার্তা-গ্রহণকারী সু-উচ্চ পার্বত্যদেশ রয়েছে এবং ঐখান থেকেই যুগ যুগ ধরে অন্য পৃথিবীর বার্তা সংগ্রহ করা হচ্ছে। সময় সময় ভুল করে ঐ সব অপার্থিব বার্তা অন্য জায়গায় বিপথে ছড়িয়ে

পড়ে—বার্তা সংগ্রাহক জায়গাটা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। তৃতীয় অনুমানঃ—যে সব গ্রহান্তরের অধিবাসীরা এ পৃথিবীর মানুষ এবং তার সভ্যতার স্রষ্টা তারা প্যালেষ্টাইন, ইংল্যাণ্ড, চীন এবং ভারতের পাহাড়ে পাহাড়ে রেখে গেছে তাদের অতীতের স্মৃতি। এসব সাংকেতিক চিহ্নের পাঠোদ্ধার হলে বুঝতে পারা যাবে হয়তো যে সব অবতার ঋষি মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে দেবলোকের বার্তা ও জ্ঞান বয়ে নিয়ে এসেছেন যুগে যুগে তাদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা কি নির্দেশ এসেছে বার বার মহাকাশের অজানা পৃথিবী থেকে। (৪৩)

পেয়ালা চিহ্নগুলো নিয়ে এসব জল্পনা-কল্পনা . কিন্তু ঠিক আমার মনঃপুত হচ্ছে না। প্রথমতঃ, আমরা জানি টেলি প্যাথির সাহায্যে দূর দূরান্তরের সঙ্গে মানসিক সংযোগ রাখা সম্ভব—অর্থাৎ মনে মনে কথা বলা যায়। অন্য পৃথিবীর কোন অভিযাত্রী যদি এ পৃথিবীতে পথ হারিয়ে ফেলে, বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমারের মতো হন্যে হয়ে বেড়ায় পার্ব্বত্য প্রদেশে বনভূমিতে, তাহলে মহাকাশ কেন্দ্র থেকে তো তাদের সঙ্গে টেলিপ্যাথির সাহায্যে অদৃশ্য সংযোগ রক্ষা করা যায়; সেক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক আলো ছুড়ে মেরে পথ-হারা পথিককে খুঁজে বেড়াতে হবে কেন অন্য গ্রহের মহাকাশযানকে? অবশ্য এমনও হতে পারে, সে সব গ্রহের প্রাণীদের টেলিপ্যাথি জ্ঞান নাও থাকতে পারে। কিন্তু থাকাটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে আমাদের পৃথিবীতে যখন টেলিপ্যাথি নিয়ে দস্তুর মতো গবেষণা চলছে। ঋষি মহাপুরুষেরাও তো যোগ বলে টেলিপ্যাথির সাহায্যে তাদের জন্মভূমির (অন্যগ্রহ) সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে নিরন্তর। সেক্ষেত্রে তাদের জন্যে কেন আবশ্যক হবে সাংকেতিক ভাষা বা ভাব?

দ্বিতীয় অনুমানটা অবশ্য ঠিক হতে পারে। অন্য গ্রহের কলোনী বা উপনিবেশ আমাদের পৃথিবীতে রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যেই বাণী পাঠানো হচ্ছে তাদের দেশ থেকে। পৃথিবীর পর্বতে, দুর্গম স্থানে, তুষারাবৃত অঞ্চলে যে অন্যগ্রহের উপনিবেশ থাকতে পারে এমন সম্ভাবনা নিয়ে অভিযাত্রী মহল এমন কি বৈজ্ঞানিক মহলও ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে শুরু করেছেন। তাহলে কি অন্য গ্রহগুলো এ পৃথিবীতে তাদের কলোনীগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবার প্রচেষ্টা করতে গিয়েই পর্বত গাত্রে এই সব পেয়ালা চিহ্ন

এঁকে দেয়? ধারণাটা যে অবৈজ্ঞানিক নয় তার প্রমাণ দেবার জন্যে আমি আধুনিক যুগের এক বৈজ্ঞানিকের পরিকল্পনার কথা বলছি। (৪৪)

১৮৭০ সালের কথা। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক চার্লস ক্রস মস্ত বড়ো একটা আতস কাঁচ তৈরী করবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ঐ কাঁচের সাহায্যে তিনি সূর্যের আলোকচ্ছটা প্রতিবিম্বিত করে ছুড়ে মারবেন মঙ্গলের বুকে। তার ফলে মঙ্গল-পৃষ্ঠে ঝলসানো দাগ পড়ে যাবে। এটা যদি করা সম্ভব হয়তো কাঁচটাকে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে মঙ্গলের মরুভূমিতে অক্ষর সাজান যাবে, যা পড়ে পৃথিবীর আহ্বানে সাড়া দেবে মঙ্গলের মানুষ। ফরাসী সরকার কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হোক এটা চাননি—মানে উৎসাহ দেখাননি। তাই পরিকল্পনাটা পরিত্যক্ত হয়েছিল।'

আচ্ছা, মঙ্গলের মরুর বালিরাশিতে চার্লস ক্রস কি ভাষা লিখতেন? পৃথিবীর ভাষা মঙ্গল বুঝতে পারবে কেন? সে যাই হোক এ পৃথিবীর এখানে ওখানে যে কাপচিহ্ন সেগুলো পৃথিবীর মানুষ পড়তে না পারুক, অন্য গ্রহের কলোনির লোকেরা'ত পড়তে পারবে তাদের মাতৃভাষা, কিংবা পরিচিত কোন সাংকেতিক চিহ্ন।

সে যাই হোক্, ঐ পেয়ালা-চিহ্নগুলো যে খুবই রহস্যময়, বৈজ্ঞানিকদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে অপার্থিব কিছু তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাক্, অতীতে যে মহাকাশযান অবতরণ করতো পৃথিবীতে, মহাকাশ-যানের সঙ্গে সুপরিচিত ছিল প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী তার আরও কয়েকটি সুস্পষ্ট পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের কথা উল্লেখ করা যাক্।

জাপানের মাইনিচি গ্রাফিক—একটা সেরা নামজাদা বিশ্বস্ত প্রজ্ঞামূলক সাপ্তাহিক। সে সাপ্তাহিকে প্রফেসর কোমাটস্কু কিটামুরা একটা আজগুবি প্রশ্ন সম্বন্ধে তার বিশেষ মতামত প্রকাশ করেছিলেন। খৃঃ পূঃ ৩০০০ শতাব্দী পর্যন্ত কি জাপানে গ্রহান্তরের মানুষ অবতরণ করতো? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর কিটামুরা যে বক্তব্য রেখেছিলেন সে সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে কিছু বলছি।

জাপানের উপাখ্যানে আছে কাপ্পাসদের কথা। ওরা নাকি জাপানে বাস করতো হীয়ান-যুগ পর্যন্ত। প্রাচীন পুস্তকে তাদের বর্ণনা আছে এই রকম:—তাদের দু'খানা পা জলচর পাখীর আঙুলের মাঝখানকার চামড়া দিয়ে ঢাকা, তাদের দু'খানা হাতের প্রত্যেকটাতে ছিল তিনটে বড়া নখ

ন্যায় বাঁকানো আঙুল—মাঝখানের আঙুলটা ছিল দু'পাশের দুটোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত লম্বা। তাদের গায়ের চামড়া ছিল বাদামী রঙের, মসৃন সিল্কের মতো, জলজলে উজ্জ্বল। তাদের মাথা ছিল লম্বাকৃতি, তাদের কানগুলো ছিল ত্রিকোণাকার ত্রিভূজের মতো—অদ্ভুদ রকমের দেখতে। প্রফেসার কিউমুরা আরও খোঁজ খবর নিয়ে জানলেন ওরা পরতো তাজ্জব ধরণের টুপি। সে টুপিতে লাগানো থাকতো চারটে ছুঁচ। তাদের নাকটা ছিল হাতীর শুঁড়ের মতো দীর্ঘকায়,—সেটা সংযুক্ত ছিল পিঠের উপর বাস্কেট সদৃশ একটা কুঁজের সঙ্গে। প্রাচীন লোক এবং পুঁথির বর্ণনাক্রমে তারা নাকি স্থলে জলে সব জায়গায় সমান দক্ষতায় চলতে ফিরতে পারতো।



মহাকাশযান মহাকাশে না পাঠাবার আগে, মহাকাশচারীদের পোষাক-পরিচ্ছদ আবিষ্কৃত না হওয়ার আগে, মানুষ মহাকাশে কৃতিত্বের সঙ্গে পাড়ি জমাবার আগে এসব কথাকে হাসি মুখে কাল্পনিক অবাস্তব নিতান্ত উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতো নির্ভাবনায়। কিন্তু এখন সাধারণ লোক পর্যন্ত জানে মহাকাশচারী এবং তাদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে। ব্যাঙ-মানুষদের সঙ্গে আধুনিক ব্যাঙ-নরদের (মহাকাশচারী বা নভশ্চর) সঙ্গে হুবহু মিল চোখে পড়ার মতো। তাদের গায়ে ছিল সুমসৃণ বাদামী

রঙের টাইটফিট ওয়াটারপ্রুফ মহাকাশ-পোষাক, তাদের পিঠের উপরের যে বাস্কেট সদৃশ কুঁজটা তা ছিল যন্ত্রপাতি ভর্তি, আর ঐ যে হাতীশুঁড়ো নাক সেটা ছিল অক্সিজেন টেনে নেবার জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত যন্ত্র। এবং ঐ যে টুপির উপর চারটে ছুঁচ প্রফেসার কিটামুরার মতে সেগুলো হলো রেডিও-তার বা এ্যারিয়াল যেগুলোর সাহায্যে মূল মহাকাশ-যানের সঙ্গে তারা সংযোগ রক্ষা করতো।

প্রফেসার কিটামুরার মতে ঐসব গ্রহান্তরের মানুষদের বংশধররাই কাপ্পাস। এরা খুবই ওস্তাদ ডুবুরি। ওদেরও বিশ্বাস ওরা এসেছিল মহাকাশ থেকে। ওরা গ্রহান্তরের মানুষদের বংশধর। এক হাজার বছর আগে জাপানের যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল তা থেকে এ কথাটাই বলা যায় কাপ্পাস জাতীয় লোকেরা জাপানীদের বংশধর মাত্র নয়; কারণ, এক হাজার বছর আগেকার সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তারা বেমানান। কাপ্পাসদের সম্বন্ধে যে সব গল্প প্রচলিত আছে তা থেকে আরও জানা যায় তাদের নাকি মহাকাশযান ছিল—সেগুলো দেখতে ছিল বিরাট বিরাট শঙ্খের মতো—সেগুলো জলের উপর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটতে পারতো এবং মহাকাশেও উড়ে যেতে পারতো চোখের নিমেষে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় জাপানের হোমসিউ দ্বীপের অদ্ভুত রকমের পাথরের মূর্তি অর্থাৎ ডোগুমূর্তির কথা। তাকে দেখতে আধা-মানব ডুবুরির মতো। শিরস্ত্রাণ খুবই ছোট, চোখের উপর চশমার মতো লাগানো জিনিষগুলো আকারে খুবই বড়ো -চোখ ছাড়িয়ে দুপাশে বেশ খানিকটা বেরিয়ে এসেছে, বাহুগুলো কোমড় পর্য্যন্ত নাবেনি, তাদের ধার বা পাশগুলো বৃহৎ এবং ভারী রকমের, ক্রিকেটের ষ্টাম্পের মতো পাগুলো দেখতে এক জোড়া গব্‌লেট বা হাতল-শূন্য বিরাট পানপাত্রের মতো।

এদের শিরস্ত্রাণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জোরোভস্কি বলেছেন—এশিয়ার বিভিন্ন আদিবাসী ওঝা বা যাদুকররা যে মুখোস পরে থাকে তা কি ঐসব মহাকাশচারীদের অনুকরণেই? তাদের পূর্ব স্মৃতি স্মরণ করবার জন্যেই ঐসব মুখোস কি মহাকাশচারীদের শিরস্ত্রাণের অনুকরণে নির্মিত নয়? যুগ যুগ ধরে এহেন মুখোসে যাদুশক্তি লুকিয়ে আছে মনে করা হচ্ছে। সমাধি বা শবদাহ ক্ষেত্রে যাবার সময় পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসীরা এক রকম মুখোস পরে থাকে। কেন পরে? তারা কি পৌরাণিক নভ-

শ্চরদের কথা স্মরণ করেই এ জাতীয় মুখোস পরে? তাদের বিশ্বাস ঐ মুখোসের সাহায্যে মৃতব্যক্তি দ্রুত স্বর্গাভিমুখে আরোহণ করবে এবং আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে—পৃথিবীতে আসবার আগে না হয় স্বর্গ রাজ্যে একটু মিষ্টি ঘুম ঘুমিয়ে নেবে। তারপর তাজা শরীর মন নিয়ে হাসি মুখে ফিরে আসবে পৃথিবীতে। এ রকম একটা দুরাশা পোষণ করে কেন ওরা মনে? জেরোভস্কির উত্তরঃ—তারা হয়তো গ্রহান্তরের মহাকাশ-চারীরা যে কৃত্রিম নিদ্রা বা আধুনিক ভাষায় হাইপোথালমিয়া পদ্ধতি (যে পদ্ধতিতে মহাকাশচারীরা মহাকাশে মৃতের মতো সুদীর্ঘকাল ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে এবং যথা সময়ে জেগে উঠতে পারে) অবলম্বন করতো তাই হয়তো তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে থাকবে।

মোজেলের ভিত্তিতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এমন কিছু নিদর্শণ আবিষ্কার করে-ছেন যেগুলো ১০০০০ বছর থেকে ১৫০০০ বছরের প্রাচীন। ঐসব আবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে আছে মহাকাশ শিরস্ত্রাণে ঢাকা মাথার খুলির মতো কতকগুলো পাত্র। ওগুলো অপার্থিব নভশ্চরদের স্মৃতি ধরে রাখবার প্রয়াস মাত্র?

মণ্টে এ্যালবামে আবিষ্কৃত হয়েছে ভাস্কর্যের কিছু নিদর্শণ। ঐসব রিলিফকে সাধারণ লোকের ভাষায় বলা যায়—নর্তক নর্তকীদের গ্যালারী। তারা নেচে চলেছে অপূর্ব ভঙ্গিমায়—মাটির উপর নেই যেন—ভাসছে শূন্যে। তারা পরেছে যেন ইয়ার ফোন বা স্পেশ্-হেলমেট (মহাকাশ শিরস্ত্রাণ)। তার সঙ্গে আছে যানটার পোষাক, ধাতুর তৈরী দস্তানা, এবং অদ্ভুত রকমের জুতো—তাদের বাহুতে এবং উরুদেশে বন্ধনীর চিহ্ন সু-স্পষ্ট। ঝ্যাপোটেক্‌রা অন্যান্য যে সব চিত্র অঙ্কন করেছে তাদের থেকে এসব চিত্র ভিন্ন ধরনের। ঝ্যাপটেকরা এখনো বাস করেছে ওয়াস্কা প্রদেশে। এক লক্ষ বেশী লোক ও ভাষায় কথা বলে থাকে।

ককা' উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা রাজদণ্ড শিরোভূষণ প্রভৃতি আবিষ্কার করেছেন। যাকে বলে স্পাইর‍্যাল। ঐ স্পাইর‍্যালই হলো ওখানকার সব সাজ সজ্জার প্রধান অঙ্গ। ব্রিটেন, আমেরিকা এবং রাশিয়ার পুরাতাত্ত্বিকেরা এই স্পাইর‍্যালের রহস্য ভেদ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। রাশিয়ার পুরাতাত্ত্বিকগণ হোমেটের সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন। তাদের মতে ঐ শঙ্খিল রেখা বা স্পাইর‍্যাল বিশ্বের প্রতীক (জ্যোতির্বিদ্যানুসারে)। ধর্মের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে ওটা হলো সৃষ্টির নিদর্শণ। বিশেষজ্ঞদের

মতে ঐ শঙ্খিল রেখা হলো সৌখিনভাবে আঁকা ছায়াপথ। কিন্তু, এখন প্রশ্ন হলো যারা ছিল কিনা (ঐতিহাসিকদের মতে) জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ, যারা সভ্যতার আলোই ভালো করে দেখতে পায়নি তারা কি করে ঐ ছায়াপথ সম্বন্ধে অবগত থাকতে পারে? ছায়াপথ হলো আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার। আমাদেরকে এখন দু'টো অনুমান গ্রহণ করতে হয়। প্রথমতঃ আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা সভ্যতার দিক দিয়ে খুবই উন্নত ছিল, দ্বিতীয়তঃ, গ্রহান্তরের মানুষ তাদের মধ্যে এসে থাকবে এবং তারাই ওদেরকে ঐ প্রতীক চিহ্নটা উপহার দিয়ে থাকবে। সিমানিওভের বিশেষ অভিমত:—সম্ভবতঃ, ঐ স্পাইর‍্যাল নভশ্চরদের মহাকাশযানটার পোষাকের অঙ্গ শোভিত করতো—সোজা কথায় নভশ্চরদের পোষাকে ঐ চিহ্নটা আঁকা থাকতো। স্থানীয় লোকেরা-ঐসব নভশ্চরদের স্মৃতিকে ধরে রাখবার জন্যেই ঐ স্পাইর‍্যাল চিহ্নকে নিজেদের একান্ত প্রিয় প্রতীক চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। (৪৫)

সম্বলের উপাখ্যানের থেকে আমরা জানতে পারি আগরথার কথা। ঐ রাজ্যটা ছিল হিমালয়ের কোথাও না কোথাও অবস্থিত। ওসেনডাউস্কির মতে মানুষের প্রজ্ঞা ও মনের কেন্দ্রভূমি এই রাজ্যটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ছ'লক্ষ বছর আগে। সে কবে হাজার হাজার বছর আগে ঐ রাজ্যটা হারিয়ে গেছে হিমালয়ের গহ্বরে—তবুও আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা তাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? কারণ, আগরথা সম্বন্ধে যেসব গল্প কাহিণী প্রচলিত আছে সেগুলো থেকে জানা যায় মহাকাশ-অভিযানের কথা। মহাকাশযানে চড়ে ঐ রাজ্যে অবতরণ করতেন দেবতারা। সংস্কৃত পুস্তকে যে সব দেবতা এবং বীরদের কথা লেখা আছে তাদের সঙ্গে মিলে যায় ঐসব গল্পের বীর এবং দেবতাদের কথা। সুতরাং, বৈজ্ঞানিকেরা ঐ আগরথাকে বিশেষ সমীহের চোখে দেখবার চেষ্টা করেছেন। হিসিং-সু ছিল ঐ আগরথা রাজ্যের রাজধানী। আগরথা এবং তার রাজধানী হিসিং-সুর কথা মিথ্যা নয় তার প্রমাণ মিললো ১৭২৫ সালে। ঐ বছরে ফরাসী অভিযাত্রী ফাদার ডুপার্ক হিসিংসুর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করলেন। ১৯৫২ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিযাত্রী দল সেই ধ্বংসাবশেষের গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলেন। তিব্বতের সন্ন্যেসীরা অভিযাত্রী-দের নানা রকম সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়ে বললেন—এই দেখুন হিসিং-সু'র

স্মৃতি চিহ্ন। তার মধ্যে ছিল, একটা পুরানো দলিল। সে দলিলে একটা তিনতলা পিরামিডের বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল। ঐ পিরামিডের তিনতলা তিনটে অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রাচীন ভূমি—যখন মানুষ নক্ষত্রলোকে উঠে যেতো, মধ্যভূমি—যখন মানুষ নক্ষত্রলোক থেকে নেমে আসতো, নতুনভূমি—সুদূর অজানা নক্ষত্র জগৎ। সন্নেসীদের এই বর্ণনা বৈজ্ঞানিকদের রহস্যময় মনে হলো। তারা একটা আন্দাজ করে নিলেন—তাহলে কি প্রাগৈতিহাসিক যুগের সুদূর অতীতে মানুষ কোন স্বর্গরাজ্যে পরিভ্রমণ করতো এবং ফিরে আসতো? কিন্তু কিছুকাল পরে তারা মহাকাশ ভ্রমণের সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা ফিরলেন একটা মন্দিরের বর্ণনা সঙ্গে নিয়ে। বহু বছর আগে ফাদার ডুপার্ক মন্দিরের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন সেই বর্ণনার সঙ্গে এই বর্ণনার হুবহু মিল। তিব্বতের ঘটনাপঞ্জীতে লেখা আছে সেই মন্দিরের বেদীর উপর চাঁদ থেকে আনা একটা পাথর রাখা হতো। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় পাথরটা চাঁদ থেকে পড়েনি। অর্থাৎ ওটা উল্কা জাতীয় পাথর নয়। তাহলে চাঁদে গিয়ে কেউ এনেছিল এই পাথর? এ যুগের মানুষ যেভাবে চাঁদ থেকে পাথর এনেছে ঠিক সেইভাবে! ঐ পাথরটার বর্ণনা থেকে জানা যায় ওটার রং ছিল দুধের মতো সাদা। তার চারধারে ছিল অপূর্ব সুন্দর শিল্পচাতুর্যের স্বাক্ষর। চারধারে আঁকা ছিল দেবতাদের তারার উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুল। চারধারে ছিল সরু স্তম্ভ—রূপো দিয়ে মোড়া।

ঐ চাঁদের পাথরটা কিসের প্রতীক? সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন:- অতীত যুগের মহাকাশচারীরা অন্য গ্রহে গিয়ে যে উপনিবেশ গড়েছিল ঐ পাথরে আঁকা উদ্ভিদ ও প্রাণী কি সেই গ্রহেরই উদ্ভিদ এবং প্রাণীর অনুকরণে আঁকা? ঐ মনোলিথ বা রূপো মোড়া স্তম্ভগুলো কি মহাকাশযানের প্রতীক? (৪৬)

সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা শুনেছিলেন হিসিং নুর (Hsing Neu) অধিবাসীরা খুবই সুসভ্য ছিল; তারা অনেক দূর দূরান্তরের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারতো; এমন কি মহাকাশেও তারা নিজেদের চিন্তা ভাবনা পাঠিয়ে দিতে পারতো কোন শব্দ বা সংকেতের সাহায্য ছাড়া। এ কি করে সম্ভব? সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম

বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ পড়ে এই উদ্ভট কথাগুলোতে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে পারলেন। তারা এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিলেন —কি করে শব্দ বা সংকেতের সাহায্য ছাড়া দূর দূরান্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

তারা এই গবেষণা চালাতে লাগলেন গোপনে। কারণ, স্টালিন এসব ব্যাপারকে ধর্মধ্বজাধারী আর যাদুকরদের উদ্ভট আচরণ আর শয়তানী কারসাজি হিসেবে অভিহিত করলেন। তিনি এ জাতীয় গবেষণাকে প্রশ্রয় দিলেন না। নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। লিওনেভ্ ভেসিলিয়েৎ (সোভিয়েত বিজ্ঞান সংসদের সদস্য) পরে জানিয়েছিলেন যে স্টালিনের আমলে তিনি এ ব্যাপারটা নিয়ে গোপনে গবেষণা চালাতেন লেনিনগ্রাদে। এই গবেষণার সাহায্যে তিনি এমন প্রমাণ বের করতে পারলেন যে ভূ-গর্ভস্থ পাষাণ-বাঁধানো গহ্বরের মধ্যে কাউকে বন্দী করে রেখেও তার সঙ্গে টেলিপ্যাথির সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করা, তার সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করা, চিন্তা ভাবনার আদান প্রদান করা সম্ভব। কামিনৃস্কিও এর সমর্থনে নানা সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করলেন। ক্রুশ্চেভের আমলে তিনি নিজেই অনুরূপ গবেষণাকে উৎসাহিত করে গিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা অতি সুবিধেজনক হবে। মহাকাশ-যানের যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে মহাকাশচারিরা এই টেলিপ্যাথির সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে এবং পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকেরা জানতে পেরেছিলেন 'নক্ষত্রলোকে'র পথের কথা, অর্থাৎ নক্ষত্রলোকে যাবার পথের কথা। ব্যাপারটাকে ভালো করে পরখ করে দেখবার জন্য ১৯৫৯ সালে তারা গেলেন তিব্বতে। গলডেনের মঠে তারা দেখা পেলেন একজন বৃদ্ধ সন্ন্যেসীর। জ্যোতির্বিদ্যা এবং মহাকাশ যাত্রা সম্পর্কে তার ধারণা খুবই স্পষ্ট। এ সব বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা প্রশ্নাতীত। কথায় কথায় তিনি বৈজ্ঞানিকদের বললেন যে তিনি অন্য পৃথিবীর অধিবাসীদের ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসতে পারেন। কথাটা শুনে বৈজ্ঞানিকগণ চমকে উঠলেন। সন্ন্যেসীকে চেপে ধরলেন আমাদেরকে এই রকম একটা অভিজ্ঞতার সামিল হতে দিন। সন্ন্যেসী রাজী হলেন না। কিন্তু ভদ্রলোকের নাছোড়বান্দা মনোভাবের কাছে

অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তবে, দুজন, দুজন মাত্র তার সঙ্গে আসতে পারেন।

সন্ন্যেসী দুজন বৈজ্ঞানিককে বেছে নিলেন। সন্ন্যেসী তাদেরকে মনো সন্নিবেশ শিক্ষা দিলেন, শেখালেন যোগব্যায়াম। তারপর তাদেরকে খেতে দিলেন একপ্রকার বিশেষ খাদ্য। দুজন বৈজ্ঞানিক বাধ্য ছাত্রের মতো সন্ন্যেসী যা বলেন তাই করে যেতে লাগলেন। অজানাকে জানবার জন্য কি দুস্তর সাধনা! এক সময় সন্ন্যেসী দুজন বৈজ্ঞানিকদের এক একটা হাত টেনে নিলেন নিজের হাতের মুঠোয়—আর তাদেরকে বললেন পূর্বনির্ধারিত পথে মনঃ সন্নিবেশ করতে। আরা চোখ বুজে রইলেন। তাদের সামনে ছিল একটা যন্ত্র, সে যন্ত্রটা থেকে মাঝে মাঝে একটা চাপা শব্দ বেরিয়ে আসছিল। সে শব্দের কোন প্রতিধ্বনি ছিল না। হঠাৎ ঐ যন্ত্রের মাঝখানে একটা মেঘাবৃত মূর্তি দেখতে পেলেন বৈজ্ঞানিকেরা। ওটাকে একটা মানুষের মতোই মনে হচ্ছিল। তবে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব দেখা যাচ্ছিল না। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো মনে হচ্ছিল পোকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো জোড়া দেওয়া—অর্থাৎ সর্বাঙ্গে একটা খাপছাড়া ভাব। সেটা সোজা সটান স্থির দাঁড়িয়েছিল। তার সামনে দেখা গেল হঠাৎ একটা সৌরজগৎ। সে জগৎটা ঘুরছিল। বৈজ্ঞানিক দুজন গ্রহগুলো গুনে যেতে লাগলেন। কিন্তু একী! দশটা গ্রহ যে, নয়টার পরিবর্তে দশটা! দশটা গ্রহের কথা পৃথিবীর কেউ'ত জানে না। প্লুটোর কক্ষপথের বাইরে অন্য একটা গ্রহ পথ পরিক্রমা করে যাচ্ছিল আপন মনে। (৪৭)

ঐ সৌরজগৎটা হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হলো সে সম্বন্ধে কিছু বলতে সন্ন্যেসী অস্বীকার করলেন, শুধু এ কথাটি বললেন: প্লুটোর বাইরে সত্যি সত্যি আরও একটা গ্রহ রয়েছে। বলা বাহুল্য সাম্প্রতিকালে সৌর জগতের এই দশম গ্রহটা নিয়ে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে জোর বাদানুবাদ চলছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই দশম গ্রহটার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান। যে মূর্তিটা তারা দেখেছিলেন সেটার মধ্যে এমন একটা অপার্থিব ভাব ছিল যে তা বর্ণনা করা যায় না। ওটাকে দেখলে চিত্ত মোহিত হয়, অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব জাগে। সম্প্রতি চীনা নক্ষত্রবিদ্‌রা এই দশম গ্রহটা আবিষ্কার করেছেন।

সোভিয়েত মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এখন ভারতের প্রতি ঝুঁকেছেন বেশী। ভারতীয় শাস্ত্র, পুরাণ মহাকাব্য প্রভৃতি নিয়ে তারা গবেষণা চালাচ্ছেন।

ভারতীয় যোগশাস্ত্র নিয়েও তাদের মাথাব্যথা। ভারতীয় যোগশাস্ত্রে লেখা আছে যোগের সাহায্যে মানুষের শরীরকে ইচ্ছানুসারে ছোট কিংবা বড় করা যায়, ভারহীন অথবা অদৃশ্যও করে ফেলা যায়। এ প্রসঙ্গে আমরা যদি উড়ন্ত চাকিগুলোর ছোট কিংবা বড় হওয়া এবং অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করি'ত সে সব কথাকে বা ঘটনাকে আর অতো অবিশ্বাস্য ঠেকবে না। শুধু তাই নয়, যোগীরা মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে ভ্রমণ করতে পারেন, গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়াতে পারেন, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পথের যে কোন বাঁধাকে ওরা অপসারন করতে পারেন, সব বিপদকে কাটিয়ে উঠতে পারেন। যোগীরা অনেক অসম্ভব কাজ করতে পারেন—তারা ভূ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন, পাথরের শক্ত পুরু দেয়াল ভেদ করতে পারেন, যে কোন বস্তুকে সৃষ্টি করতে অথবা নির্মূল করতে পারেন এবং অন্য লোকের শরীরে মনে আত্মায় প্রবেশ করতে পারেন। এই সবই করা যায় সমাধির সাহায্যে। দেবতাদের এই অলৌকিক শক্তি সহজাত, তাই কি পুরান ভাগবতে আমরা দেখতে পাই যে দেবতারা ইচ্ছে মতো এক লোক থেকে অন্য লোকে যাতায়াত করছেন?

দেবতাদের এই যত্র তত্র বিচরণ করার ক্ষমতা যদি সহজাত হয়'ত অন্য তারা থেকে, অন্য লোক থেকে দেবতারা আমাদের পৃথিবীতে আসতে পারবেন না কেন? মানুষ যদি তাদেরকে তাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এবং ভাবে যে বেশ কয়েকটি লাইট ইয়ার বা আলোক বছর পেরিয়ে তাদের পক্ষে এ পৃথিবীতে অবতরণ করা প্রায় অসম্ভব তাহলে যোগশাস্ত্রে যাদের বিশ্বাস তারা তাদের কথাকে গুরুত্ব দেবেন কেন? এ প্রসঙ্গে অউদ্রের কথা স্মরণীয়।

যাক, এখন বৈজ্ঞানিকদের ভাবনা মানুষ কি করে সমাধি লাভ করতে পারে, যোগ প্রভাবে অসাধ্য সাধন করতে পারে,—মানুষ'ত আর দেবতা নয়। যোগশাস্ত্রে লেখা আছে মানুষ এবং দৈত্যরা এ ক্ষমতা লাভ করতে পারে বর্ধি'র (herb) সাহায্যে। ভারতবাসীরা নাকি এমন ওষধির কথা জানতো যার রস খেলে মনে হতো সে যেন উড়ে যাচ্ছে, তার শরীরটা ভারহীন হয়ে পড়ছে। একটা আশ্চর্য রকমের শক্তির অধিকারী হতে পারতো তারা। এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করা দরকার প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কথা। আজকের সর্বরোগহর পেনিসিলিনের প্রায় সম পর্যায়ের ঔষধের ব্যবহার জানতো ভারতবাসীরা। ভারতবাসীরা শাক সব্জীর

রসের সাহায্যে তারা বিটিসের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিরও চমৎকার চিকিৎসা করতে পারতো। আজকালকার ইনসিউলিনের চেয়ে সেই শাকসব্জীর রস কোন অংশে কম ফলপ্রসূ ছিল না। এসব নানা কারণে প্রফেসর অ্যানজেলো ভিজিয়ানো, যিনি ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ওপর যথেষ্ট গবেষণা করেছেন—বলেছেন : গাছ গাছ্‌ড়া, ওষধি শাক সব্জীর রসের সাহায্যে মানুষের রোগের চিকিৎসা এবং অন্যান্য ফলপ্রসূ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আধুনিক মানুষ ভারতবাসীদের চেয়ে পিছিয়ে আছে।

রুশ বিজ্ঞানীরা এসব কিছুর ওপর গবেষণা চালাচ্ছেন। বিশেষ করে ভারতীয় মহাকাশযান 'ধুরাকপালম'কে নিয়ে তারা খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। এ প্রসঙ্গে পিটার কলোসিমো আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন : রুশ বিজ্ঞানীরা তাদের জার দ্বিতীয় নিকোলাসের পদক্ষেপই অনুসরণ করতে চলেছেন এ দিক্ দিয়ে। দ্বিতীয় নিকোলাসও এই মহাকাশযানটিকে নিয়ে খুবই মাথা ঘামাতেন। এই ধুরাকপালমের ওপর ফরাসী গূঢ়তত্ত্ববিদ্ 'সেদীর' একটা বই লিখেছিলেন। এ বইটা ছিল দ্বিতীয় নিকোলাসের নিত্য সাথী। তিনি ঐ বইতে তার এক গুরুর সঙ্গে ঐ মহাকাশযানের নিমার্তা এবং চালকদের এক সাক্ষাৎকারের কথা বর্ণনা করেছেন। সেদীরের সঙ্গে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের সঙ্গে নাকি খুবই দহরম মহরম ছিল এবং তিনি তার সঙ্গে বরাবরই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। জারের ব্যক্তিগত কাগজ দলিল পত্র নিয়ে গবেষণা চালালে এই রহস্যময় মহাকাশযান সম্পর্কে আরও বিস্তৃত তথ্য জানা যেতে পারে।

দাক্ষিণাত্যের যে পরিত্যক্ত নগরীতে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত সেই জায়গাটার একটা পর্বত শীর্ষে বাস করতেন সন্ন্যেসীরা। ঐ সন্ন্যেসীরা নাকি পার্থিব চুম্বক শক্তি থেকে ধাতু উদ্ধার করবার গুপ্ত বিদ্যা জানতেন। সেই সব ধাতুকে অতি স্বচ্ছ পদার্থে পরিণত করতে পারতেন এবং সে সব পদার্থের মধ্যে শক্তির স্ফূরণ ঘটাতে পারতেন। ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে তারা ঐ সব পদার্থে আঘাত করতেন। এবং তাতেই ঐ শক্তির স্ফূরণ ঘটতো। ধুরাকপালমও ছিল একটা স্বচ্ছ টিউব বা নলের মতো দেখতে—যা নাকি সোনার মতো চিক্‌মিক্ করতো। ওটা ছিল ৫ ফুট চওড়া। সেই নলাকৃতি যানটির মধ্যে চালক বসতেন একটা বাক্সের ওপর যেটার মধ্যে এমন জ্বালানি থাকতো যার সাহায্যে উৎপন্ন হতো

অপার্থিব রকমের শক্তি। তার সামনে থাকতো চক্‌মকে একটা সোনার চাকৃতি।* তিনি দুটো স্বচ্ছ গোলাকার স্ফীত অংশের ওপর হাত রাখতেন এবং সেগুলোর সাহায্যে ·মহাকাশযানটার গতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। ঐ স্ফীত অংশ দুটোর সঙ্গে ব্যাটারীর সংযোগ রক্ষা করতো কয়েকটা রূপোর তার। একট অস্ফুট শব্দ তুলে মহাকাশযানটা উঠে যেতো উপরে। আকাশের এমন একটা স্তরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতো মহাকাশযানটা যে স্তরের বর্ণনা দিয়েছেন সেদির এভাবে:—ছাই রঙের শূন্য বিরাজ করে সেখানে। সেই ধূসর শূন্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ভিন্ন রঙের লম্বা লম্বা দাগ; এবং বিস্ফোরণের ফলে ছড়িয়ে পড়া শ্বেত ফুটকি কিংবা বিন্দু এখানে ওখানে সর্বত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা আকাশের এই স্তরটাকে বলতে পারি স্ট্রাটোস্ফিয়ার। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মধ্যে দিয়ে ধুরাকপালম্ মহাশূন্যে গিয়ে পড়তো,—অবিশ্বাস্য গতিতে ঘুরে বেড়াতো গ্রহে গ্রহে, সূর্য্য থেকে সূর্য্যে; সম্ভবতঃ ছায়াপথ থেকে ছায়াপথে। একাশি পৃষ্ঠার চিত্রের সঙ্গে ধুরাকপালমের সাদৃশ্য আছে কি?

আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে এ রকম একটা মহাকাশযানের কথা শোনা যেন স্বপ্ন দেখা। কারণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে এ রকম একটা মহাকাশযান তৈরী করা এবং ছায়াপথ থেকে ছায়াপথে ভ্রমণ করা একটা অসম্ভব অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু ১৯৭৫ সালে সোভিয়েত রাশিয়া যে প্রথম মহাকাশযান ছুড়ে মারলো পৃথিবীর কক্ষপথের চারিদিকে এবং তখন থেকেই মানুষের মহাকাশাভিযানের শুরু তা তো এ রকম কাল্পনিক উপাখ্যান লোকগাঁথা থেকে মাল মশলা সংগ্রহ করে। হয়তো এমন ও হতে পারে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মহাকাশযানের যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন তাদের অনুকরণেই কিংবা সেগুলো নিয়ে গবেষণা করতে করতেই মহাকাশযান তৈরী করে ফেলেছিলেন। সোভিয়েত দেশে টেলিপ্যাথি নিয়ে কি ভাবে গবেষণা শুরু হয়েছিল সে কথা স্মরণ করলে আমার বক্তব্যটাকেও গুরুত্ব দেওয়া সহজ হবে।

যাই হোক, ধুরাকপালমের কথা যতোই অবিশ্বাস্য ঠেকুক না কেন সেটাকে নিয়ে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকেরা প্রচুর মাথা ঘামাচ্ছেন। বলা'ত যায় না, এভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে তারা যদি ধূরাকপালমের রহস্য উদ্ধার করে ফেলতে পারেন। তাহলে'ত মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে অন্য একটা

নূতন যুগের সূত্রপাত হবে। মানুষ অনায়াসে গ্রহে গ্রহে, ছায়াপথে ছায়াপথে পরিভ্রমণ করতে পারবে। মানুষকে আর পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে না।

ম্যালকম হোয়াইট যে নাজকা মূর্তির চিত্রাবলী সংগ্রহ করেছেন সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাদের মাথাটা চ্যাপ্টা। চোখগুলো টানা টানা বড়ো—অনেকটা মুখোসের চোখের মতো। মাথাটা ঘাড়ের চেয়ে অস্বাভাবিক রকমের বড়ো। মুখটা কিন্তু ততোধিক ছোট, নাকটা অস্বাভাবিক রকমের। ওদের হাত দুটোও চোখে পড়ে না, ওগুলো যেন কোন গাউনের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। পায়ের পাতা ও পায়ের আঙ্গুলও চোখে পড়বার মতো নয়। বিশেষজ্ঞরা এই মূর্তিগুলোর রহস্য ভেদ করতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না ওগুলোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য কি। এ চিত্রগুলো কিন্তু সংখ্যায় বেশী নয়। অন্যান্য নাজকা চিত্রাবলীর তুলনায় দুষ্প্রাপ্য। পুরাতাত্ত্বিকরা সাধারণতঃ যে সব চিত্র ও মূর্তি উদ্ধার করে থাকেন সেগুলো থেকে তারা সেই সময়কার সামাজিক, সাংস্কৃতিক পারিবারিক ও ধর্মীয় ইতিহাস উদ্ধার করে থাকেন। নাজকা মূর্তির কোন রকম ঐতিহাসিক তাৎপর্য উদ্ধার করতে বিফল হয়েছেন কিন্তু ঐতিহাসিকেরা। তাদের মতে ঐ মূর্তিগুলোর বিশেষ ধরণের কোন তাৎপর্য রয়েছে। তবে তাৎপর্যটা বুঝে উঠতে তারা অক্ষম। তাহলে কি ঐ মূর্তিগুলোর তাৎপর্য অপার্থিব? মূর্তিগুলো যাদের প্রতিকৃতি তারা নিশ্চয় নাজকা সমাজের লোক নয়। তারা কি মহাকাশ থেকেই নেবে এসেছিল? নইলে ঐ মুখোস আর হাত পা ঢাকা-ওয়ালা পোষাক কেন তাদের দেহে? (৯২)

পেরুর নাজ্‌কা উপত্যকায় অসাধারণ অত্যাশ্চর্য রকমের কতকগুলো ভূমি-রেখা চোখে পড়ে। কতকগুলো সমান্তরাল রেখা চলে গেছে। দূরে অনেক দূরে আর কতকগুলো সেগুলোকে অতিক্রম করে গেছে, দেখলে বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের রাস্তা মনে হয়। সাধারণতঃ এদেরকে 'ইনকাদের রাস্তা' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু, এসব রাস্তা ধরে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছুনো সম্ভবপর নয়। এরা কতকগুলো ট্রাপিজয়ড, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও অন্যান্য জ্যামিতিক আকার প্রকারের গোলক ধাঁধা তৈরী করেছে কেবল। অন্য কতকগুলো রাস্তাকে উপর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পাখী, মাকড়শা কচ্ছপ, বানর, সাপ, মাছ, তিমি, দৈত্যাকায় মানুষ—এমন আরও কতো

কি। এসব রেখা বা রাস্তার সত্যিকার স্বরূপ মানুষ প্রথম ধরতে পারে আকাশ থেকে। পেরুর সরকারের সেচ দপ্তর আকাশ থেকে সমীক্ষা চালাবার সময় বারে বারে এসব অপ্রাকৃত রেখা দেখে চমকে যান। মাটিতে দাঁড়িয়ে এদেরকে'ত মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হয় না—চোখেই পড়ে না। নাজকা উপত্যকার উপর দিয়ে মোটরে চড়ে যাবার সময় নাজ্‌কা রেখাগুলোকে অনেকেই অতিক্রম করেন কিন্তু তাদেরকে আরোহীদের মোটেই দ্রষ্টব্য বলে মনে হয় না।

তাহলে মাটির মানুষদের জন্যে এসব রেখার জন্ম নয়। আকাশে যারা উড়ে বেড়ায় এসব রেখা তাদের জন্যেই সৃষ্ট। ডঃ পল্‌ কোসাক এবং ডঃ ম্যারিয়া রীচ বলেছেন আকাশের লোকদের পথ নির্দেশ করবার জন্যেই এসব রেখার জন্ম হয়েছিল। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে নাজকা উপত্যকাটা ছিল গ্রহান্তরের মানুষদের কস্‌মোড্রোম—অর্থাৎ অন্যগ্রহের লোকেরা ওখানে এসে নাবতো।

এটা কি বিশেষজ্ঞদের নিছকই অনুমান, অর্থহীন কল্পনা মাত্র? পেরুর উপাখ্যান থেকে এ ধরণের অনুমানের ভিত্তি মেলে। প্রাচীন পেরুর উপাখ্যানে লেখা আছে ওরেজোনা দেবীর কথা। তিনি আকাশ থেকে নেমে এসেছিলেন বিরাটকায় একটা জাহাজে চড়ে।

নাজ্‌কা উপত্যকার মতো দৃশ্য আমেরিকার অন্যান্য জায়গাতেও চোখে পড়ে। পেরুর পিসকো উপসাগরের উপকূলে আন্দিজ পর্বতের ক্যান্‌ডে-ল্যাব্রায় এ জাতীয় খোদাই-চিহ্ন চোখে পড়ে। ক্যান্‌ডেলাব্রার ওসব সাংকেতিক চিহ্ন প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দূর থেকে দেখা যায়। বিরাটকায় এসব খোদাই চিহ্ন যেন অঙ্গুলি-সংকেত করছে নাজ্‌কা উপত্যকার দিকে। স্পেনের দিগ্বিজয়ীরা এসব চিহ্ন দেখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন ওটে একটা স্বর্গীয় চিহ্ন। স্বর্গ থেকে যিশুই যেন তাদেরকে প্রবোধ দিচ্ছেন ওসব সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে— এগিয়ে যাও, জয় করো, ওদেরকে সভ্য করো, ওদের মধ্যে আমার বাণী প্রচার করো।

গোবি মরুভূমিতে এবং তাকিস্থানের গুহায় সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন খুব পুরোনো সামগ্রি যেগুলো নাকি ব্যবহৃত হতো মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ কার্য্যে। এগুলো দেখতে গোলাকার, কাঁচ কিংবা চীনে মাটির তৈরী, মাথাটা দেখতে মোচার মতো। সেখানে রয়েছে এক ফোটা

পারদ। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা ও যন্ত্রটাকে চিনে উঠতে পারছেন না। ঐ যন্ত্রটার শেষ প্রান্তে আবার এক ফোটা পারদ কেন! কিন্তু, সংস্কৃত গ্রন্থ নিয়ে যে সব বিশেষজ্ঞরা গভীর ভাবে ভেবেছেন এবং পারদের বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন তারা নিশ্চয় জানেন যে স্বর্গীয় রথগুলো চালানোর কাজে তখন পারদের ব্যবহার হতো। মহাকাশযানের ক্ষেত্রে পারদের ভূমিকা ছিল রীতি মতো উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ এবং মহাভারতের দ্রোনপর্বে বায়ুযানের বা মহাকাশযানের যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় ঐ সব বিমানের আকৃতি ছিল মণ্ডল বা গোলাকার বস্তুর মতো। ওসব যান চলতো প্রবল বেগে দুরন্ত হাওয়ার উপর ভর করে এবং এই হাওয়ার গতিবেগ তৈরী করতো পারদ। চালক তার ইচ্ছে মতো যানটাকে চালাতে পারতো —নীচে কিংবা ওপরে, সামনে কিংবা পেছনে যে কোন ভাবে যে কোন দিকে। সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে একটা যন্ত্রের কথা জানা যায় যার গঠন ছিল খুবই মজবুত, সুন্দর। পারদের সাহায্যে চালানো হতো সে যন্ত্র। পারদ ঐ যানের পেছনে যখন শক্তি উদ্গীরণ করতো তখন সেটার পেছনে বিরাট একটা আগুনের পুচ্ছ তৈরী হতো। (৪২)

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউটনের ত্রিশত-বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছিল। সে সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কোস্টা অ্যানড্রেড কিছু নূতন তথ্য উদঘাটিত করেছিলেন। ধাতুর রূপান্তর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিউটন নাকি ১৬৭৬ সালে একটা চিঠিতে তার এক বন্ধুর কাছে লিখেছিলেন : পারদকে বিশেষভাবে অনুপ্রবিষ্ট করলে তাতে বিস্ময়কর ফল ফলতে পারে তা যারা জানতেন তারা সেই কৌশলটা গোপন রেখেছেন। পারদের মধ্যে এমন একটা সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে যার সাহায্যে পৃথিবীতে কোন রকম মারাত্মক অনিষ্ট সাধনের সম্ভাবনা সৃষ্টি না করেও (যেমনটা হয়েছে পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে) প্রভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনা যেতে পারে—অবশ্য সেই প্রাচীন ঋষিদের কথা যদি সত্যি হয়।'

আইজাক নিউটন কি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী হেনরী ক্যাভেনডিসের (যে রহস্যময় মানুষটির ছিল অলৌকিক জীবনযাত্রা) মতো হিন্দু পুরাণ পড়েছিলেন? নইলে পারদের ঐ বিস্ময়কর শক্তি সম্ভাবনা সম্বন্ধে জানলেন কি করে! অন্য কোন দেশের ঋষিরা যে পারদের শক্তি সম্বন্ধে কোন কিছু লিখেছেন তা বিশেষজ্ঞদের জানা নেই। হয়তো নিউটনের

বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির মূলে রয়েছে ভারতবর্ষ। এ সম্বন্ধে তাঁর সমকালীন এক বন্ধুর উক্তির উদ্ধৃতি দেবো তৃতীয় অধ্যায়ে।

আধুনিক মহাকাশ বৈজ্ঞানিরাও এই পারদ শক্তি সম্বন্ধে খুবই সচেতন হয়ে উঠেছেন। পারদকে মহাকাশযান চালাবার কাজে সার্থকভাবে প্রয়োগ করবার গবেষণা চালাচ্ছেন তারা। ১৯৫৯ সালে প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক মহাকাশ সংক্রান্ত অধিবেশন বসেছিল সেখানে এই পারদ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা চলেছিল। সেখানে তোলা হয়েছিল পারদচালিত মহাকাশ-ইঞ্জিনের কথা। ১৯৬৫ সালে ফ্রান্স পারদের সাহায্যে মহাকাশে মহাকাশযান ছুড়ে মারবার একটা বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল—এ পরিকল্পনার নাম ফিটন পরিকল্পনা।

উমেরায় যে মূর্তিগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো আরও অর্থবহ। তাদের একটার বুকের ওপর এমন কতকগুলো চিহ্ন আছে যেগুলোকে কোন স্পেশ-স্যুটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বললে ভুল হবে না। অন্য একটার পোষাকের ওপর এমন দুটো বস্তু আঁকা রয়েছে যেগুলোকে হেড্-ফোনের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। অন্য একটা গোলাকার পাথরের ওপর যে মূর্তিটা আঁকা রয়েছে সেটা খুবই অর্থবহ। সেটা একটা পূর্ণ অবয়ব মূর্তি। সে মূর্তিটা দেখে একজন সাংবাদিক যেন স্বগতোক্তি করেছিলেন:—দেখে আমরা সহজেই এমন একটা অনুমান করে নিতে পারি যে শিল্পি নিশ্চয় আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন একখানা মহাকাশযান এবং তার সঙ্গে সে যানের পাদদেশে যে দৃশ্যাবলীর অবতারনা সেগুলোও। সত্যিকারের একটা মহাকাশযান কিনা—কিলবার্ণ কর্তৃক প্রকাশিত প্যানোরোমার মতে—এ ব্যাপারে দ্বিমত হবার উপায় নেই। সেই মহাকাশযাত্রার ঘটনাপঞ্জী আমাদের হাতে এসেছে অনেকগুলো মানব বংশের হাত ঘুরে। সেখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের বংশধর একজন বৃদ্ধ আদিবাসীর মতে—ঐ চিত্রের মাঝখানে যে লম্বা চওড়া সাদা ধবধবে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন তিনি হলেন গিয়ে মহাকাশের মানুষ, এবং তার বাঁ পাশে যে জিনিসটা আঁকা ওটাতে চড়েই মহাকাশ থেকে তিনি নেবে এসেছিলেন।

প্রফেসর আলেক্সি ক্যাসানজেভের মতে:—ঐ সব আঁকা ছবি এবং মূর্তি তাদেরই যারা বেশ কয়েক বছর আগে অন্ত গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসেছিল। ওগুলো নিয়ে আমাদেরকে গবেষণা করতে হবে, আরও বেশী করে মাথা

ঘামাতে হবে। ঐ মূর্তিগুলো নিয়ে আমরা নানা ভাবে জল্পনা কল্পনা করতে পারি—নানা ভাবে যুক্তি তর্কের অবতারণা করতে পারি কিন্তু তাদেরকে অতীতের মহাকাশযাত্রার স্মারক চিহ্ন হিসেবে আমাদেরকে মেনে নিতেই হবে। যেমন ধরুন, ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এ্যামুয়েল এ্যানাটি আল্পাইন উপত্যকায় যে গুহাচিত্র আবিষ্কার করেছেন তার কথা। সেখানে আপনি দেখবেন আশ্চর্য রকম শিরোভূষণ যেগুলোকে অতি সহজেই কাঁধ থেকে আলাদা করা যায়; সেগুলোতে গ্রহান্তরের মানুষের পরিহিত শিরস্ত্রাণের বহির্ভাগে যে সব যন্ত্রপাতি লাগানো আছে তাও দেখতে অদ্ভুত রকমের।

১৯৬১ সালে, নাভোই-এর উজবেক্ নগরীর সন্নিকটবর্তী সারমিস নামক একটা জায়গায় বি. এস সিয়ালটোনিন কতকগুলো পাথরে খোদাই চিত্র আবিষ্কার করেছেন। সেগুলো আরও অর্থবহ। এইসব চিত্র কম পক্ষে তিন হাজার বছরের পুরোনো। তবুও ওগুলো দেখেই যে কেউ বলতে পারবে ঐ চিত্রের মাঝখানে যে জিনিসটা আঁকা রয়েছে সেটা মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, যে লোকটা বসে আছে ভেতরে তার নাকে একটা যন্ত্র লাগানো—একটা শ্বাসজালি।

লেলিনগ্রাদ মিউজিয়ামে আপনি একটা ইউট্রাস্কান্ পাত্র দেখতে পাবেন। ক্যাসান্জেভের মতে ঐ পাত্রে আঁকা রয়েছে একটা রকেট বা মহাকাশযান। এ ছাড়া ঐ চিত্রে দেখা যায় মানুষের মতো একটা প্রাণী—যার মাথায় একটা শিরোভূষণ বা স্পেশ হেলমেট; ঐ সব প্রাণী বসে আছে একটা জাহাজে যেটাকে চালিয়ে নিচ্ছে রকেট প্রোপালসন।

নুবিয়ার প্রাচীন রাজধানী মিরু। সেখানে একটা প্রাসাদের ভিত্তি-ভূমিতে একটা মিসাইল পাওয়া গেছে। ঐ প্রাসাদটাকে বিশেষজ্ঞরা লণ্ডনের জোদ্রেল ব্যাঙ্কের মতো একটা মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে মনে করে থাকেন। সাধারণ দর্শক, এবং স্থানীয় লোকেরা বলে থাকে—এতে করে কিন্তু মহাকাশ যাত্রার কথা প্রমাণ হয় না। কারণ—মহাকাশযানের প্রতিকৃতি আশে পাশে পাওয়া যায়নি কোথাও। সুতরাং, এ অঞ্চলে যে মহাকাশযানগুলোর আনাগোনা চলতো প্রাগৈতিহাসিক যুগে অন্ততঃ এ কথাটা প্রমাণ হয় না। কিন্তু, পণ্ডিত ব্যক্তিদের অন্য মত। তারা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছেন জিনিস এবং স্মৃতিসৌধগুলো,

যেগুলো পরিষ্কার প্রমাণ করে দেয় মহাকাশযানের আনাগোনা চলতো এখানে।

টিয়াহুয়ানাকো'র সূর্যতোরণে যে সব ছবি আঁকা আছে—ক্যাসানোভ, জিরোভ এবং অন্যান্যদের মতে সেগুলোর মধ্যে আছে এমন সব মহাকাশযানের চিত্র যেগুলো স্বয়ংক্রিয়, চলতো সৌর-শক্তির সাহায্যে।

আমেরিকার কেভ্ অব্ হোলি ঘোস্ট নামক গুহায় কতকগুলো চিত্র পাওয়া গেছে। ও সব চিত্রাবলীর অনেকগুলোই মানুষের। এ সব চিত্রের প্রায় সব কটির মাথা থেকে প্রায় শিং-এর মতো (তবে ঠিক শিং নয়) দুটো উদ্‌গত অংশ বেরিয়ে এসেছে। এ শিংগুলোর আকার চৌকো—কোন কোন জায়গায় আবার গোলাকার। সুতরাং, ঐ শিংগুলোকে কোন শিরস্ত্রাণের অংশ হিসেবেই মনে করা যেতে পারে। এই চিত্রগুলো দেখে স্ত্রী কি পুরুষ সেটে বুঝে ওঠা দায়। অন্য কতকগুলো চিত্র থেকে দেখা যায় শরীরটা মানুষের, তবে পাখা এবং মাথাটা পাখীর। এরা যে পাখীর ছদ্মবেশে মানুষ তা স্পষ্টই বোঝা যায়। অন্য দু'একটা চিত্রে আবার মাথাটা মানুষের কিন্তু শরীরটা পাখীর, অর্থাৎ, যে চিত্রকররা ওগুলো এঁকেছেন তারা সর্বপ্রযত্নে এটেই বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা পশু কিংবা পাখীর চিত্র আঁকছেন না। পাখীর মাথা আর পাখা দেখে ঐ সব চিত্রকে কেউ পাখী হিসেবে ভ্রম করে এ ভয়ে শিল্পিরা দু'একটা চিত্রে পাখীর মুখোসটাকে খুলে নিয়ে মানুষের মাথাটাকেই খোলাখুলি দেখিয়ে দিয়েছেন।

এ সব চিত্রের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ উলকাঙ্গ হাবারল্যাণ্ড বলেছেন: 'Given such animal features imposed on human figures, we might expect a wealth of actual animals, in fact, they are strikingly absent. অর্থাৎ পশু পাখীর অবয়ব ঐ কতকগুলো মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অনেকেই মনে করে থাকবেন হয়তো ওগুলো বাস্তবিকই কোন না কোন পাখীর চিত্র, কিন্তু সে রকম অনুমান করার কোন অবকাশ নেই এক্ষেত্রে। (৯৩)

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিস্টার হাবারল্যাণ্ড বলতে পারছেন না কি পটভূমিকায় আঁকা হয়েছে ওসব চিত্র, এবং কোন যুগে কোন সময়ে আঁকা হয়েছে ওগুলো। এ জাতীয় চিত্র মধ্য আমেরিকার আর কোথাও চোখে পড়ে না। মোট কথা, মধ্য আমেরিকার সংস্কৃতি, সভ্যতার সঙ্গে এ চিত্রগুলো খাপ ছাড়া,

বেমানান। তাই, পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা এ জাতীয় চিত্রের রহস্য ভেদ করতে পারছেন না।

আমার প্রশ্ন: এই চিত্রগুলোর নিশ্চয় কোন তাৎপর্য আছে। নইলে শিল্পিরা এসব উদ্ভট চিত্র আঁকবেন কেন? তারা যদি কাল্পনিক কিছু আঁকতেন তাহলে সৌন্দর্যপূজারী শিল্পিরা চোখ জুড়ানো শিল্প সৃষ্টি করে যেতে পারতেন—সাধারণের চোখে কুৎসিত অসুন্দর এ সব চিত্র আঁকতেন না। তাহলে-এর তাৎপর্যটা কি?

শিল্পিরা নিশ্চয় আকাশ থেকে কোন মানুষকে নেমে আসতে দেখেছিলেন। উড়োজাহাজে করেই কি তারা নেবে এসেছিলো? তাহলে মুখোস পরলো কেন? তাহলে কি ওরা মহাকাশচারী?

১৯৬১ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার উজ্‌বেকিস্থানের ন্যাভাই শহরের নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে পাথরের ওপরে খোদাই চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। একটা যান। সে যানের চারদিকে রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একজন চটপটে লোক। তার চারদিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার যন্ত্র। এ জাতীয় চিত্রের কি তাৎপর্য থাকতে পারে? পুরাতাত্ত্বিকরা এ জাতীয় চিত্রের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না। কিন্তু তিন হাজার বছর আগে আঁকা এই চিত্রটাকে কি আমরা কোন মহাকাশযান হিসেবে ধরে নিতে পারি না? মহাকাশযানে চড়ে অন্য গ্রহ থেকে ওরা না আসবে তো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করবার জন্য যন্ত্র লাগিয়ে আছে কেন?

অস্ট্রেলিয়ার কিম্বার্লি উপত্যকার পশ্চিম দিকে প্রিন্সরিভার অঞ্চলে জোসেফ ব্রাড'শ একটা অদ্ভুত ধরণের চিত্র আবিষ্কার করেছিলেন আজ থেকে প্রায় ৮৩ বছর আগে। সেখানে নর নারীদের যে চিত্র আঁকা আছে সেগুলোর সঙ্গে ঐ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের কোন রকম মিল নেই। ঐ চিত্রের মাঝখানে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার কোন চোখ, নাক কিংবা মুখ নেই। তার গোলাকার মাথাটা দেখতে অনেকটা ডুবুরির শিরস্ত্রাণের মতো, একটা মহাকাশচারীর মুখোস হিসেবে মেনে নিলেই ভাল হয়। একটা রেশমী ঝাপ্পা যেন বাঁধা আছে তার বাহু এবং কোমড়ের সঙ্গে। সাহারায় যে মহাকাশচারীর চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সে চিত্রটার সঙ্গে এই লোকটার সাদৃশ্য রয়েছে। তার শিরস্ত্রাণ থেকে উদ্গত হয়েছে দুটো বাহু-বিশিষ্ট অদ্ভুদ দর্শণ ডিম্বাকৃতি জিনিস।

অদূরে দেখা যাচ্ছে একটা স্পাইর‍্যাল বা শঙ্খিল রেখা. এবং ঘোড়ার পায়ের নাল-সদৃশ একটা জিনিস—তার চারদিকে তেজ বিকীরণ হচ্ছে। চিত্রটার ঊর্ধে চোখে পড়ে অতি দুর্বোধ্য হায়ারোগ্লাইফিক্স। ঐ ঘোড়ার পায়ের নাল-সদৃশ জিনিসটা কি একখানা মহাকাশযান? লোকটার চোখ মুখ নাক নেই কেন? নিশ্চয় সে মুখোস বা শিরস্ত্রাণ পরেছে। শিরস্ত্রাণের ওপর যে ডিম্বাকৃতি জিনিস সেটা কি একটা অ্যানটেনা বা আকাশ তার (এরিয়েল)? বাহুতে এবং কোমড়ে যে সব জিনিস সাঁটা সেগুলো কি ইলেকট্রিক তার?



এ চিত্রটার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার এক প্রাচীন উপাখ্যানের চমৎকার মিল। গুড়িগুড কোত্থেকে এসেছিল তা কেউ জানে না। মহিলার শরীরটা ছিল স্ফটিকজাতীয় স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা। সে যখন উড়ে যেতো তখন তার চারদিক থেকে তেজাগ্নি বিচ্ছুরিত হয়ে পড়তো। গুড়িগুড কি তাহলে প্লাস্টিক জাতীয় স্পেশ স্যুট পরা কোন মহাকাশচারিণী? (উপরের চিত্র)

এসব সূত্র থেকে আমরা যদি ঐ সব মুখহীন ছবিগুলোকে শিরস্ত্রাণপরা মহাকাশচারী বা মহাকাশচারীণীর প্রতিকৃতি হিসেবে ধরে নিই, তাহলে তাই বেশী সন্তোষজনক বলে মনে হবে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। গোলাকার মুখ, মস্ত বড়ো চোখ, নাক মুখ-গহ্বর-হীন কর্ণহীন মাথা থেকে গলা পর্যন্ত বিশেষ রকমের শিরস্ত্রাণ দিয়ে ঢাকা এসব মূর্তিগুলো এঁকেছেন নাবিকেরা যারা জাহাজডুবি বা অন্য দৈব দুর্বিপাকের ফলে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে নাবতে বাধ্য হয়েছিল। জন্ এল ইদ্রিশ নামে একজন অস্ট্রেলিয় পণ্ডিত সাদা আদমীদের এ ব্যাখ্যাটাকে সহৃদয় মনে মেনে নিতে পারছেন না। তিনি বলছেন : যদি পথ হারানো পরিত্যক্ত নাবিকেরাই এ সব চিত্র আঁকতো তাহলে তারা'ত একটা জাহাজ আঁকতে পারতো, সমুদ্র আঁকতে পারতো, লিখতে পারতো তার সঙ্গিদের নাম, আঁকতে পারতো সঙ্গিদের ছবি। কিন্তু, এসব কিছুই ওরা করলো না। বিদ্-ঘুঁটে রকমের ছবিগুলো আঁকলো। শিল্পীদের ধর্ম সৌন্দর্য সৃষ্টি। এ সব চিত্রে সৌন্দর্যের লেশ মাত্র নেই।

যারা সব কিছুর একটা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে চান তাদের মতে বৃষ্টির আরাধনা এবং প্রকৃতির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্যে ধর্মান্ধরা এসব ছবি এঁকেছে। কিন্তু, এ ধরণের অদ্ভুত রকমের জিনিস তারা আঁকতে গেল কেন? তাদের গায়ে আবার অপার্থিব রকমের পোষাক কেন?

মোটকথা সব চেয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হলো, ও সব চিত্র মহাকাশযাত্রার পোষাক পরিহিত মহাকাশচারীদের। অনুমাত্র মাত্র নয়; কারণ, মহাকাশ থেকে যে মহাকাশচারীরা আসতেন তার সাক্ষ্য বহন করছে অস্ট্রেলিয়ার উপাখ্যান।

এখন ব্যবিলনের একটা উপাখ্যানের কথা বলা যাক্। কীশে'র রাজা ইটানা মহাকাশযাত্রা করেছিলেন। ইগলে চড়ে যাবেন তিনি। ঈগলটা তাকে আগে ভাগেই বলে রাখলে তারা ধাপে ধাপে গতি বাড়িয়ে তবেই মহাকাশের সেই লক্ষ্য স্থানে গিয়ে পৌছুবে।'

মহাকাশযানের গতি বাড়ে ধাপে ধাপে। ভূ-পৃষ্ঠের উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে একটা রকেট মহাকাশযানটাকে আকাশে ছুড়ে মারে, অন্য একটা রকেটের বিস্ফোরণ সেটাকে বায়ুমণ্ডল এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ওপারে মহাকাশে ঠেলে দেয়। অন্য মহাকাশযানটা ধাপে ধাপে

এগিয়ে চলে অনন্ত শূন্যের পথ ধরে। তাহলে ঐ ঈগলটাও একটা মহাকাশযান!

শুধু এটুকুই নয়, ইটানা ধাপে ধাপে ঊর্ধে উঠেছেন আর বারবার ঊর্ধাকাশ, মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে কি রকম দেখায় তার বুদ্ধিদৃপ্ত বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রথম পর্যায়: ভূপৃষ্ঠ দেখা যাচ্ছে, সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, পর্বতের পার্শ্বদেশ চোখে পড়ছে। ভূ-পৃষ্ঠটা যেন পর্বত হয়ে গেল এবং সমুদ্রটা……এর পরের বর্ণনা লুপ্ত।

দ্বিতীয় পর্যায়:—সমুদ্রকে তুলনা করা হচ্ছে একটা মালির (Gardens) পয়ঃনালীর সংগে।

তৃতীয় পর্যায়:—সমুদ্রটাকে মনে হচ্ছে একটা গরু মোষ প্রভৃতি বাথার উঠোন এবং একটা বাগান, তার পরেই পৃথিবীর জলরাশিকে মনে হচ্ছে যেন একটা কঞ্চি-নির্মিত ঝুড়ি।

চতুর্থ পর্যায়:—সমুদ্রটাকে আর চেনাই গেল না। সব কিছুই নীল।

নিউইয়র্কের এলান ল্যাণ্ডসবার্গ এই উপাখ্যানের বাস্তবতা যাচাই করবার জন্যে মহাকাশচারী স্কট কারপেনটারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। মহাকাশচারী স্কট কার্পেণ্টার বললেন:—হ্যাঁ, সত্যি। এর প্রত্যেকটা পর্যায়ের বর্ণনাই সত্যি। তিনি বললেন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের শীর্ষ দেশে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর যে দৃশ্য চোখে পড়ে মহাকাশযান থেকে দেখা দৃশ্যের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। একটা ব্যাপার বিশেষ ভাবে নজরে আনা উচিৎ—মহাকাশযান থেকে ইটানা বার বার সমুদ্রের কথাই বলেছেন। হ্যাঁ, তা'ত বলবেনই। কারণ, মহাকাশযানে চড়ে যতোই উপরে উঠা যায় সমুদ্রকে ততো বেশী চোখে পড়ে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনা সম্বন্ধে স্কট কারপেনটার বলছেন:—পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি শুধু আফ্রিকাকে, দেখেছি বনের সবুজকে, মরুভূমির ধূসর আভাকে। পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ইটানা মহাসমুদ্রকে একটা সংকীর্ণ স্রোতস্বতীই মনে করে থাকবেন এটেই স্বাভাবিক।

তৃতীয় পর্যায়ের বর্ণনা সম্বন্ধে কারপেনটার বললেন—এ পর্যায়ে স্ট্রাটোস্ফিয়ার থেকেই ইটানা দেখেছেন পৃথিবীকে। স্ট্রাটোস্ফিয়ার থেকে

মহাকাশচারীরা যে সব ছবি তুলেছেন তা দেখলেই বোঝা যাবে পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগের নানা অংশকে গরু মোষ রাখার উঠোন, বাগান অথবা কঞ্চি নির্মিত ঝুড়ি হিসাবে ভ্রম হতে পারে।

চতুর্থ পর্যায়ের বর্ণনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কার্পেণ্টার বলেছেন :—স্ট্রাটোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে যখন আরও উর্ধে উঠা যায় তখন পৃথিবীর সব কিছুকে নীল মনে হয়। কারণ, তখন শুধু পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলের জলীয় বাষ্পকেই দেখা যায়।

সুতরাং, ব্যবিলনের এই সুপ্রাচীন উপাখ্যান যে মহাকাশযাত্রার বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্মত একটা বর্ণনা দিয়েছে এ কথাটা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

জোসেফ ব্লামরিচ আমেরিকার মহাকাশ-গবেষণা কেন্দ্রের একজন দায়িত্বশীল অফিসার। ১৯৫৯ সাল থেকে তিনি এরোস্পেশ ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে কাজ করছেন। সম্প্রতি তিনি 'এঝ্‌কীয়েলের মহাকাশযান' নামে একটা বই লিখেছেন।

এঝ্‌কীয়েল যে দৃশ্যটা দেখেছিলেন সেটা এ রকম :—একটা বিরাটকায় মেঘ। সেটা থেকে কিন্তু আগুন ঠিকরে পড়ছে। তার মাঝখানে একটা উজ্জল পদার্থ। একটু পরেই তিনি শুনলেন জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। মেঘ থেকে নেমে এলো এমন একটা জিনিস যেটাকে দেখতে মনে হলো যেন চারটে জন্তু।

রহস্যটা কি?

সপ্তম শ্লোকের শরণাপন্ন হওয়া যাক্—তাদের ছিল সোজা শক্ত পা এবং বাছুরের মতো খুর—সেগুলো মসৃণ পিতলের মতো চিক্ চিক্ করছিল। অন্য জায়গায় এঝকীয়েল আবার বলেছেন—পাগুলো ছিল গোলাকার।

ব্লামরীচ বলছেন—এই যে বর্ণনা তার সঙ্গে এরোস্পেশ-গঠন রীতির চমৎকার মিল। যেহেতু এরোস্পেশ গঠন-রীতির সঙ্গে তিনি খুবই পরিচিত সেহেতু এ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ।

অর্থাৎ, এঝ্‌কীয়েল যে মহাকাশযানটা দেখেছিলেন সেটা ধীরে ধীরে যাতে পৃথিবীর বুকে নাবতে পারে সে ভাবে তৈরী করা হয়েছিল। মনুষ্য-বিহীন মহাকাশযান চন্দ্রবক্ষে নামাবার উদ্দেশ্যে নাসা অবতরণ গীয়ারের (landing gear) ছক তৈরী করবার জন্যে যে কয়জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছিলেন ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ব্লামরীচ ছিলেন সে দলের প্রধান,

অবশ্য সে রকম কোন যান আর তৈরী করা হয়ে উঠেনি। কিন্তু, প্রয়োজনীয় গঠন-রীতির গবেষণার ক্ষেত্রে সেটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তারা এমন একটা অবতরণ-গীয়ার তৈরী করেছিলেন যেটার ছিল সোজা শক্ত পা—এবং ফুট-প্যাড, যাকে ষাঁড়ের খুর হিসেবে ভ্রম হয়েছিল এঝকীয়েলের। যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখলেন মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা। সেটা খুব ভালোই কাজ করলো। বৈজ্ঞানীকেরা নিঃসন্দেহ হলেন কোন গ্রহ উপগ্রহের শক্ত মাটিতে পা রাখার জন্যে এ রকম একটা যন্ত্রই সবচেয়ে বেশী কার্যকর হবে। সুতরাং, এঝকীয়েলের বর্ণনা পড়ে ব্লামরীচ সাহেব এখন নিঃসন্দেহ যে তাঁর বর্ণনাটা পুরোপুরি বাস্তব।

আপনারা হয়তো এতক্ষণে মনে মনে আর একটা প্রশ্ন তুলেছেন :—কিন্তু, এঝ্‌কীয়েল যন্ত্রটাকে চারটে জন্তুর সঙ্গে তুলনা করলেন কেন?

ব্লামরীচ সাহেব আপনাদের এই জিজ্ঞাসাটাকে শান্ত করছেন এভাবে :—এঝকীয়েলের বর্ণনা পড়বার সময় আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, এঝ্‌কীয়েল বলেছেন চারটে প্রাণীর কথা যাদের প্রত্যেকটার চারটে পাখা ছিল। প্রথমে তিনি তাদেরকে বলছেন 'মানুষ'; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বললেন :—না, ঠিক মানুষ নয়, 'জীবন্ত প্রাণী', 'মানুষের মতো, কিন্তু মানুষ নয়।' তাহলে চারটে পাখা-ওয়ালা জন্তুগুলোর রহস্য কি? ওগুলো হলো হেলিকপ্টার। পাখাগুলো রোটোর ব্লেডগুলোকে ঘোরাচ্ছিল। এঝকীয়েলের হেলিকপ্টার এবং রকেট ইঞ্জিন সম্বন্ধে কোন সু-স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সুতরাং, সেগুলো দেখতে কি রকম ছিল এবং তাদের শব্দই বা কি রকম তা তিনি নিজের পরিচিত সংজ্ঞার মাধ্যমেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। এঝকীয়েল যে চারটে জন্তু বা হেলিকপ্টারের কথা বলছেন সেগুলো একটার সঙ্গে অন্যটা যুক্ত ছিল। অনেকেব কাছে হয়তো ব্যাপারটা অযৌক্তিক আজগুবি মনে হবে। প্রথম প্রথম আমারও মনে হয়েছিল তাই। কিন্তু, এখন একজন ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে আমি এঝকীয়েলকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছি। কিছুদিন আগে আমি একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ম্যাগাজিনে রোজার এ্যানডারসনের একটা লেখা পড়েছিলাম। সেখানে তিনি আলোচন করেছেন একটা হাই-ড্র্যাগ এ্যারোডাইন্যামিক বোডির (high drag aerodynamic body) কথা যেটা মহাকাশের শূন্যের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাবে, তারপর একটা সফ্‌ট ল্যাণ্ডিং-এর জন্যে মাটিতে ঝুপ্‌ করে ঝরে পড়বে। এ

ধরণের একটু যন্ত্র এখন আমাদের দরকার হচ্ছে না। এ যাবৎ আমরা একটা 'রী-এনট্রি' পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে আসছি। স্পেস-ক্যাপসুলটা একখণ্ড পাথরের মতো ঝড়ে পড়ে,—তার হীট শীল্ডগুলো (heat-shield) খুলে যায় এবং সমুদ্রের বুকে ধীরে ধীরে নেবে পড়তে প্যারাসুটগুলোকে সাহায্য করে। কিন্তু, এমন একদিন আসবে যখন আমাদের শাটল শীপের সাহায্য নিতে হবে। ওটে কক্ষপথে পরিক্রমারত, কোন মহাকাশযান থেকে নেমে আসবে, আবার সেখানেই ফিরে যাবে।

ব্লামরীচ যাহেব এই যে শাটল-শীপটার কথা বলেছেন সেটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে এঝকীয়েলের বর্ণনা-সম্মত পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত চারটে হেলিকপ্টারের। তবে এ রকম একটা শাটল-শীপ তৈরী করতে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। আমেরিকার আকাশ এবং মহাকাশ গবেষণা ইনষ্টিউটের একটা জার্ণালে রোজার এন্‌ডারসন বলেছিলেন :—পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত চারটে হেলিকপ্টারের সমাবেশ একটা খুবই প্রয়োজনীয় এ্যারোডাইনামিক বোডির কাজ করতে পারে। এ রকম একটা সমাবেশ শুধু যে মহাকাশযাত্রার ক্ষেত্রেই খুবই প্রযোজ্য হবে তা নয়, অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও তার উপযোগীতা সন্দেহাতীত হবে। এনডারসন এ রকম একটা পরিকল্পনা দেওয়ার পর 'ল্যাঙ্গলী ফিল্ডে'র নাসার গবেষণা সংস্থা একটা মডেল তৈরী করেছিলেন। সেটাকে তারা পরীক্ষা করেও দেখেছিলেন। সেটার কর্ম ক্ষমতা ছিল খুবই সন্তোষজনক। (৯৯)

মডেলটা চৌকো দেখতে। মাঝখানটা অ্যাপোলো'র লুনার--মডিউলটার মতো। লুনার-মডিউলটার মতো দেখতে মধ্যিখানের শরীরটার সঙ্গে এদিকে ওদিকে হেলিকপ্টারগুলো বাঁধা। ব্লামরীচের মতে এ রকম একটা জিনিসকেই এঝ্‌কীয়েল প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন।

এঝ্‌কীয়েলের বর্ণনা কিন্তু এখানেই শেষ নয়, রহস্যের ইতি এখানেই নয়। পনের নম্বর শ্লোকে আছে :—'আমি সেই জন্তুগুলোর দিকে তাকালাম, প্রত্যেকটার পাশে মাটির ওপর এক একটা চাকা। চাকাগুলো পোখরাজ পাথরের মতো জ্বল জ্বল করছিল। সেগুলোর প্রত্যেকটাই ছিল দেখতে এক রকম ; সামনের দিকে চারটে পথ ধরে এগুচ্ছিল—তারা ছিল নিজস্ব গতিপথে অবিচল। একটা চাকার মধ্যে আর একটা চাকা রাখলে যে রকমটি দেখায় চাকাগুলোও দেখতে ছিল সে রকম।'

এই পনের নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ব্লামরীচ এভাবে। চাকাটা হলো হাব্ এবং স্পোক। স্পষ্টতঃ চাকাটা সামনের দিকে এবং পেছনের দিকে চলতে পারে। এখন আমরা যদি নলাকৃতি কোন কিছু তার কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে চালাতে থাকি তাহলে চাকাটা তার ভেতরে ঢুকে যাবে একবার আবার বেরিয়েও আসবে পরের বার। এভাবে চালাতে থাকলে ঘূর্ণিপ্রক্রিয়া চাকাটাকে যে কোন দিকে ঘুরতে সাহায্য করবে। এ বিষয়ে ব্লামরীচ সাহেব একটা ছাঁচ তৈরী করেছেন এবং সেটা দাখিল করেছেন USPO'তে (United States Patent Office)। তারা ছাঁচটা বিশেষভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন।

চাকার রহস্য এখানেই শেষ নয়। পনের নম্বর শ্লোকে আরও আছে: আমি চাকাগুল্যের দিকে তাকালাম, দেখো! তাদের সব কটির চারদিকে অগুন্তি চোখ টিপ্ টিপ্ করছে।

চাকাগুলোর চারদিকে অসংখ্য চোখ! বুদ্ধিমান মানুষদের মাথা ঠিক থাকবার কথা নয়। এ ধরণের আজগুবি কথা শুনে ভাববেন—এসব পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সবই যে অর্থহীন নয় তার সপক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছেন মহাকাশ বিজ্ঞানী ব্লামরীচ সাহেব।

এঝ্কীয়েল বারবার বলেছেন চাকাগুলোর বহির্ভাগ অসংখ্য চোখে আবৃত। নলাকৃতি চাকাগুলোর বহির্ভাগ যদি মসৃণ হতো তাহলে সেগুলো গড়িয়ে যেতো। সে ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের ওপর মহাকাশযানটার গতি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতো না। সুতরাং সহজ উপায় হলো চাকাগুলোর বহির্ভাগের চারিদিকে চোখাকৃতি ছোট ছোট গর্ত তৈরী করে দেওয়া। শীপ-ফুট রোলার যারা দেখেছেন তারা অবশ্যই এই যুক্তিটা মেনে নেবেন। এ জাতীয় রোলারের সাহায্যে পাকা রাস্তা তৈরী করা হয়। এঝ্কীয়েল যে মহাকাশ যানটা দেখেছিলেন তাঁদের চাকাগুলোতে ছারপোকার চোখের মতো গর্ত না থাকলে সেগুলো মাটির সঙ্গে আটকে থাকতো না, পিছলে যেতো।

শ্লোক ১৯-২০ :—যখন জীবন্ত জন্তুগুলো চলতে শুরু করলো তখন চাকা গুলোও তাদের পাশে পাশে চললো; যখন তারা ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশে উঠলো, তখন চাকাগুলোও ঠিক সেই দিকে গেল মাটি ছেড়ে; জন্তুগুলো যেদিকেই গেল চাকাগুলোও ঠিক সেই দিকে গেল, কারণ ঐ জন্তুগুলোর সব শক্তি নিহিত ছিল ঐ চাকাগুলোতেই।'

এই বর্ণনাটা থেকেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে এঝ্‌কীয়েলের বর্ণনা কোন যন্ত্রযানের বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যন্ত্রযান্ আর তার চাকা অবিচ্ছেদ্য। দুটোই এক এবং অভিন্ন। যন্ত্রযান যেখানে যাবে যে দিকে যাবে চাকাগুলোও ঠিক সেদিকে যাবে—এটেই নিয়ম।

এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ফ্রান্সিস কোটেন (Frencis ccuten) বলেছেন:—একটা উড়ন্ত জানের অতি বাস্তব-নিষ্ঠ বর্ণনা। উড়ন্ত যানকে যারা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং ফটো নিয়েছেন তারা এই বর্ণনাটাকে নিশ্চয় স্বাগত জানাবেন। আরও একটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়:—এঝ্‌কীয়েল কখনো পাখা এবং চাকাগুলোকে এক করে দেখেননি। এর থেকেই বোঝা যায় চাকা আর পাখা দুটোই ভিন্ন জিনিস।' (১০০)

শ্লোক ১০ :—প্রত্যেক জন্তুর মুখের ডান দিকটা ছিল মানুষের মতো দেখতে, সে মুখের বাঁ দিকটা দেখতে ছিল ষাড় অথবা ঈগল পাখীর মতো।

আমেরিকার জেমিনী মহাকাশযানকে নানা মৌলিক বিন্দু থেকে বিভিন্ন রকম জন্তুর মুখাবয়ব বলে ভ্রম হতো—একথাটা স্বীকার করেছেন নাসার মহাকাশ বিজ্ঞানী ব্লামরীচ। যে লুনার মডিউলটা সর্ব প্রথম চাঁদে নেবেছিল সেটাকেও দেখতে ছিল বিরাট একটা ছাড়পোকার মতো

শ্লোক ১২ :—সে সব জন্তুর মাথার উপরে ছিল শ্বেত চক্‌চকে তুষার খণ্ড দিয়ে তৈরী ছাউনি।

কি বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা তার আরও একটা প্রমাণ। হেলিকপ্টার যারা দেখেছেন তারা চালকের মাথার উপরে এই সুদৃশ্য শ্বেত ছাউনিটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন!

শ্লোক ২৪ :—তাদের পাখার গর্জনও আমি শুনেছি। যখন পাখাগুলো ঘুরতে লাগলো মনে হলো আমি যেন প্রবল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ শুনছি অথবা মেঘের গর্জন শুনছি অথবা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত কোন সেনাদলের আগমণ বার্তা। জন্তুগুলো যখন গতিরুদ্ধ করলো অর্থাৎ থেমে গেল তখন তাদের পাখাগুলোও পড়ে গেল।'

একটা হেলিকপ্টারের সঠিক বর্ণনা তাতে সন্দেহ করবার কোন অবকাশ নেই। হেলিকপ্টারগুলো যখন উড়বার জন্যে দম নেওয়া শুরু করে তখন তার রোটরগুলো প্রবল গর্জন শুরু করে দেয় এবং ইঞ্জিনটা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন রোটরগুলোও পড়ে যায়।

উপরে যে আমেরিকার মহাকাশ বিজ্ঞানীর কথা বললাম তিনি এঝকীয়েলের (Ezekiel) মহাকাশযান দর্শনের কথা শুনে ব্যাপারটাকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু, আমেরিকা মহাকাশ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি যখন যথেষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারলেন তখন এঝকীয়েল রহস্য তার কাছে বিরাট হয়ে দেখা দিল। এবারে তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে 'এঝকীয়েলের মহাকাশযান' লিখতে বসলেন। এঝ্‌কীয়েলের অভিজ্ঞতা যে অতি বাস্তব বিজ্ঞান-সম্মত, অতিরঞ্জিত কিছু নয় তার প্রমাণ করে তবেই যেন তিনি স্বস্তি পেলেন এবং বললেন :—'আমার মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে অন্য গ্রহের মানুষ যাতায়াত করতো এ পৃথিবীতে এ ধারণাটা এখন আর কিছুতেই অসমর্থনীয় হতে পারে না।'

বৈজ্ঞানিক জীসীগের কাছে নাসা (NASA) যে চিঠিটা পাঠিয়েছিল সেটাকে যদি আমরা খুঁটিয়ে দেখি তাহলেই বুঝতে পারবো অতীতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহাকাশযাত্রার কাহিনী সব অলিক কল্পনা মাত্র নয়। 'আমাদের বিশেষজ্ঞরা পাণ্ডুলিপিতে যে ইউনিফর্ম চিত্র এঁকেছেন তা দেখে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। এসব ইউনিফর্ম সম্বন্ধে যে সূত্র আপনি দিয়েছেন তাও তাদেরকে চমৎকৃত করেছে।

লস এঞ্জেলস্'এর 'লিটন ইণ্ডাষ্ট্রি'র সহায়তায় তার একটা অনুলিপি তৈরী করা হয়েছে এবং সেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নাসা'র মহাকাশ-গবেষণা কেন্দ্রের হেড কোয়ার্টারে। সে সম্বন্ধে গবেষণাও প্রায় শেষ হয় হয়। আমরাও যোগাযোগ রক্ষাকারী সব যন্ত্রপাতি এবং চক্ষু-কোটরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি।'

বৈজ্ঞানিক জীসীগ আমেরিকার মহাকাশ-গবেষণাকেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন কতকগুলো চমকপ্রদ জাপানী স্টাচিউয়েটের চিত্র। তিনি এবং তার সতীর্থরা ঐ চিত্রগুলোর—চোখ মুখ হীন মাথা, শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো অতিশয় বিসদৃশভাবে বাঁকানো মোচড়ানো, সেগুলোর ওপর খুব ভাল করে চোখ বুলিয়েছিলেন। এবং সে গবেষণা থেকে মহাকাশ-গবেষণা সম্বন্ধে একটা সূত্র বের করেছিলেন।

এই ডোগু চিত্রগুলো প্রথমে মাটির পাত্রে আঁকা ছিল। তারপর সেগুলোকে রূপ দেওয়া হলো পাথরের বুকে খোদাই করে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে

ডঃ শোগোরো এই চিত্রগুলোর কপালে দুটো ডিম্বাকৃতি গোলাকার বস্তু দেখে বলেছিলেন তুষার ঝড় থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে স্কীমোরা, যে চশমা পরে এগুলোও সে বস্তু। কিন্তু, তার সতীর্থরা মেনে নিতে পারলেন না তার এই ব্যাখ্যা। তারা বললেন :—না, ওগুলো প্রাচীন যুগের বর্ম। প্রাচীন যুগের বর্মই হবে হয়তো, কিন্তু ওগুলোর অনুকরণেই হালে আমেরিকা তৈরী করেছে অত্যাধুনিক স্পেশ্‌-স্যুট্‌।

ক্যাসানোভ্‌ তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন :—ম্যাট্‌স্মুরা এবং জীসীগ এ ব্যাপারে খুবই নিশ্চিত যে জোমন পোষাক গ্রহান্তরের মানুষেরা যে পোষাক পরে আসতো সে সব পোষাকেরই হুবহু নকল। মহাকাশচারীরা মহাকাশ-যাত্রার সময় সে সব পোষাক পরতো। তারা এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে জাপানের বিদ্যা-দেবীর কথা বলতে চান। জাপানীদের উপাখ্যানানুসারে এই বিদ্যাদেবী পৃথিবীতে এসেছিলেন পৃথিবীর মানুষকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্যে। ঐ বিদ্যাদেবীও যে জোমন-স্যুট পরেছেন সেটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়।

নাসা'র পরীক্ষা থেকে এ সিদ্ধান্তই নেওয়া যায় ডোগুর স্রষ্টারা গ্রহান্তরের মানুষগুলোর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে এ পৃথিবীর মানুষের সুদৃঢ় আত্মিয়তাবোধ জেগেছিল। তাই ও সব অপার্থিব প্রাণীরা গ্রহান্তরে চলে যেতেই পৃথিবীর মানুষের বুকে শেলের মতো বিঁধে বসলো, এবং বিরহ-কাতর শাহজাহান যেমন নিজের প্রেমকে এবং সে প্রেমের আধার স্ত্রী'র স্মৃতিকে অমর অক্ষয় করে রাখবার জন্যে দুনিয়ার বিস্ময় তাজমহল তৈরী করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে গ্রহান্তরের প্রিয় সুহৃদদের স্মৃতিকে কালের কপালে অক্ষয় করে রাখবার জন্যেই জাপানের শিল্পিরা ঐ সব মূর্তি এবং চিত্র রেখে গেছেন। এসব ডোগু মূর্তি পাওয়া গেছে ক্যামেগাওকা, এওমোরী, মিয়াগী এবং আরও অন্যান্য জায়গায় যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে পুরোনো ধ্বংসাবশেষ। শিরস্ত্রাণ এবং পোষাকের সব কিছু খুঁটিনাটি তথ্য শিল্পিরা এঁকেছেন অপরিসীম দরদ দিয়ে, মমতা দিয়ে।

আমেরিকার জে, এহারনানডেস বলেন :—যাদের অনুকরণ করে জোমন স্টাচিউয়েটগুলোর সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীতে অবতরণকারী গ্রহান্তরের মানুষদের মধ্যে তারাই প্রথম নয়। তাদের আগে এবং পরেও অনেকে এই সূর্যোদয়ের দেশে পা রেখেছিলেন অন্য গ্রহ থেকে এসে। তারা যে এসেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাগরে। বছরের বিশেষ বিশেষ কতকগুলো দিনে তাদের

স্মৃতি বহনকারী অনেকগুলো স্মারক দ্রব্য কয়েক ঘণ্টা ধরে দেখা যায় সাগরের জলে। নিজেদেরকে মানুষের চোখের ওপর সম্পূর্ণ ভাবে তুলে ধরে ওরা তলিয়ে যায় অতলে।

জাপানের এই মারকাহুয়াসি জায়গাটা খুবই রহস্যময়।' পিকিং এর সী পেন লাউ (পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) হুলান পর্বতে এবং টাঙ্গটিন্ হ্রদের একটি দ্বীপে কতকগুলো খোদাই চিত্র আবিষ্কার করেছেন। ঐ চিত্রে আঁকা রয়েছে বড়ো বড়ো হস্তি-শুণ্ড-ওয়ালা কতকলো লোকের ছবি। (আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশের মতো?) এবং নলাকার বস্তুর মতো দেখতে কতকগুলো বিমান। গ্রেনাইট পাথরে আঁকা এই ছবিগুলো মিস্টার লাউ'য়ের মতে ৪৫০০০ বছরের পুরোনো। অতো প্রাচীন কালেও কি তাহলে মুখোসপরা অন্য গ্রহের মানুষ মহাকাশযানে করে পৃথিবীতে আসতো? নীচের চিত্রটা দেখুন। ওটা প্রত্নতত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করেছেন ওয়েস্টইণ্ডিজে। তবে ওটা যে কি ধরণের প্রাণী তা বৈজ্ঞানিকেরা এখনো সঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। এই চিত্রটা সযত্নে রক্ষিত আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।



তিব্বতের রাজবংশের যে বংশ-পঞ্জি পাওয়া গেছে সেটা সপ্তদশ শতাব্দীর লেখা। এই ঐতিহাসিক দলিলটাকে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই।

সেখানে লেখা আছে দু'হাজার বছর আগে যে সব রাজারা রাজত্ব করতেন তাদের কথা। এই দলিল অনুসারে তিব্বতের প্রথম সাতজন রাজা নেমে এসেছিলেন অন্য গ্রহ থেকে। তারা আকাশে উড়তে পারতেন এবং যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে ফিরে যেতে পারতেন।

ডেড্ সী স্ক্রল খৃঃ পূর্ব শতাব্দীগুলোর একটা অতি নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য দলিল। ওটা যেমন বাইবেলের অনেক ঘটনাকে সত্য প্রতিপন্ন করে দিয়েছে তেমনি খৃঃ পূর্ব শতাব্দীগুলোর অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও উদ্ঘাটিত



করে দিয়েছে। ওটা একটা পাণ্ডুলিপি, তামার পাতে লেখা। হাজার হাজার বছর ধরে পড়েছিল একটা গুহার মধ্যে। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক

সাংবাদিক আগরেস্ট এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি থেকে এমন তথ্যও উদ্‌ঘাটিত করেছেন যে হাজার হাজার বছর আগে মহাকাশের মানুষ আসতো পৃথিবীতে :—'মহাকাশ থেকে মানুষ আসতো এবং পৃথিবী থেকেও মানুষকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হতো। যারা আসতো মহাকাশ থেকে তারা পৃথিবীতে বেশ কিছুদিন ধরে থাকতো।' (১০৩)

৩১৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় চিত্রটা লক্ষ্য করুন। প্রত্নতাত্ত্বিকরা একে একটা নরকঙ্কালের চিত্র হিসেবে জাহির করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, আপনাদের কী মনে হয়? ওটার মাথায় কানে নাকে পেছনে কতকগুলো যন্ত্রাংশ অতি সুস্পষ্ট। ওটাকে কি একটা মহাকাশচারীই মনে হচ্ছে না? চিত্রটা আবিষ্কৃত হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডে। অক্‌ল্যাণ্ড মিউজিয়ামে ওটাকে দেখতে পাওয়া যায় —আপনারা যদি এই চিত্রটার অন্য কোন যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন'ত আমি খুশী হবো।

পুমা-পুঞ্চুর পিরামিডের একটি তোরণমার্গ বা প্রবেশদ্বার ২৪" ইঞ্চি উঁচু এবং ১৫" ইঞ্চি প্রশস্ত। ঐ প্রবেশদ্বারটা মানুষের পক্ষে অপ্রশস্তই বটে। কিন্তু পুমার পক্ষে তা ছিল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বড়। ঐ মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে পূজিত হতেন নগর-দেবতা—পশুর মতো অনেকটা তার রূপ। কেন? সেই অতীত দিনের কথা স্মরণ করবার জন্যেই যখন অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক বিড়ালের শরীর নিয়ে গ্রহান্তরের প্রাণীরা সব আসতেন পৃথিবীতে? সূর্য্যতোরণে পূজিত হতেন—সিংহাকৃতি একজন দেবতা। তার হাতে বজ্র বিদ্যুতের প্রতীক। এই সূর্য্য তোরণ নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ খোদাই করা মনোলিথ বা একটিমাত্র বৃহৎ প্রস্তরের স্তম্ভ। এই পাথরটা ১০' ফুট উঁচু ৬' ফুট চওড়া। পস্‌নানস্কির মতে ঐ সূর্য্যতোরণটার বয়েস ১৮০০০ বছর। সেটার ব্যবহার হতো মহাকাশযান সম্বন্ধে গবেষণার কাজে। অন্যান্যদের মতে ঐটি নির্মিত হয়েছে একটা মহাকাশযানের অনুকরণে, ক্যাসানজেভ এদের মতে বিশ্বাসী নন। কিন্তু পসনানস্কির মতো ক্যাসানজেভ-এরও বিশ্বাস পুমা-পুঞ্চুতে শুকতারার বছর পঞ্জিকার ব্যবহার হতো। সোভিয়েত জ্যোতির্বিদ সহ অন্যান্য জ্যোতির্বিদরাও এ বিষয়ে একমত। কলম্বিয়ার প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোকেরা এমন একটা পঞ্জিকা ব্যবহার করতো—যেটা তৈরী হয়েছিল পৃথিবী এবং শুকতারা সূর্য্যের চারদিকে ঘুরবার জন্যে যে

সময় নিয়ে থাকে সেই সময় অনুসারে। শুকতারার সময় এবং পৃথিবীর সময়ের এই অনুপাত ১৩ : ৮।

তারা যে শুকতারার পঞ্জিকা ব্যবহার করতো এইটা একটা গুরুতর ব্যাপার। শুকতারা খুবই উজ্জ্বল। আদিম মানবদের যে অতি সহজেই অভিভূত করতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা কি শুধু ঐ বাহ্যিক রূপটা দেখেই সন্তুষ্ট ছিল? শুকতারা সূর্য্যের চারধারে ঘুরপাক খেতো, এই ঘুরপাক খেতে কতো দিন সময় লাগতো এইটুকু জানবার জন্যে জ্যোতির্বিদ্যায় যে তাদেরকে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকের সন্দেহ শুকতারা থেকে লোক এসেছিল পৃথিবীতে, তারাই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ঐ পঞ্জিকা। পৃথিবীর মানুষ শুকতারার পঞ্জিকার ব্যবহার শিখে নিয়েছিল শুকতারার লোকদের কাছ থেকেই। একটা আজগুবি ধারণা। কিন্তু ক্যাসানজেভ এবং কয়েকজন ফরাসী বিজ্ঞানীরা এই ধারণাটাকে আজগুবি বলে হেসে উড়িয়ে দেবার আগেই সূর্য্যতোরণের গায়ে আঁকা বিভিন্ন চিত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। ঐ চিত্রগুলোর সঙ্গে তো মহাকাশযান এবং রকেট ইঞ্জিনের হুবহু মিল। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণু-শক্তিচালিত বা আইয়ন-প্রোপালসন জাতীয় ইঞ্জিন নিয়ে যে গবেষণা চলছে অনেকটা সেইরকম দেখতে।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণে লেখা আছে—মহাকাশের সেই নক্ষত্রলোক থেকে মহাকাশযানটা যখন নেমে আসছিল তখন বজ্রবিদ্যুতে মুখরিত হয়েছিল আকাশ, আকাশে ফুটে উঠেছিল শত সূর্য্যের দীপ্তি, একখানা অগ্নি গোলক নেমে এসেছিল যেন পৃথিবীর বুকে। সেই মহাকাশযানে চড়ে চোখ জুড়ানো উজ্জ্বল তারাটি থেকে নেমে আসছিলেন অগ্নিপুত্ররা এবং অগ্নিকান্তি দেবতারা। তারা নেমেছিলেন গোবি সমুদ্রের শ্বেতদ্বীপে, যেখানে বিরাজ করছিল পৃথিবীর স্বর্গ।

ঐ রথে করে যিনি পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিলেন তার নাম সনৎকুমার। সনৎকুমারের সঙ্গে এসেছিলেন তার সঙ্গীরা। হাজার হাজার বছর আগে তিনি শুকতারা থেকে পদার্পণ করেছিলেন পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর মানুষকে তারা জ্ঞান দিলেন, বুদ্ধি দিলেন, সভ্য করে তুললেন। এটা কি নিছকই একটা কাল্পনিক ঘটনা?

হিন্দু পুরাণের উপর আলোচনা করতে গিয়ে উইলকিন্ লিখেছিলেন

সেই শ্বেত তারাটা থেকে মানুষ এসেছিল পৃথিবীতে, তারা গোবি সমুদ্রের দ্বীপটাতে বসবাস করছিল। খৃঃ পূঃ ১৮,৬১৭,৮৫১ শতাব্দীর ঘটনা। তারা সেখানে একটা দুর্গ গড়েছিল, সমুদ্রের তলা দিয়ে গড়েছিল সুড়ঙ্গপথ, ঐ সুড়ঙ্গপথ দিয়েই তারা উঠে আসতো মূল স্থলভাগে। ১৮ লক্ষ বছর আগেকার ঘটনা। নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই বৈজ্ঞানিকদের চক্ষু কপালে উঠবার কথা। বৈজ্ঞানিকেরা উইলকিন্‌সের সময় সীমাকে বিশ্বাস না করলেও কিন্তু অন্য তারা বা নক্ষত্র থেকে লোক আসার ঘটনাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারছেন না, অন্ততঃ প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারছেন না,—হাসতে গিয়ে হাসি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, উপরোক্ত ঘটনাকে বিশ্বাস করবার মতো প্রমাণ তারা পেয়েছেন। সে প্রমাণগুলোকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলে যে বৈজ্ঞানিকদের বৈজ্ঞানিকত্ব থাকছে না।

কয়েক বছর আগে হিমালয়ের পাদদেশে বোহিস্থানের একটা গুহায় একটা মানচিত্র পাওয়া গিয়েছিল—স্বর্গরাজ্যের মানচিত্র। জ্যোতির্বিদরা গভীর আগ্রহ সহকারে মানচিত্রটা পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, হঁ্যা ঠিক, মহাকাশের মানচিত্রই বটে। তবে আমাদের মানচিত্রের থেকে একটা দিক দিয়ে তার গড় মিল। মহাকাশের যে রাশি-চিত্রগুলো আঁকা সেগুলো তেরো হাজার বছরের পুরোনো। অর্থাৎ তেরো হাজার বছর আগে তাদের যে অবস্থানে থাকার কথা ছিল সে অবস্থানেই আঁকা আছে সেগুলো। সুতরাং, মানচিত্রটা আজকের আঁকা নয়, তেরো হাজার বছর আগে আঁকা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। মানচিত্রে আরও একটা রহস্য আছে। সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় ভৌগলিক ম্যাগাজিনে ঐ মানচিত্রটা ছাপা হয়েছিল। একটা জিনিষ সবার নজরে পড়েছিল। শুকতারা এবং পৃথিবীর মধ্যে কতকগুলো লেখা আঁকা ছিল। ঐ সংযোগকারী রেখাগুলো কি এটাই বুঝিয়ে দিতে চায় যে পৃথিবীর সঙ্গে শুকতারার সংযোগ ছিল—এবং ঐগুলোর সাহায্যে নির্দ্দেশ করা হয়েছে পৃথিবী থেকে শুকতারা এবং শুকতারা থেকে পৃথিবী যাতায়াতের পথ। শুকতারা যে হিন্দুদের অতি প্রিয় তারা একথাটা সবাই জানেন। হিন্দু পুরাণ মতে শুকতারায় রাজত্ব করতেন বিষ্ণু ভক্তপরায়ণ রাজা ভক্ত প্রহ্লাদ। (৩৯)

চলুন আমরা আরও কিছু আগে ফিরে যাই। ১৭৭৮ সালের ঘটনা।

খ্রীষ্টান মিশনারীরা ভারতবর্ষের কতকগুলো মানচিত্র নিয়ে গিয়েছিলেন প্যারিসে। ওগুলো স্বর্গের মানচিত্র। প্যারিস নগরীর মেয়র এবং ফরাসী দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থার প্রধান "জিন্‌সিলভেইন্ বেইলী" সেই মানচিত্র-গুলোকে নিয়ে বিপদে পড়লেন। মানচিত্রগুলো বেশ কয়েক হাজার বছর পুরোনো। সেখানে এমন কতকগুলো তারা আঁকা রয়েছে যেগুলো ভারতবর্ষ থেকে চোখে পড়বার কথা নয়। তাই মিষ্টার বেইলীর সিদ্ধান্ত নিলেন ঐ মানচিত্রগুলো গোবী মরুভূমির কোন জায়গা থেকেই জন্ম নিয়েছে। (৪০)

এসব নানা কারণে বিভিন্ন পুরাণ উপাখ্যানে অন্য গ্রহ থেকে—মহাকাশের অন্য লোক থেকে পৃথিবীতে দেবতাদের আগমন নির্গমণ সম্বন্ধে যে সব কাহিনী স্থান পেয়েছে সেগুলোকে আর অবহেলা করতে পারছেন না বৈজ্ঞানিকেরা। সোভিয়েত দেশ সহ বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত নামজাদা বৈজ্ঞানিকেরা তাই স্বীকার করছেন—হ্যাঁ তারা এসে থাকবে, তারা আসতো।

মহাকাশ থেকে মানুষ যে আগে আসতেন সে সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ সংগ্রহ করে গবেষণা চালাচ্ছেন টিউবিন গ্রুপ অব ক্লাইপিউস। গিয়ানি সেট্টিমো হলেন এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা।

সম্রাট পার্টিনেস যে মুদ্রাগুলো রেখে গেছেন তাতে আঁকা রয়েছে নক্ষত্র। তার চেয়েও বড় কথা—আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহের মতো কতকগুলো জিনিস। ক্লাইপিউস গ্রুপ মুদ্রাগুলো বিশেষভাবে পরীক্ষা করে বললেন :—না, সূর্য চন্দ্র কিংবা সৌর জগতের অন্য কিছুর প্রতিনিধিত্ব করছে না ওরা। মুদ্রাটার নাম 'প্রোভিডেন্‌সিয়া ডিওরাম' অর্থাৎ স্বর্গের দেবতার স্তুতি। কোন দেবতার উদ্দেশ্যেই কি উৎসর্গিত ঐ মুদ্রা? সে দেবতা কি মহাকাশযানে করে এসেছিলেন? এ জাতীয় মুদ্রা সংরক্ষিত আছে কিউ নিউ প্রদেশের পিয়েড্-মোন্‌স নগরীর আলবা মিউজিয়ামে। (৩৬)

১৯০৮ সালে সোভিয়েত সাইবেরিয়ায় যে প্রচণ্ড একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল এবং সে সময় যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল সে দৃশ্যটাকে স্থানীয় এক শিল্পি তুলির টানে অমর করে রেখে গেছেন। সূর্যের মতো একটা জ্বলন্ত জিনিস নেমে আসছিল আকাশ থেকে। তার পিছু ছুটছিল মেঘের মতো এররাশ কালো ধোঁয়া। শিল্পির ঐ সৃষ্টিটাকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এখনো একটা প্রকাণ্ড উল্কাপাতের স্মারক চিহ্ন হিসেবে সযত্নে রক্ষা করে আসছেন।

শিল্পীদের ধর্ম হলো এটাই। তারা যা কিছু দেখবে, যা কিছু তাদের মনে দাগ কাটবে সেই সব কিছুকে তারা অমর করে রেখে যেতে চান পটে আঁকা ছবিতে কিংবা খোদাই করা ভাস্কর্য চিত্রে। তাই ওসব মুদ্রা, মূর্তি সব কিছু এক একটা বিশেষ মুহূর্ত, এক একটা সত্য ঘটনার স্মারকচিহ্ন হিসেবে মর্যাদা পাবার যোগ্য।

১৯৩ শতাব্দীর একটা রোমান্ মুদ্রা পাওয়া গেছে। সেটাতে আঁকা রয়েছে রহস্যজনক একটা প্রতীক চিহ্ন। মুদ্রাটা পাবলিও এল্‌ভিও পার্টিনেসের আমলের। এই টাকাটা আবিষ্কৃত হয়েছে সিরিয়াতে। এই মুদ্রাটা কোন ঘটনার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করছে সৌভাগ্যক্রমে তার লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে। কোমোডো'র (Commodo) রাজত্বকালে বিশেষ ধরণের একটা উজ্জ্বল পদার্থ আকাশ চিড়ে, নীলাকাশকে আলোকিত করে সব্বাইকে তাক লাগিয়ে উড়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক ল্যামাপ্রিডিও এ সম্বন্ধে লিখে গেছেন তার লেখা বই কমোডো'র জীবনীতে। হেরোডিয়ান তার 'মার্কুস আরলিউস-এর পরবর্তী সাম্রাজ্য' নামক বইতে এই ঘটনার সমর্থন জানিয়েছেন পরোক্ষভাবে:—'সে যুগে নানা রকম তাজ্জব ঘটনা সব ঘটতো। মধ্যাকাশে তারারা সব দেখা দিত রাত্রে, এমন কি দুপুরেও।' (৩৭)

গ্রীক্ ঐতিহাসিক হেরোডিয়ান কমোডো'র রাজত্বকালে বেঁচেছিলেন এবং স্বচক্ষে তিনি যা দেখেছেন তাই লিখে গেছেন কমোডো'র জীবনীতে। কমোডো আকাশে নিশ্চয় অনেকগুলো জ্বলন্ত পদার্থ দেখেছিলেন এবং সেই দেখা দৃশ্যগুলোকেই অঙ্কিত করেছিলেন মুদ্রাগুলোতে। বিভিন্ন রকম অদ্ভুত অদ্ভুত সব তারার চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে কি তাই অনেকগুলো মুদ্রায় যেগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে সিরিয়াতে? ১৯৩ শতাব্দীর যে রোমান মুদ্রাগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোর বাঁ দিকে আঁকা রয়েছে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ।

ডক্টর রেমো ক্যাপেলী একজন বিশিষ্ট মুদ্রা বিশেষজ্ঞ। মুদ্রা বিষয়ক নানা গ্রন্থ প্রনয়ণ করেছেন তিনি। তার কাছে কতকগুলো সুপ্রাচীন দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা গচ্ছিত আছে। তিনি ওগুলো পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন যে ঐ মুদ্রাগুলোতে যে সব ছবি আঁকা আছে সেগুলো অপার্থিব মহাকাশযানের। এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে সবাইকে চমকে দেন তিনি ১৯৬০ সালে।

১৯৬৫ সালে একজন চীনা প্রত্নতত্ত্ববিদের একটা ঘোষণা শুনে সারা

পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। তিনি এমন একটা সূত্র তৈরী করেছিলেন যে ১২০০০ বছর আগেও মহাকাশযান অন্য গ্রহ থেকে এ পৃথিবীতে আসতো। চীন তিব্বতের সীমানায় বায়ান কারা উলা পর্বতমালায় খনন করে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা সাত খানা পাথরের চাকতি এবং অন্যান্য নানা রকম অপাঠ্য হায়ারোগ্লাইফিকস'এর খোঁজ পেয়েছিলেন। সেগুলো হাজার হাজার বছরের পুরোনো। চাকতিগুলোর ওপরে নানা রকম জিনিষ আঁকা। গ্রামোফোন রেকর্ডের মাঝখানে যে রকম একটা ফুটো থাকে সে রকম সে চাকতির মাঝেখানেও একটা ফুটো আছে। ঐ ছিদ্রের মাঝখান থেকে পরিধি পর্যন্ত চারদিকে শঙ্খিলরেখা ছড়িয়ে পড়েছে। ওগুলো সাউণ্ড ট্র্যাক্টস্ নয়—এক রকম লেখা যা পৃথিবীর কাছে এখনো সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা কতো মাথা ঘামালেন। কিছুই পাঠোদ্ধার করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত পরিত্রাতা হিসেবে এসে দেখা দিলেন একজন চীনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্। পাঠোদ্ধার করে যে ঘোষণা করলেন তাতে চীনা শাসক বর্গেরও পিলে চমকে উঠলো। তারা ঐ ব্যাপারটাকে চেপে রাখবার চেষ্টা করলেন। বহির্বিশ্বের পীড়াপিড়িতে শেষ পর্যন্ত রহস্যটা ফাঁস করলেন:—ঐ লেখাতে আছেঃ—১২০০০ বছর আগেও মহাকাশযান পৃথিবীতে আসতো। ব্যায়্যান-কারা-উলা গুহাগুলোতে যারা বাস করে তারা হ্যাম্ এবং ড্রোপা আদিবাসী—তারা জীর্ণ শীর্ণ—গড় উচ্চতা ১ মিটার ২৭ সেণ্টিমিটার মাত্র। এই ড্রোপারাই কিন্তু, আমরা চাকতি'র লেখা থেকে জানতে পারি, আকাশ থেকে যন্ত্রযানের সাহায্যে নেমে এসেছিল যখন পাশ্চাত্যরা গুহার মধ্যে বাস করবার সৌভাগ্যটুকুও অর্জন করেনি।

অন্য একটা হ্যাম লেখার পাঠোদ্ধার থেকে জানা গেলো—একটা মহাকাশযান উঁচু পর্বতের ওপর নাবতে গিয়ে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুকরো হয়ে গিয়েছিল—শতো চেষ্টা করেও তারা আর অমন একটা গড়তে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত ডিস্কগুলোকে মস্কোয় পাঠানো হলো। ওখানে আরো ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চললো। দেখা গেলো সেগুলোতে প্রচুর পরিমাণে কোবাণ্ট রয়েছে। সেগুলো তালে তালে নেচে চলেছে যেন কে তাদেরকে বৈদ্যুতিক শক্তি যোগাচ্ছে। (৪৮)

লেবাননের ব্যালবেকে রহস্যজনক সব পাথরের চাঁই আবিষ্কৃত হয়েছে। রাশিয়ার প্রফেসর এম. আগরেস্টের মতে বেলবেক্ টেরেসটা

ছিল আমেরিকার হিউসটনের মতো একটা মহাকাশঘাঁটি যেখান থেকে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে পাড়ি দেবার মতো মহাকাশযানগুলো ছাড়া হতো। ওগুলো চালানো হতো পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাঁইগুলো নাকি জীব জগতের আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহৃত হতো সাধারণ মানুষকে তাপ বিকিরণের হাত থেকে রক্ষে করবার জন্যে। মহাকাশযান ছাড়ার সময় তো প্রচুর পরিমাণ তাপ বিকিরণ হতো। মিস্টার আগরেস্টের মতে ওসব অপার্থিব মহাকাশযান অন্য পৃথিবীতে যাত্রা শুরু করতো, সৌর জগত আবিষ্কার করে তারা মূল মহাকাশযান বা অন্তঃরীক্ষে মহাকাশকেন্দ্রে ফিরে আসতো। প্রফেসর আগরেস্টের এই ঘোষণা সারা পৃথিবীতে একটা তোলপাড় এনে দিয়েছিল। তার ঐ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পৃথিবীর বিশেষজ্ঞ মহলে নানা রকম কল্পনা জল্পনা চলেছে।

এই ব্যালবেক টেরাসের পাথরের চাঁইগুলো মিশরের সর্ব বৃহৎ পাথরের চাঁইগুলো থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ থেকে এক'শ গুণ ভারী। আজকালকার সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রেন বা কপিকলও অত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাঁইগুলোকে মাটি থেকে পাহাড়ের চূড়ায় তুলতে পারবে না। তাহলে পাহাড়ের মাথায় কোন শক্তিশালী সভ্যতা ঐ ব্যালবেক প্রাসাদটা তৈরী করেছিল? (৪৯)

ব্র্যায়ান্-কারা-উলা'র যে চাকতিগুলোর কথা পূর্ব পৃষ্ঠায় বলেছি তাদের ওপর যে সব ছবি আঁকা রয়েছে তাতে চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি আঁকা আছে—আর এমন কতকগুলো জিনিস আঁকা রয়েছে যেগুলো সবেগে পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে। ঐগুলোই হবে মহাকাশযান। চাকতি'র লেখাগুলোই'ত তার প্রমাণ।

লণ্ডনের 'হিস্ট্রি টু-ডে' নামক একটা ম্যাগাজিনের সম্পাদকের কাছে লিখেছিলাম, 'প্রাগৈতিহাসিক-যুগে পৃথিবীতে মহাকাশ থেকে মহাকাশ-চারীরা আসতেন' এ কথাটা ঐতিহাসিক সত্য কিনা দয়া করে জানাবেন। এর সমর্থনে আপনাদের কাছে কোন ঐতিহাসিক যুক্তি বা নিদর্শন আছে কি? ভদ্রলোক লিখেছিলেন: আমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে নাড়া চাড়া করছি না। এ রকম কোন নিদর্শণের কথা আমাদের জানা নেই শুধু সাহারার টাসিলি' ফ্রেসকো' বা সাহারার টাসিলির প্রাচীর চিত্র ছাড়া। ঐ চিত্রটা দেখলে অনেকটা মহাকাশচারীর মতোই মনে হয়—বিশেষ করে তার শির-

স্ত্রাণটার সঙ্গে মহাকাশচারীর শিরস্ত্রাণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এ সব ব্যাপারে ফাটকাবাজীর ঝুঁকি নিতে হয়, কারণ, নিশ্চিত হয়ে'ত কিছু বলা যায় না, সবিই অনুমানের ব্যাপার। (নীচের চিত্র)

ভদ্রলোক এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবরাখবর রাখেন না। তাই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে পারেননি, আমি যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মুদ্রা তাম্রলিপি, শিলালিপি, শিল্পকলার নিদর্শন আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি আমার মতবাদের সপক্ষে সে সব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকলে তিনি ব্যাপারটাকে স্রেফ অনুমানের ব্যাপার বলে ভাবতে পারতেন না। কারণ,



এ সব কিছুকেই অস্বীকার করলে মানুষের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসকেই শুধু মাত্র অনুমানের ব্যাপার বলে হালকা করে দেখতে হয়। তাছাড়া তাম্র লিপি, শিলালিপি, মুদ্রা এ সবির ওপরকার খোদাই লেখাকে অস্বীকার করি কি করে? ও সবির লেখা'ত জলজ্যান্ত সত্য—অনুমানের কোন সুযোগ নেই এ সব ক্ষেত্রে। অশোকের শিলালিপি থেকে আমরা যদি অশোকের কীর্তি কলাপ আদেশ নির্দেশ সম্বন্ধে জানতে পারি এবং সে সবকে ঐতিহাসিক সত্য

হিসেবে মেনে নিতে পারি তাহলে বায়ান-কারা উলার শিলালিপি থেকে চীনা প্রত্নতত্ত্ববিদ যে সূত্র আবিষ্কার করেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য হবে না কেন? বিভিন্ন মুদ্রা থেকে ঐতিহাসিকগণ যদি রাজাদের রাজত্বকাল শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করতে পারেন তাহলে বিশিষ্ট মুদ্রা বিশেষজ্ঞ ডঃ রোমো ক্যাপোলী যে রায় দিয়েছেন তা ঐতিহাসিক সত্য হবে না কেন? এ ছাড়া প্রাগৈতিহাসিক যুগে মহাকাশচারীরা যে আসতো নাসার বৈজ্ঞানিক এবং মহাকাশচারীদের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে এর পেছনে। সুতরাং এর বৈজ্ঞানিক সত্যতাও অভ্রান্ত।

এই অত্যাধুনিক সভ্যতা কাদের সৃষ্টি

প্রাচীন যুগে যে মহাকাশযানে চড়ে গ্রহান্তরের মানুষ এ পৃথিবীতে আসতো তার প্রমাণ হিসেবে অনেকে অবশ্য এমন সব পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের উল্লেখ করে থাকেন যেগুলোর সঙ্গে মহাকাশযানের কোন সম্পর্ক নেই, কিংবা মহাকাশযাত্রার সঙ্গেও। যেমন, ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে আমি টেক্‌-টাইট জাতীয় অপার্থিব পদার্থের উল্লেখ করেছি। ১৮৮৬ সালে 'নেচার' নামক জার্নালে (vol. 35) গার্ট চিঃ লিখেছিলেন: একটা ইস্পাত নির্মিত টিউব আবিষ্কৃত হয়েছে অস্ট্রিয়ার একটা কয়লা খনিতে। কামিনরা সেটা পেয়েছে বিরাট একটা কয়লার চাঁই এর মধ্যে। ওজন ৮০০ জি, এম, এস (gms.)। তার চারিদিকে কাটা আছে একটা গভীর খাত। অস্ট্রিয়ার সালবাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে ওটা এখনো। উল্কা জাতীয় কোন পদার্থ এটা হতেই পা'র না। তাহলে এখন প্রশ্ন থেকে যায় ঐ পদার্থটা কোত্থেকে আসলো? ওটা কোন হাতের সৃষ্টি? ওটাকে কি মহাকাশযানে করে কেউ নিয়ে এসেছিল সেই সুদূর টাশ্যারী যুগে? অবশ্য কার্ল স্যাগন তার ইনটেলিজেণ্ট লাইফ্ ইন দি ইউনিভার্স' গ্রন্থে বলছেন:—ঐ পদার্থটা একটা জাল (পৃঃ ৪২০)। কেন জাল তার কোন সদুত্তর তিনি দেননি ঐ গ্রন্থে। সুতরাং, এ বিষয়ে অধিক কিছু বলতে অক্ষম আমি। তবে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে পারি ১৯৬০-৬১ সালে সোভিয়েত সাংবাদিক জি, এন্ ওসট্রুসেভ এ পদার্থটার উল্লেখ করেছিলেন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে। তার মতে অন্য মহাকাশযান যে এ পৃথিবীতে আসতো তার একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ ওটা।

১৯১৯ সালে ফোর্ট চি অন্য গ্রহ থেকে মানুষ আসতো এ কথাটা প্রমাণ করবার জন্যে আর একটা প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছিলেন (১২)। সুপিরিয়র হ্রদের তাম্রখনিগুলোও নাকি ইউরোপবাসীরা আমেরিকার মাটিতে পা না দেওয়ার আগেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুকৌশলে বার বার কাদের কর্তৃক আহরিত হয়েছিল—সোজা কথায় সুপ্রাচীন যুগে কোন সুসভ্য জাতি

অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ঐ তাম্রখনিগুলোর সম্পদ আহরণ করতো। হতে পারে কোন আদিম মানব সে খনিগুলো থেকে তাম্র সংগ্রহ করতো। কিন্তু, সে রকম কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাঁওয়া যায়নি। ঐ খনিগুলো থেকে কারা তাম্র আহরণ করতো বৈজ্ঞানিকেরা তার সদুত্তর দিতে পারছেন না এখনো। সুতরাং যারা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও পৃথিবীতে মহাকাশচারীরা আসতেন এ বিশ্বাস পোষণ করেন তারা এ রহস্যটার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে থাকেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যে পাঁচটি ইন্‌কা মমি সুরক্ষিত আছে সেগুলোর পেশীতে রক্ত পরীক্ষা চালানো হয়েছিল ১৯৫২ সালে। পরীক্ষক ছিলেন বি-ই গিলবট এবং এম্‌ লুব্রান। এই পরীক্ষার ফলাফল তারা জানিয়েছিলেন রয়্যাল এ্যানথ্রোপোলোজিক্যাল ইনষ্টিটিউটকে। পাঁচটে মমির মধ্যে তিনটি মমির দেহে পাওয়া গিয়েছিল 'এ' গ্রুপের রক্ত, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে পুরো দস্তুর গরমিল, একটুও সামঞ্জস্য নেই। একজনের ছিল D এবং C, কিন্তু C এবং E এর কোন লক্ষণ মেলেনি। রক্তের এরকম সংযোগ আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে চোখেই পড়ে না। অন্য একটা মমি যেটা ছিল রাজকীয় বংশের কারুউ—তার দেহে E এবং C ছিল কিন্তু D ছিল না। এ রকম রক্তের সংমিশ্রণ আমাদের পৃথিবীর মানুষের মধ্যে দুর্লভ বললেই চলে। এই রক্ত পরীক্ষা থেকেই প্রমাণিত হয় যে ইনকা'রা আমেরিকার আদিবাসীদের কেউ নয়, তারা বাইরের থেকে গিয়েই সেখানে রাজত্ব করতে থাকে। তাহলে কি ইনকারা যে সাদা দেবতাদে'র কথা বলে গেছে তাদের কথা সত্যি? এই দেবতারা কারা? (৫৩)

আধুনিক মানুষের ধারণা বিংশ শতাব্দীর মানুষই সব চেয়ে উন্নত সব চেয়ে সভ্য, এবং সভ্যতার এই উচ্চাসনে আরোহণ করতে গিয়ে তাকে হাজার হাজার বছর ধরে সাধনা করতে হয়েছে। কিন্তু, সত্যি সত্যিই কি তাই? বিংশ শতাব্দীর আমরাই কি সব চেয়ে বেশী সভ্য, বেশী উন্নত? কিন্তু, আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা, নৃতত্ত্ববিদ্‌রা আমাদের সামনে যে সব তথ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন বা করছেন তাতে একথাটাই প্রমাণিত হয় যে হাজার হাজার বছর আগে এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষ আমাদের থেকে কম সভ্য ছিল না; এমন কি আমাদের থেকেও বেশী

সুসভ্য ছিল ; অন্ততঃপক্ষে আমাদের থেকে কম সভ্য ছিল না এ কথাটা বলা যায় হলফ করে।

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে মোটামুটি শিক্ষিত ঘরের একটি ছেলে। পেরুর উপকূলে'র একটা গ্রামে ছিল তার বাস। একদিন দেখলে কয়েক জন ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং বিশেষজ্ঞের একটি দল সে গ্রামের মাটি খুঁড়ে কি যেন সব বের করেছে। সে তখন খব কৌতূহলী হয়ে সে মাটি খুঁড়ার দৃশ্য দেখছিল। এক সময় একটা মাথার খুলি বেরিয়ে আসলো মাটি থেকে। ছেলেটার উৎসুক্য দেখে বিশেষজ্ঞের দল তাকে কাছে ডাকলেন। মাথার খুলিটা তাকে দেখিয়ে বললেন :—দেখেছ এটা কি ?

হ্যাঁ, মরা মানুষের মাথার খুলি।

হুঁ, কিন্তু শুধু খুলি নয়।

তবে ?

মাথার মধ্যে এই চার কোণা গর্তটা দেখ্‌ছ ?

হ্যাঁ।

মাথার খুলিটা একটা বিশেষ অস্ত্র দিয়ে কেটে অপারেশন করা হয়েছিল। দেখছ না গর্তটার চারধারে হাড়গুলো কেমন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। খুবই কৃতিত্ব পূর্ণ অপারেশন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অপারেশনের পর লোকটা সুস্থ হয়েই উঠেছিল। তাহলে তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা অসভ্য ছিল না, কী বলো ?

ছেলেটা তখন বড় বড় চোখে প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসা ছুড়ে মেরে বললে :—আপনারা ইউরোপীয়রা মাথার খুলিটাকে এভাবে খুলে নিতে পারেন না ?

বিশেষজ্ঞের দল ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাসলেন, বল্‌লেন —অর্থাৎ অতি বিনীত ভাবে স্বীকার করলেন :—'না, আমরা পারি না।'

ছেলেটার মুখে তখন হাসির ফোয়ারা। আত্মসংবরণ করে বললে : তাহলে আমার পূর্ব পুরুষেরা নিশ্চয় আপনাদের চেয়ে সভ্য ছিল। বলেই সে ছুটে পালালো, তার মনে খুশী যেন আর ধরে না, এমনি ভাবখানা।

সেদিনের এই সেই ছোট ছেলেটাই বিশ্ব বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ জুলিও টেলো নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

সেই হাজার হাজার বছর আগে কারা ঐ রেড-ইণ্ডিয়ানদের অস্ত্র

চিকিৎসায় এতো পারদর্শী করে তুলেছিল? কিংবা কারা ছিলেন অস্ত্র চিকিৎসায় অতো পারদর্শী?

শুধু মস্তিষ্কে এ জাতীয় অস্ত্রোপাচারই নয়, আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর মানুষ হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা এক জায়গা থেকে হৃৎপিণ্ড তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় বসিয়ে দিতে পারতো। এ জাতীয় চিকিৎসায় আধুনিক যুগের মানুষ কেবল সফল হতে পেরেছে মাত্র কয়েক বছর আগে। সারা পৃথিবীতে তখন একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। প্রাগৈ-তিহাসিকেরা আমার এ কথাটাকে হয়তো অসম্ভব! বলেই উড়িয়ে দেবেন। কারণ, এক লক্ষ বছর আগে'ত পৃথিবীর বুকে আমাদের মতো কোন মানুষই ছিল না। পৃথিবীর বুকে তখন নাকি বাস করতো পিথেক্যানথ্রোপাস নামক প্রাণীরা, নয়তো নিয়ানডারথালরা সবে মাত্র পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিকেরা, ক্রমঃবিবর্তনবাদীরা যাই বলবেন বলুন না কেন উপরোক্ত বিষয়টাকে হেসে উড়িয়ে দেবার জো নেই।

১৯৬৯ সাল। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মধ্য এশিয়ায় অভিযান চালাবার সময়, ফফেসর লিউনিডোভ মারমাজাইনের নেতৃত্বে লেনিনগ্রাড্ এবং আসকাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটা গুহার মধ্যে আবিষ্কার করলেন একটা গোরস্থান। একটা, কবরে তারা দেখলেন ত্রিশ'টা কঙ্কাল সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে। আসকাবাদে ফিরে এসে তারা ঐ সব কঙ্কালের বয়েস নির্ণয় করবার চেষ্টা করলেন কার্বণ—১৪ পদ্ধতির সাহায্যে। জানা গেল ওগুলো ১৪০০০ বছরেরও বেশী পুরোনো। বিশেষজ্ঞরা আরও এগিয়ে গেলেন। তারা জানেন কার্বণ—১৪ পদ্ধতির সাহায্যে দশ হাজারের বেশী বয়েস নির্ভুল ভাবে জানা যায় না। তারা আরও গবেষণা চালালেন, রায় দিলেন কঙ্কালগুলো এক লক্ষ বছরেরও বেশী পুরোনো। তারা আরো দেখলেন ওসব কঙ্কালগুলোর কোন কোনটার গায়ে অস্ত্রো-পাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট—বিশেষ করে বুকের খোলে যে অস্ত্রোপাচার চালানো হয়েছে তা অতি সুস্পষ্ট। তারা চমকে উঠলেন, কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকেরা খুবই সূক্ষ অস্থিতত্ত্ব (osteology) বা অস্থিবিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করলেন।

উক্ত পরীক্ষার থেকে যে বিস্ময়কর ফলাফল জানা গেল সেগুলো

তুর্কমেনিস্থান নৃতত্ত্ব বিভাগের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের সামনে গিয়ে হাজির হলো ১৯৬৯'এর নভেম্বর মাসে, রিপোর্টটা সংক্ষেপে এইরূপ :—

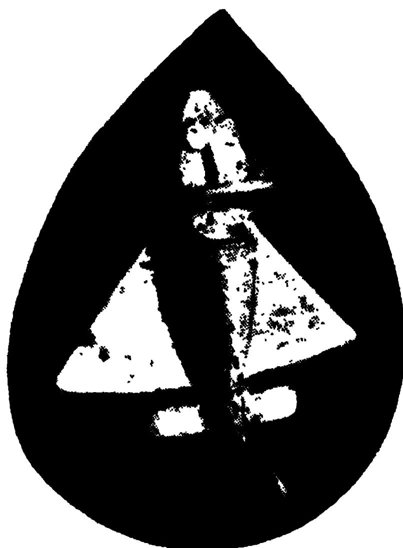
কঙ্কালগুলোর মধ্যে আটটির গায়ে গুরুতর রকমের অস্থিক্ষত চোখে পড়ে। বুকের খোলের চারদিকে যে সব অস্থি রয়েছে সেগুলোকে কাটা হয়েছে—কঙ্কালের বাঁ দিকের পাঁজরাগুলোকে যেন অত্যাধুনিক অস্ত্রোপাচারের সাজ সরঞ্জাম দিয়ে কাটা হয়েছে। পাঁজরাগুলো কেটে নিয়ে একটা বড়ো গর্তের মতো করা হয়েছে যাতে হৃৎপিণ্ডটা সহজে তুলে নেওয়া কিংবা বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই গর্তের চতুর্দিকের অস্থিগুলো পেরিওস্টুমে (Periosteum)-(এক রকম তন্ত্রজাতীয় ঝিল্লি, যা অস্থিগুলোকে ঢেকে রাখে এবং অস্থিগুলোকে শক্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করে) ঢাকা পড়ে গেছে দেখে লেনিনগ্রাদ এবং আসকাবাদের বৈজ্ঞানিকেরা রায় দিলেন :— এই অতি দুরুহ রকমের হৃৎপিণ্ড অপারেশনের পরও রোগী অন্ততঃপক্ষে তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিল। পেরিওসটিউমের রুক্ষতা থেকে এটে খুব সহজেই বলা যায়। (১০৪)

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কারের আগেও প্যালেস্টাইন, এশিরিয়া এবং ইরানে এ জাতীয় হৃৎপিণ্ড অপারেশনের কতকগুলো নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিলো (আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার।) কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের উক্ত আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত সেগুলোকে নিছকই অনুমানের ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চাইতেন প্রাগৈতিহাসিকেরা, ক্রমঃবিবর্তনবাদীরা। কিন্তু এখন? একলক্ষ বছর আগেও পৃথিবীর অধিবাসীরা যে অত্যাধুনিক জ্ঞান গরীমায় ভূষিত ছিল তা কি আর অস্বীকার করা চলে?

প্রাচীন দক্ষিণ আমেরিকার একটা নিদর্শনকে দেখতে একখানা এয়ারপ্লেনের মতো—যেন সেটা একখানা অত্যাধুনিক বিমানের নমুনা। ওটা সোনা দিয়ে তৈরী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন নিদর্শনের একটা প্রদর্শনী হচ্ছিল। সেই প্রদর্শনীর সময় ঐ সোনার জিনিসটা ডঃ আইভান স্যানডারসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডঃ স্যানডারসন একাধারে প্রাণীতত্ত্ববিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং লেখক। ঐ জিনিসটাকে আপাতঃ দৃষ্টিতে একটা প্রজাপতি, অথবা অন্য জাতীয় পতঙ্গ অথবা একটা চ্যাপ্টা মাছ বলেই মনে হয়। কিন্তু, অতি শক্তিশালী লেন্সের সাহায্যে ঐ বস্তুটাকে পর্যবেক্ষণ

করার পরে ডঃ স্যানডারসনের মনে হলো—ওটি কোন প্রাকৃতিক জিনিষের অনুকৃতি নয়, ওটা কোন যান্ত্রিক জিনিসেরই অনুকৃতি হতে পারে।

ডঃ স্যানডারসন একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ্। তিনি খুব ভালভাবেই জানেন একটা পতঙ্গ কিংবা মাছকে কি রকম দেখায়। তিনি দেখলেন পরিচিত কোন মাছ পাখী কিংবা পতঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলো ওটার নেই। সেটার সঙ্গে বরং বেশী সাদৃশ্য রয়েছে একখানা এয়ারপ্লেনের। উদাহরণ স্বরূপ:— ব-দ্বীপের মতো দেখতে তার পাখাগুলোর প্রান্তঃভাগ দেখতে অবিকল একখানা এয়ার প্লেনের এলিভেটর বা উত্তোলন-যন্ত্রের মতো। ঐ বস্তুটা যদি একটা পতঙ্গ কিংবা মাছ হয় তাহলে একটা পতঙ্গ বা মাছের মাথা শরীরের ঠিক যে জায়গাতে থাকবার কথা সেখানে নেই কেন? মাথাটা দেখতে আয়তাকার জিনিসের সম্মুখভাগের মতো—পুরোনো রোলস্ রয়েসের মাথার মতো। লেজটা একটা মাছের লেজের মতো খাড়া নয়; ওটা একটা অত্যাধুনিক প্লেনের লেজের মতো বাঁকানো।



জার্মানীর ফাইটার পাইলট, ইঞ্জীনীয়ার এবং জার্মাণ রকেট প্লেনের পূর্বসারীদের একজন মিস্টার জে, এ, আলরীচের মতেও ওটা একটা অত্যাধুনিক বিমানের অনুকৃতি। এই রহস্যজনক সোনার বস্তুটার সম্বন্ধে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ডঃ স্যানডারসনের অভিমত সম্বন্ধে অনবহিত থেকেও মিস্টার

আল'রীচ বললেন ওটা একটা এফ—১০২ ফাইটার। দেখুন, পাখাগুলো শেষের দিকে কিভাবে নীচের দিকে বেঁকে গেছে। একটা অতি শক্তিশালী প্লেন হঠাৎ যাতে উপরে উঠে যেতে পারে সেভাবেই ঐ পাখাগুলো তৈরী। ঐ জিনিসটার আকৃতি দেখলেই যে কোন প্লেনবিশেষজ্ঞ বলতে বাধ্য হবেন—ওটা একটা জেট্ প্লেন। তার রাডার তৈরীও রীতিসিদ্ধ এবং তার শেষের দিকের যে অংশগুলো সেগুলোকে দেখলে স্পিড্ ব্রেকার হিসেবেই মনে হয়। ঐ জিনিসটার আরও একটা বৈশিষ্ট্য সেটার পেছনের দিকে কোন এলিভেটর নেই। সুইডেনের (SAAB) এ্যায়ারক্র্যাপ্ট'এরও এরকম কোন এলিভেটর নেই। (১০৫)

এরিক্ ভন্ দ্যানিকেন তার 'দেবতাদের স্বর্ণ' নামক বইতে এই একই জিনিসটার কথা বলছেন কিনা জানিনা। তিনি বলছেন:—বোগোটার স্টেট্ ব্যাঙ্কে প্রথমেই যে জিনিসটা চোখে পড়ে সেটা হলো মাছের মতো একটা জিনিস—অনেকটা কাৎলা মাছের মতো দেখতে। বিশেষজ্ঞদের মতে ওটা নাকি একটা মডেল এয়ার ক্রাপ্ট। নিউইয়র্কের এরোনটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ডঃ আর্থার পোইসলীর মতে 'ঐ জিনিসটাকে কোন মাছ কিংবা পাখীর প্রতীক হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমতঃ সেটাকে পাওয়া গেছে কলাম্বিয়ার অন্তঃপ্রদেশে। সেখানকার শিল্পিদের বৃহদাকার কোন সামুদ্রিক মাছের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হবার সুযোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ ওটাকে একটা পাখীও মনে করা যায় না। কারণ, কোন পাখীর ওরকম ক্ষেত্রতাত্বিক (জিয়মেট্রিক্যাল) পক্ষযুগল থাকে না, এবং তার ডানাও অতোটা খাড়া হয় না।' (৭৩)

পরমাণু বিজ্ঞান এবং পরমাণু শক্তিতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ বিজ্ঞ এবং শক্তিধর ছিল। পরমাণু বিদ্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে বৈশিক এবং ন্যায়ের ন্যায় সংস্কৃত শাস্ত্রে। যোগ বৈশিষ্ট্যের মতে:—প্রত্যেকটা পরমাণুর মধ্যে আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পৃথিবী,—'আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাদের সু-স্পষ্ট ধারণা নেই তারা হয়তো যোগ বৈশিষ্ট্যের কথাটা শুনে হাসবেন। এক একটা পরমাণু এতো ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখাই যায় না—সেগুলোর মধ্যে কিনা আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পৃথিবী সব। কী উদ্ভট কথা প্রাচীন ঋষিদের! সুতরাং, আসুন, পরমাণুর গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধীয় অতি হালের যে বৈজ্ঞানিক ধারণা সে সম্বন্ধে আলোচনা করি।

আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, অনুতে পরমাণুতে, প্রাণীতে অপ্রাণীতে চলছে একই শক্তি বা প্রাণের লীলা খেলা। জগতের কোন কিছুই আলাদা নয়, সব কিছুই একই ব্রহ্মের অংশ। শক্তির ধর্ম ও স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের শবচ্ছেদন করেছেন, পদার্থের কোষগুলো আলাদা আলাদা করে নাড়া চাড়া করেছেন—তাদের এই সুগভীর সত্যানুসন্ধিৎসা তাদেরকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত করেছে যে পৃথিবীর উপর নীচে চারদিকে সর্বত্র চলছে একই প্রাণের, একই শক্তির লীলা খেলা। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের এই সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী, উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের কাছে এ ধারণাটা ছিল অকল্পনীয় উপহাসাস্পদ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিকেরা স্বাধীন স্বতন্ত্র গবেষণার সাহায্যে অনুর গঠন ও ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলো চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। যেমন, ডেনমার্কের একজন তরুণ বিজ্ঞানী নিরেল্‌স বোর প্রত্যেকটা অনুকে তুলনা করেছেন এক একটা সৌর জগতের সঙ্গে। সৌর জগতের কেন্দ্রে যেমন সূর্য, তেমনি প্রত্যেকটা অনুর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনগুলোর এক একটার ওজন সমগ্র অনুর ১/১২০০ অংশ মাত্র। এই ইলেকট্রনগুলো যেন সৌর জগতের এক একটা গ্রহ। (৭৯)

তাহলেই বুঝুন প্রাচীন ঋষিদের পরমাণু বিদ্যায় কী সূক্ষ্ম সুগভীর জ্ঞান। আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে ঋষি উলুকা বলে গেছেন—প্রত্যেকটা পদার্থ কতকগুলো পরমাণু অথবা পদার্থের বীজের সমষ্টি মাত্র। এর থেকে তার নাম হলো কনাদ অথবা বীজভক্ষক।

পরমাণু বিদ্যা সম্বন্ধে সুপ্রাচীন যুগের লোকেরা যদি এতো বেশী বিজ্ঞ ছিল, তারা কি পারমাণবিক অস্ত্রও তৈরী করেছিলো? সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আমরা পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের অনেকগুলো বর্ণনা দেখতে পাই। মৌশল পর্বে একটা বজ্রের বর্ণনা আছে। ঐ বজ্রপাতের ফলে বিপক্ষের সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। যারা বেঁচেছিল তাদের চুল এবং নখ উঠে গিয়েছিল। মাটির বাসন পত্র যা ছিল সব ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল আপনা থেকেই। পাখীরা হয়ে গিয়েছিল সাদা। কয়েক ঘণ্টা পর আহার্য বস্তু সব হয়ে উঠেছিল বিষাক্ত।

'একটা অগ্নি-প্রদাহী লেলিহান শিখা প্রদীপ্ত মিসাইল। সম্পূর্ণ ধোঁয়াহীন তার প্রজ্বলন। অকস্মাৎ একটা ভয়ংকর অন্ধকার আচ্ছাদিত করলো

আকাশ। উর্ধ্বাকাশে, মেঘে মেঘে গর্জন হলো শুরু। তার উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো পৃথিবী' (দ্রোণপর্ব)। এসব অস্ত্রের ধ্বংস কার্যের বিস্তৃত বিবরণ যারা পড়তে ইচ্ছুক তারা পড়ে নিতে পারেন। পড়তে পড়তে আপনাদের সামনে নিশ্চয় ভেসে উঠবে হিরোসিমার বীভৎস ধ্বংস স্তূপ।

সংস্কৃত সাহিত্যের এসব বর্ণনাকে আপনারা যাই মনে করবেন করুন নবেল প্রাইজ-বিজয়ী পদার্থবিদ্ ফ্রেডারিক সোডি কিন্তু এসব বর্ণনার ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি তার বিখ্যাত বইতে লিখে গেছেন :—'এ সব বর্ণনা পড়ে আমরা কি এই ধারণাই দৃঢ়বদ্ধ করে নিতে পারি না যে প্রাগৈ-তিহাসিক যুগের বিস্তৃত পৃথিবীতে এমন সব সভ্য প্রাণীরা বাস করতো যারা শুধু আমাদের মতো সমুন্নত সভ্যতারই অধিকারী ছিল না, তারা এমন শক্তির অধিকারী ছিল যে শক্তি আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত অজানা অচেনা।' (৮০)

ভারতবর্ষে এমন একটা মনুষ্য কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে যেটার মধ্যে এখনো তেজস্ক্রিয়তা স্বাভাবিকতার চেয়ে অন্তত পঞ্চাশ গুণ বেশী। (৮১)

ওরগন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর লুথার এস্ ক্রেস্ম্যান্ পূর্ব নেভ্যাডার ল্যামোস গুহায় দুশো জোড়া তন্তুজাত স্যাণ্ডাল আবিষ্কার করেছেন। এতো সুন্দর সেগুলোর গঠন বৈশিষ্ট্য, দেখলে ভুল হবে বুঝি সেগুলো এ যুগেরই। প্রতিযোগিতায় যে সব সুন্দরী আবির্ভূত হয় তাদের পায়ের স্যাণ্ডালগুলোর সঙ্গে এর হুবহু মিল। কিন্তু, ঐ স্যাণ্ডালগুলোর প্রকৃত বয়েস কতো জানেন? শত শত বৎসর নয়, হাজার, হাজার, বছর। সেগুলো নয় হাজার বছরের পুরোনো।

১৯৬৭ সালের নবেম্বর মাস। ইঞ্জিনীয়ার হ্যান্স এলীসল্যাজার (Elieslager)' এর নেতৃত্বে হামবুর্গ নগরীর সংস্কার কার্য চলছিল। খনন-কারীরা হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলো কতকগুলো বিরাট বিরাট পাথর— মানুষের মাথার মতোই হুবহু দেখতে। জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক প্রফেসর ওয়াদার ম্যাট্হেস সেগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। গবেষণার সাহায্যে তিনি এ তথ্যটাই প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে ঐ ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শনগুলো হিমবাহ বা তুষার যুগের আগেকার। তিনি আরও বললেন—হিমবাহ যুগের আগের সুসভ্য মানুষদের সাক্ষ্য বহনকারী এ জাতীয় ভাস্কর্য শিল্প নিদর্শন যে শুধু জার্মানীতেই আবিষ্কৃত হয়েছে তা নয়, রাশিয়ার পুরাতাত্ত্বিক জেড্, এ, আব্রামোভও এ জাতীয় পাথর আবিষ্কার করেছেন (৮৪)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের খনি-শিল্পের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তুরস্কে। ১৯৭৩ সালে আঙ্কারার মাইনার‍্যাল এক্সপ্লোরেশন ইনস্টিটিউট অব্ তার্কি'র (MTA) মিস্টার এরগান কেপ্টান্ এবং তুরস্কের আমেরিকার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একজন বিশেষজ্ঞ মধ্য এনাটোলার কতকগুলো জায়গা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এ সব জায়গা নাকি অতি প্রাচীন কালে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল এবং সেখান থেকে খনিজ ধাতু আহরণ করা হতো। সে সব খনিজ ধাতু আহরণ করে সেগুলোকে বিগলিত করে নানাবিধ শিল্প সামগ্রি তৈরী করবার জন্যে নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানও নাকি গড়ে উঠেছিল ঐ সব অঞ্চলে। কিছু কাঠ কয়লা আবিষ্কার করেছিলেন তারা ওখানে। সেগুলোকে রেডিও-কার্বন ল্যাব্‌টরীতে পাঠানো হলো পরীক্ষার জন্যে। তাদের একটা প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময়কার।

কারালি, বাকির, এবং কারাকাটাস্ প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করে উপরোক্ত বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন, হ্যাঁ, এসব অঞ্চলে বহু প্রাচীন যুগে বহু বছর ধরে খনিজ ও ধাতুজ প্রতিষ্ঠানগুলো কার্য কলাপ চালিয়ে আসছিল। (৮৫ ·

প্রাচীন প্রস্তর যুগের লোকেরাও তাহলে নানাবিধ খনিজ ও ধাতুজ শিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল! তাহলে তারা আর অসভ্য বর্বর গুহাবাসী প্রস্তর যুগীয় মানব হিসেবে পরিগণিত হতে পারে কি করে? ঐতিহাসিকেরা জবাব দেবেন? কোনারকের মন্দিরে গেছেন বেড়াতে? সেখানে পড়ে আছে মন্দির থেকে খসে পড়া কতকগুলো লোহার পাত। জায়গাটা নোনা। আশে পাশের বাড়ীগুলো নুনে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু এ লোহার পাত গুলোর গায়ে ওখানকার নোনা আবহাওয়া এতটুকু দাগ কাটতে পারেনি। কী যাদু জানতো আগেকার লোকেরা? ঋকবেদে লেখা আছে ভারত বাসীরা ইস্পাত তৈরী করতে জানতো, এবং সে পদ্ধতি যে অত্যাধুনিক ইস্পাত তৈরীর কলা কৌশল থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ ভিলাই দুর্গাপুরের ইস্পাতের সঙ্গে উপরোক্ত ইস্পাতের তুলনা করলেই বুঝতে পারবেন।

আর্মেনীয়ার জিওলোজিক্যাল ইনস্টিটিউটের সদস্য কোবিয়াস মেগারচিয়ান ১৯৬৮ সালে মেড্ঝামরে একটা সুপ্রাচীন কারখানা আবিষ্কার করেন। হিসেব মতে কারখানাটা খৃঃ পূ ৩০০০ শতাব্দী আগেকার। সে কারখানার শ্রমিকেরা হাতে দস্তানা পরতো, মুখে থাকতো মুখ বাঁচানোর জন্য মুখোস। ওদেরকে দেখলে মনে হবে অত্যাধুনিক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের

কোন শ্রমিক। এখানে নানা রকম ধাতু এবং ধাতুজ সামগ্রি তৈরী হতো। বাইরের থেকে কাঁচা ধাতু আমদানি করে এ কারখানাতে অত্যাধুনিক ধাতু সামগ্রি সব তৈরী হতো। এই শিল্প নগরীটা এমন একটা স্তরের ওপর অবস্থিত সেটার নীচে নাকি আরও অনেক পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যাবে, এবং তাতে এটাই প্রমাণিত হবে যে এর থেকেও পুরোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এ অঞ্চলে বিরাজ করছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে।

মেগারছিয়ান এবং তার সহযোগীরা যে গবেষণা চালাচ্ছিলেন তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সাংবাদিক জিয়ান ভাইডাল। ফিরে এসে তিনি লিখেছিলেন :— (Science et se, july 1969) মেড্‌ঝামোরে অনেক ধাতু মাটির নীচে লুকিয়ে আছে সেগুলো এখনো আবিস্কার করা যায়নি। যে নমুনাগুলো উদ্ধার করা গেছে সেগুলো দেখলেও কিন্তু অত্যাধুনিক ধাতু বিশেষজ্ঞরা চমৎকৃত হবেন। এগুলোর মধ্যে আছে ইস্পাতের চিমটে। এগুলো দেখতে চোখের পাতার মতো। এগুলোর সাহায্যে রসায়নবিদ এবং ঘড়ি-নির্মাতারা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তুলে নিতেন. ব্যবহার করতেন, যথাস্থানে লাগিয়ে দিতেন। কারণ, খালি হাতে ওগুলোর ব্যবহার সম্ভবপর নয়।

সাংবাদিক জিয়ান ভাইডালের মতে ঐতিহাসিকেরা যে সুমেরীয় সভ্যতাকে অতি প্রাচীন স্থান দিয়ে থাকেন তারও অনেক আগে মেড্‌-ঝামোরে একটা আধুনিক শিল্পোন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, এবং তারা নানা দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে বেশী ছাড়া কম ছিল না।

এর থেকেও সুপ্রাচীন (৫৬০০ থেকে ৭০০০ খৃঃ পূর্বাব্দের) শিল্প সামগ্রী আবিষ্কার করেছেন পুরাতত্ত্ববিদ জেমস্ মেল্লার্ট (Mellaart)। এগুলো কতকগুলো তামার জিনিস। এই তামার জিনিসগুলোকে আবার ধাতু মলের ওড়না পরানো হয়েছে—আজ থেকে ৯০০০ বছর আগের মানুষও তাহলে ওর্ থেকে ধাতুকে আলাদা করতে জানতো এবং সে ধাতুকে ইচ্ছে মতো রূপ দেবার জন্যে আগুনের ব্যবহার করতো। এসব সামগ্রি আবিষ্কৃত হয়েছে ক্যাটাল হুয়ুক নামক জায়গায়—মেড্‌ঝামোর থেকে ছ' শো মাইল দূরে। তাহলে একথাটাই অতি সহজে প্রমাণিত হয় আজকের সব কিছু আমরা ধার করেছি অতীত থেকে। অতীতে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে অনেকবার এবং কোন না কোন অজ্ঞাত কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে সে সভ্যতা। (৫৮)

সেই পুরোনো সভ্যতাকে মানুষ বারবার নতুন করে পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। আমাদের আজকের এই নভোজয়ী সভ্যতা যে মাটি ভেদ করে ক্রমঃবিবর্তনবাদের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে আসেনি একথাটা আজ নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। সোভিয়েত পণ্ডিত আগরেষ্টের মতে অন্য গ্রহ থেকে নভশ্চররা নেমে এসেছিল পৃথিবীর বুকে বহুবার। উপাখ্যান এবং লোকগাঁথাগুলোতে বলা হয়েছে তাদেরই কথা।

আদিম মানবদের কাছে গ্রহান্তরের এসব লোক ছিল দেবতা। কারণ তাদের বুদ্ধি এবং সভ্য চিন্তাধারা মার্জিত স্বভাব আদিম মানবদের মুগ্ধ করেছিল। তাদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখেই পৃথিবীর মানুষ তাদেরকে বসিয়েছিল দেবতার আসনে। এবং গ্রহান্তরের এসব মানুষই তাদেরকে শিখিয়েছিল সভ্যতা, শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি। স্যাগনও তুলেছেন আগরেষ্টের প্রতিধ্বনি। তিনি চালিয়েছেন সুমেরীয় সভ্যতা নিয়ে গবেষণা। অক্লান্ত গবেষণার সাহায্যে তিনি এ কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন সুমেরীয় সভ্যতা হঠাৎ যেন কতকগুলো ধাপ লাফিয়ে উঠে অনেক উর্ধে উঠে গেল। বর্বর জীবনযাত্রা প্রণালী কি করে হঠাৎ সমুন্নত সভ্য জীবনযাত্রায় উন্নীত হলো এর কোন বোধগম্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেলে না। স্যাগনের মতবাদ হলো সংক্ষেপে এই:—গ্রহান্তরের মানুষ মহাকাশযানে চড়ে এসে নাবতো সমুদ্রে এবং সাতরে সমুদ্র থেকে উঠে এসে কিছু কিছু জ্ঞান বিজ্ঞান উপহার দিয়ে যেতো পৃথিবীর মানুষকে। এই গ্রহান্তরের মানুষেরাই সুমেরীয় সভ্যতার স্রষ্টা। আমাদের পুরাণের মৎস্যাবতারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে? ব্যাবিলনীয় উপাখ্যানে আছে:—ওয়েন্স নামে একটা পশু উঠে আসলো পারস্য উপসাগর থেকে। সেই পশুটার শরীর ছিল মাছের মতো। মাছের মাথার নীচে তার আর একটা মাথা লুকোনো ছিল। তার পাগুলো ছিলো মানুষের মতো কিন্তু তার শরীরটা মাছের লেজের আকার নিয়েছিল শেষ প্রান্তে। দিনের বেলায় এই অদ্ভুত জানোয়ারটা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে কথা বলতো। কিন্তু, মানুষের দেওয়া কোন আহার্য বস্তু গ্রহণ করতো না। তবুও আগ্রহী হয়ে সে পৃথিবীর মানুষকে শিখিয়েছিলো কলা শিল্প বিজ্ঞান; শিখিয়েছিল কি করে বাড়ী ঘর তৈরী করতে হয়, ছবি আঁকতে হয়, লিখতে পড়তে হয়, অঙ্ক করতে হয়—এমন আরও কতো কি। চাষ পদ্ধতিও নাকি সে শিখিয়েছিল পৃথিবীর মানুষকে।

অ্যারিডেনাস অ্যাপোলোডোরাস'এর লেখা থেকেও এরকম প্রাণীর কথা জানা যায়। কিন্তু, জন্তু জানোয়ার কি মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে? সে কি মানুষকে সভ্যতা শেখাতে পারে? তাহলে 'ওয়েস' কে? মনে আছে অ্যাপোলো বারো চন্দ্র জয় করে সমুদ্রে এসে নেবেছিল? সমুদ্র থেকেই'ত চার মহাকাশচারীকে সমারোহে পৃথিবী তুলে নিয়েছিল নিজের উষ্ণ বুকে। তাহলে কি ওয়েস অন্য গ্রহের মানুষ? ওয়েসের দেহ ছিল বর্ম বা বিশিষ্ট পোষাকে ঢাকা. মুখে ছিল মুখোস। (দুটো মাথা?)

আলেকজেণ্ডার পোলিহিস্টর প্রায় অঙ্ক কষে দেখালেন ওয়েসের আগমনের পর থেকেই সুমেরিয় সভ্যতার চেহারায় আমূল পরিবর্তন দেখা গেল। সুমেরিয় পুরাতত্ত্ব নিয়ে যারা মাথা ঘামিয়েছেন তারা এতে সমর্থন জানাবেন। কারণ পুরাতত্ত্বও এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে। যন্ত্রবিদ্যার দিক দিয়েও যে সুমেরীয় সভ্যতা উন্নত ছিল তার প্রমাণও আবিষ্কার করতে পেরেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। উদাহরণ স্বরূপ, ইমেয়ন গিবার'এর কারখানা চুল্লি এবং তিন টন বিশিষ্ট যে গ্লাস ব্লকটা আবিষ্কৃত হয়েছে হাইফার কাছে সেগুলোর কথা বলা চলে।

আরও কতকগুলো উদাহরণ দিচ্ছি যেগুলো আধুনিক দাম্ভিক সভ্যতা গর্বী মানুষের মনকে নাড়া দেবে। ১৯৬১ সালেওঃ বার্গম্ সোনার পাত বসাবার কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন যা এ যুগের মানুষের কাছে অজানা। (৬১) কৌশলটা হলো এই রকম: যে বস্তুর উপর সোনার পাত বসানো হবে সে বস্তুটার উপর হালকা তামা এবং লোহার মিশ্রিত পাত বসিয়ে দিয়ে আগুনের উত্তাপে সেগুলো বিগলিত করা হবে। তামাটা তখন অক্সাইডে পরিণত হবে এবং ক্রমে ভেজিটেবল এ্যাসিডের সঙ্গে মিশে যাবে। আর সেনার পাতটা ঠিকই থেকে যাবে। ইলেকট্রোলাইসিসের চেয়ে এ পদ্ধতিটা সহজতর। কিন্তু, এই সহজতর পদ্ধতিটা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

১৯৬১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী। মাইক মাইকসেল ওয়ালেস লেইন ভার্জিনিয়া ম্যাক্সি কালিফোর্নিয়ার ওলানচার অদূরে নানা রকম পাথর সংগ্রহ করতো। সেদিন তারা একটা পাথর খুঁজে পেলো যেটাকে দেখেই কেমন যেন রহস্যজনক মনে হলো। জীবাশ্মের খোলা। পরের দিন

পাথরটাকে তারা দু-টুকরো করলো। পাথরটা খুবই শক্ত চীনা মাটি বা সিরামিক জাতীয় কিছু। মাঝখানে ছিল দু-মিলিমিটার লম্বা উজ্জ্বল একটা ধাতুর দণ্ড। চার্লস ফোর্ট সোসাইটির লোকেরা খবরটা শুনে পড়ি কি মরি গতিতে ছুটে এলেন। রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে পাথরটা পরীক্ষা করে দেখলেন। চমকে উঠলেন। কোন না কোন রকম বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম! কিন্তু শক্ত পাথরে ঢাকা ছিল কেন ঐ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামটা? সহজ মাটির কিংবা টিনের প্রলেপ কিংবা অন্য কোন হালকা ধাতুর প্যাকেটে যদি মোড়া থাকত তবুও একটা যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যেত। পৃথিবীর মানুষ এখনো ঐ বস্তুটার রহস্যের খোঁজ পায়নি। ওটা কি এই পৃথিবীর, না অন্য কোন গ্রহের? (৮৭)

১৯০১ সালে একটা এ্যাম্ফোরা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল গ্রীসের অ্যানটিথিকেরা দ্বীপে। সেটা ছিল মোহর করা। সেটাকে খুলে বের করা হলো। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চললো। কিন্তু, সন্তোষজনক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলো না কেউ। শেষ পর্যন্ত ১৯৬০ সালে অক্সফোর্ডের প্রফেসর ডেরেক ডি সোলা প্রাইস, ডি অক্সিডাইসিং প্রক্রিয়ার, সাহায্যে এটাই প্রমাণ করলেন যে ওটা একটা যন্ত্র। বিশেষ এক রকম ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরী। সে যন্ত্রটার সাহায্যে সৌরজগতের গ্রহগুলোর অবস্থান নির্ণয় করা হতো। যে ব্রোঞ্জ দিয়ে ঐ যন্ত্রটা তৈরী তা যে কতোদিনের প্রাচীন এবং কি জাতীয় তাও বলতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। তবে কি ঐ যন্ত্রটা অন্য গ্রহের মানুষদের?

এখন আমি বলবো একটা ম্যাপ বা মানচিত্রের কথা। তুরস্কের ন্যাশনাল মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর ম্যালিন ঈঢেম্ ১৯২৯ সালের ৯ই নবেম্বর পৃথিবীর দুটো মানচিত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ম্যাপগুলো পিরিরীচের। কে এই পিরিরীচ? একজন কুখ্যাত জলদস্যু। একজন মহাবীর হিসেবেও তার কুখ্যাতি ছিল। তিনি আবার একটা আত্মজীবনীও লিখে গেছেন। নাম ব্রাহ্রিইয়ে (Bahriye)। ভীষণ বিদ্ঘুটে নাম বইটার। এই বইয়ে ভূমধ্য সাগরের প্রত্যেকটা বন্দরের উল্লেখ এবং বর্ণনা রয়েছে এবং সেগুলোর একুশটা মানচিত্রও স্থান পেয়েছে বইটাতে। তিনি পৃথিবীর দুখানা ম্যাপ এঁকেছিলেন—একটা ১৫১৩ সালে এবং অন্যটা ১৫১৮ সালে।

এখন প্রশ্ন উঠবে নিশ্চয়ই পিরিরীচ্ এই ম্যাপগুলো আঁকলেন কি করে। আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর পিরিরীচ নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সুপ্রাচীন অনেকগুলো মানচিত্র তিনি জোগাড় করেছিলেন এবং সেগুলো বেশ ভাল করে অধ্যয়ন করে অর্থাৎ রীতিমতো গবেষণা করে তিনি ঐ ম্যাপ দুটো এঁকেছিলেন। এই মানচিত্রগুলো যে খুবই প্রাচীন এবং কারও গুপ্তধন—এ কথাটা বোঝাতে চেয়েছেন তিনি বারবার। যে মানচিত্রগুলো নিয়ে তিনি গবেষণা করেছিলেন তাদের সংখ্যা হবে কুড়ি। এগুলোর মধ্যে ছিল প্রাচ্যের আঁকা অনেকগুলো মানচিত্র। এবং তিনি নিজেই নাকি সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ যিনি শুধু হাতে পেয়েছেন প্রাচ্য দেশ থেকে ঐ মানচিত্রগুলো। তাহলে পিরীচের স্বীকৃতি থেকে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় পিরিরীচের হাজার হাজার বছর আগেও পৃথিবীর মানুষ মানচিত্র আঁকতে জানতো অর্থাৎ পৃথিবীর সব খবরাখবর ছিল তাদের নখদর্পণে। তাহলে কে এই সুসভ্য জাতি? কতো হাজার বছর আগে পৃথিবীতে বাস করতো তারা?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে অনেক গবেষণা করতে হয়। এবং একটু পরেই এ কাজে আমি হাত দিচ্ছি। এ সম্বন্ধে পিরিরীচ যেটুকু বলেছেন সেটুকুই আমি বলছি। পিরিরীচের মতে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেননি। তার আগেই মানুষ আমেরিকা আবিষ্কার করেছে; এবং পূর্ববর্তী আবিস্কারকদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েই কলম্বাস পাড়ি দিয়েছিলেন আমেরিকায়। যে গ্রন্থ পড়ে কলম্বাস এই জাতীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন সেটা দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের আমলের। তাহলে কি খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীর লোকেরাও আমেরিকার কথা জানতো?

প্রশ্নটার বিশদ জবাব দেবার আগে চলুন আমরা পিরিরীচ মানচিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোর সম্বন্ধে আলোচনা করি সংক্ষেপে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। পিরিরীচ তার নোটে বারবার একথাটা বলেছেন যে, তার আত্মজীবনীতে কোন মিথ্যাচার নেই। এ কথাটার যথার্থটা অনুভূত হবে তখনি যখন আমরা সর্বান্তঃকরণে এ কথাটা মেনে নিতে পারবো যে একটু ভুল, একটু মিথ্যাচার তালিকাকে অব্যবহার্য্য অকেজো প্রতিপন্ন করে দিতে পারে। নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধে (অনেকটা মহাকাশবিদ্যার মতো) এ কথাটা খুবই প্রযোজ্য।

তাহলে পিরিরীচ মানচিত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য? এই মানচিত্র থেকে আমরা আটলান্টিক এবং তার জলরাশির ওপর গড়িয়ে আমেরিকা আফ্রিকা,

উত্তর মেরু এবং এ্যাণ্টার্কটিকার যে সব উপকূল সেই সব অঞ্চলকে দেখতে পাই। সেখানে আছে পর্বত। পর্বতগুলোকে দেখানো হয়েছে রিলীফের সাহায্যে, নদীগুলোকে দেখানো হয়েছে পুরু কালো রেখার সাহায্যে, পার্বত্য বন্ধুর ভূমিগুলোকে দেখানো হয়েছে কালো কালির চওড়া বিন্দু এঁকে; বালুকাময় ভূমি এবং অল্প জলা জায়গাগুলোকে নির্দেশ করা হয়েছে লাল বিন্দুর সাহায্যে, প্রবাল প্রাচীরগুলোকে দেখানো হয়েছে ক্রশ চিহ্নের সাহায্যে।

১৯৫৩ সালে তুরস্কের নৌবাহিনীর প্রধান হাইড্রোগ্রাফিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ইঞ্জিনীয়ার এইচ. ম্যালারীর হাতে পিরিরীচ মানচিত্রের একটা কপি তুলে দেন। হাতে নিয়েই ম্যালারী সাহেব বুঝতে পারলেন মালটা খাঁটি। সেটা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। তার পরবর্তী পর্য্যায়ের গবেষক হলেন চার্লস হ্যাপগুড্। নরডেন্স্কজোল্ড (Nordensk Jold) সেই পুরানো তালিকাগুলোকে আধুনিক কার্টোগ্রাফিক্যাল ভাষায় অনুবাদ করলেন। এতে ম্যালারী সাহেবদের গবেষণা সহজতর হলো।

সে ম্যাপ থেকে দেখা গেলো মানচিত্রে যে লামা (LAMA) আঁকা রয়েছে তাকে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইউরোপবাসীরা কেউ চেনে না। কলম্বাস পর্য্যন্ত হিসেব করতে পারেন নি যে দ্রাঘিমারেখা আঁকা ছিল মানচিত্রে সেগুলোকে। আধুনিক মানচিত্রগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে পিরিরীচ মানচিত্রকে ভুল আজগুবি বলেও মনে হতে পারে। কারণ, সে মানচিত্রে মধ্য আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকাকে সংযুক্ত করে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐ মানচিত্রে আলাদা আলাদা দুটো আমেরিকা আঁকা নেই। আঁকা রয়েছে একটি আমেরিকাই।

পিরিরীচ মানচিত্রের তিনটে বিশেষত্বের কথা ওপরে বলেছি। এখন আর একটা বিশেষত্বের কথা বলছি।

আণ্টার্কটিকার উপকূল ভাগ মানচিত্রে সুস্পষ্টভাবে আঁকা রয়েছে। কিন্তু গ্রীণল্যাণ্ড এবং অ্যাণ্টার্কটিকাকে এমনভাবে আঁকা হয়েছে যেন সেখানে কোন বরফ নেই—অবিছিন্ন বরফের রাজত্ব'ত দূরে থাক বরফের ছিটে ফোটাও নেই। তাহলে কি মানচিত্রটা তুষারযুগে বা হিমবাহের যুগের আগের আঁকা?

এ রকম একটা আজগুবি সিদ্ধান্তে পৌছুতে হলে আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় যার সাহায্যে বরফের তলায় আণ্টার্কটিকার

যে ভূ-ভাগটা লুকিয়ে রয়েছে সেটার গতি প্রকৃতি উদ্ধার করা যায়। সৌভাগ্যবশতঃ অতি আধুনিক কালে একাজটা সম্পন্ন হয়েছে। গ্রাভিমেট্রি এবং ভূকম্পন পরিমাপ করার যন্ত্রাদির সাহায্যে বিশেজ্ঞরা গ্রীণল্যাণ্ডের এবং এ্যাণ্টার্কটিকার বরফে ঢাকা ভূভাগটাকে চিনে নিয়েছেন। গ্রীণল্যাণ্ডের বরফের স্তূপ ৪৫০০ ফুট গভীর, এ্যাণ্টার্কটিকার গভীরতা ১৪,৬০০ ফুট। এই হাজার হাজার ফুট বরফের নিম্নস্থ গ্রীণল্যাণ্ড ভূভাগের চারধারের সীমারেখা আঁকলেন বিশেষজ্ঞরা। একইভাবে কার্টোগ্রাফির সাহায্যে আণ্টার্কটিকার কিছু অংশের মানচিত্র আঁকলেন তারা।

এগুলোর সঙ্গে পিরিরীচ মানচিত্রের তুলনা করলেন ম্যালারী সাহেব। চমৎকার সাদৃশ্য আবিষ্কার করলেন।

আরেকটা ব্যাপার তাকে ঘাবড়ে দিল। উপকূলের অদূরে যে দ্বীপগুলোকে দেখিয়েছেন পিরিরীচ সেগুলোর সঙ্গে চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে পর্বতশৃঙ্গগুলোর যেগুলো আজ বরফের নীচে মুখ বুজে পড়ে আছে। এই তথ্য উদ্ঘাটিত করেছিলেন নারওয়ে সুইডেন, ব্রিটেনের অ্যাণ্টার্কটিক্ অভিযাত্রি দল। ম্যালারী সাহেব ম্যাপটাকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। নতুন আঁকা ম্যাপের সঙ্গে পুরোনো ম্যাপটার সাদৃশ্য তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ালেন। এক জায়গায় তিনি আটকে গেলেন। হিসেব মিলছে না। পিরিরীচ মানচিত্রে আছে দুটো উপ-সাগর। কিন্তু, নতুন ম্যাপে দেখানো হয়েছে টেরা ফারমা...ব্যাপার কি? বাধ্য হয়ে তিনি বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হলেন। ভূকম্পন পরিমাপ করবার যন্ত্রাদির সাহায্যে একটু যাচাই করে দেখুন তো। ভদ্রলোকেরা সাড়া দিলেন। পরীক্ষা করলেন। রায় দিলেনঃ—পিরিরীচই ঠিক। আর পি লিনে হ্যান জোর গলায় বললেনঃ—পিরিরীচ আশ্চর্য্যজনকভাবে নির্ভুল।

কিন্তু রুশ মতবাদীরা কি বলেন জানেন? তারা বলেন পিরিরীচ মানচিত্রে অ্যাণ্টার্কটিকাকে দেখানোই হয়নি। যা দেখানো হয়েছে তা হলো প্যাটাগোনিয়া এবং টিয়েরা ডেল ফুয়েগোর দক্ষিণ সীমান্ত। এ সিদ্ধান্তটা মেনে নিলেও কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। কারণ, এসব অঞ্চলের কথা ১৫২০ সালের আগে পর্যন্ত পৃথিবীর লোক জানতো না। আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের কথাই ধরি আর রুশ বিশেষজ্ঞদের কথাই ধরি ঐ মানচিত্রগুলো যে অনেকদিনের পুরোনো একথাটা সহজভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু, কতো দিনের পুরোনো? কারা ঐ মানচিত্রগুলো তৈরী করেছিল?

ভারতবাসীরাই কি? পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন নাবিক কারা? আসুন আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখি।

প্রফেসর ওয়েবার এবং প্রফেসর ম্যাক্সমূলারের অতি প্রিয় সূত্রগুলোর মধ্যে একটি হলো—ভারতবর্ষ লিখতে জানতো না, এমন কি পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাতত্ত্ববিদদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ পাণিণিও লিখতে জানতেন না। ভারতবাসীকে হাতে কলমে লেখা শিখিয়েছে গ্রীস-দেশবাসীরাই। এখন প্রশ্ন হলো পাণিণির সময়ে যদি ভারতবাসীরা লিখতে পড়তেই না জানতো (তারা যদি শুধু শ্রুতির মাধ্যমেই শিক্ষা পেতো) তাহলে পাণিণি তার ব্যাকরণটা রচনা করলেন কাদের জন্যে? যে তত্ত্ব শিখলে কোন ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করা যায়, সে ভাষা শুদ্ধভাবে লিখতে ও পড়তে পারা যায় সে তত্ত্ব ও তথ্যের সমষ্টির নামই 'ত ব্যাকরণ? কথার ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে না কোন দেশেই। দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তা ও আলোচনার মধ্যে দিয়েই যদি শিক্ষা পেতো—অর্থাৎ বেদ পুরাণ ইত্যাদির চর্চা করতো নিরক্ষর ভারতবাসীরা তাহলে পাণিণির ব্যাকরণের ঐ তিন হাজার নয়'শ ছিয়ানব্বইটা বিধি রচনার কি সার্থকতা থাকতে পারে?

পাণিণি কি সত্যি সত্যিই নিরক্ষর ছিলেন? পাণিণির স্বদেশবাসীরা কি এতোই নিরক্ষর অশিক্ষিত ছিল? সুপ্রাচীণ সভ্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস, ভারতবর্ষই প্রধান। এখন এই চারটি দেশের মধ্যে কে কার থেকে বেশী সভ্য ছিল, কার সভ্যতা বেশী প্রাচীন এ সম্বন্ধে আলোচনা করলে পাণিণি লিখতে জানতেন কি না তার সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল ফিনিসবাসীদের কাছ থেকে গ্রীসবাসীরা শিখেছে লেখা আর গ্রীসবাসীদের কাছ থেকে লেখা শিখেছে ভারতবাসীরা। খ্রীস্টপূর্ব ৬৭০ শতাব্দী অবধি গ্রীসবাসীরা লিখতে জানতেন না; কিন্তু, ফিনিসবাসীরা লিখতে জানতেন খৃস্ট পূর্ব ১৫০০ শতাব্দীতেও।

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের এ ধারণা এখন পাল্টে গেছে শ্লীমানের ট্রয় আবিষ্কার করার পর। যে নগরীটার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই মনে করতেন বিশেষজ্ঞরা, সেই নগরীটাকে মাটির নীচ থেকে খুঁড়ে বের করে সভ্য দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিলেন শ্লীমান। ঐ পুরোনো নগরীতে থেকে যে সব মৃৎ পাত্র উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলোর গায়ে কি সব যেন লেখা আছে। এখন

কথা হলো এই সব লেখা কতো দিনের পুরোনো? বিশেষজ্ঞরা আবার গবেষণায় বসে গেলেন। তারা ভাবলেন হোমারের 'ট্রোজান ওয়র্' একটা ঐতিহাসিক ঘটনা—ঘটেছিল ১০০০ বছর খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে।, কেউ কেউ অবশ্য বলে থাকেন এই যুদ্ধটা ঘটেছিল ছ'হাজার খৃঃ পূঃ শতাব্দীর কাছাকাছি কোন সময়ে।

যাক্, ফিনিসবাসীদের কাছ থেকে গ্রীসবাসীরা লেখা শিখেছে বিশেষজ্ঞদের এই সুদৃঢ় রায়ের ভিত্তি এখন নড়বড়ে। আর যে প্রাচ্যতত্ত্ব বিদ্‌রা বলেছেন শুধু লেখা নয়, শিল্পকলা বিজ্ঞান—রাশিচক্র থেকে ভাস্কর্যশিল্প পর্যন্ত সব কিছুই ভারতবাসীরা শিখে নিয়েছে গ্রীসবাসীদের কাছ থেকে তাদের অভিমত কতটুকু গ্রহণযোগ্য? ক্যাল্‌ডিয়ার সেই পুরোনো ভূতটা হঠাৎ জেগে উঠেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের অভিমতকে অন্যমত করে দিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা মাটি খুঁড়ে অ্যাসিরিয়ায় এবং ব্যবিলনে কতকগুলো সিলিণ্ডার বা স্তম্ভক আবিষ্কার করেছিলেন। এ ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর স্যাইচ্ তার তৃতীয় হিলবার্ট বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ—

ইয়া' নগরীর পূর্ব নাম ছিল ইরিডু। ৬০০০ হাজার বছর পূর্বে ঐ নগরীটা পারস্য উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। ক্যালডিয়াবাসীদের কাছে ঐ নগরীটা খুবই পবিত্র ছিল। কারণ, ঐ খানেই তাদের সুপ্রাচীন সভ্যতার জন্ম। ওখান থেকেই সভ্যতার আলোকবর্তিকা তারা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন উত্তর দিকে। তাদের সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী উঠে এসেছিলেন সমুদ্র থেকে। এর থেকে অনুমান করা যায় তাদের সুপ্রাচীন সভ্যতার মন্ত্রদাতারা পূর্ব দিক থেকেই এসেছিলেন। আমরা ভালভাবেই জানি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সঙ্গে ক্যালডিয়ার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। ফরাসীরা যে সব মূর্তি উদ্ধার করেছিলেন টৌল্-লোহ্ থেকে সেগুলো প্রায় ছয় হাজার বছরের পুরোনো। এই মূর্তিগুলো খুব শক্ত পাথরে তৈরী—যার নাম ডিওরাইট্। এই পাথর আমদানি করা হয়েছিল পূর্ব দেশ থেকে। এ ছাড়া মুঘিরে পাওয়া গেছে সেগুন কাঠের তৈরী আসবাব পত্র—সেকালে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও সেগুন কাঠ ছিল না। ব্যবিলনে কাপড় চোপড়ের যে একটা তালিকা পাওয়া গেছে সেখানে আছে 'মসলিন' কাপড়ের নাম।'

সুতরাং, ক্যালডিয়া বা ব্যবিলনের সভ্যতা যে ভারতবর্ষের কাছে ঋণি সে

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কর্নেল ভ্যানস্ কেনেডি এ ব্যাপারটা খুব ভালভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছেন।

তাই, এইচ্. পি ব্ল্যাভ্যাস্কি বলছেন: 'যে হিন্দুদের কাছে ক্যালডিয়া-বাসীরা সভ্যতার জন্যে ঋণি সেই তারা লিখতে জানতো না, তারা অক্ষর জ্ঞান লাভ করলো গ্রীসবাসীদের কাছ থেকে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের মুখে এহেন হাস্যকর উক্তি শুনলেও বিশ্বাস করতে পারি না যেন।'

পৃথিবীর সব চেয়ে প্রবীনতম নাবিকের দেশ কোনটা? এর জবাবে বিশেষজ্ঞরা বলেন ফিনিস বাসীরাই পৃথিবীর সব চেয়ে পুরোনো নাবিক।

ডঃ উইলফোর্ড কিন্তু তার 'এসিয়াটিক রিসার্চ' গ্রন্থে হিন্দু পুরাণ থেকে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে এ কথাটাই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে হিন্দুরা নাবিক হিসেবে ফিনিসবাসীদের থেকেও প্রাচীন। এ স্থির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমরা কি কি তথ্য প্রমাণ উল্লেখ করতে পারি? হিন্দু পুরাণে সাতটি মহাদেশের উল্লেখ আছে। বর্তমান পৃথিবীতেও আমরা মোটামুটি সাতটি মহাদেশের কথা জানি। বর্তমান পৃথিবীর সাত সাতটি মহাদেশের সব কয়টির সঙ্গে পুরাণে বর্ণিত মহাদেশগুলোর মিল থাকবে এমন কোন কথা নেই। কারণ, যুগে যুগে মহাদেশগুলোর আকৃতি প্রকৃতি স্থান পালটে যাচ্ছে—ওরা ঘুরছে, দূরে সরে যাচ্ছে, কোন কোনটা কাছে এগুচ্ছে। সদা পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সব কিছুই যে ঠিক ঠিক থাকবে তা কোন যুক্তি সম্মত কথা নয়। কিন্তু, পুরাণের হিসেবের সঙ্গে আমাদের ভৌগলিক হিসেব মোটামুটি মিলে যাচ্ছে।

'পুরাণে আছে 'নীলে'র তীরে দীর্ঘ'স্থায়ী যুদ্ধ চলেছিল দেবতা এবং অসুর:দের মধ্যে। এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল দৈত্যরাই। তাদের রাজা এবং নেতা সাংখ্য অসুর থাকতো মহাসমূদ্রে, রাত্তিরে মাঝে মধ্যে আক্রমণ করতো দেবতাদেরকে।'

উইলফোর্ড মনে করতেন এখানে 'নীল' মানে নীল নদী। কিন্তু, মিসেস ব্ল্যাভ্যাস্কি ও অন্যান্যদের মতে ঐ 'নীল' অর্থ পশ্চিম আফ্রিকা, যার দক্ষিণ দিকে মরোক্কো অবস্থিত। ঐখানে বেঁধেছিল সুর অসুরের যুদ্ধ। এমন এক সময় ছিল যখন সাহারা মরুভূমির পুরোটাই ছিল একটা সমুদ্র, তারপর সেটা হয়েছিল একটা উর্বর শস্য-শ্যামলা উপমহাদেশ। কিন্তু বেশ কয়েক শ' বছর কিংবা হাজার বছর পরে সেই উর্বরা বৃহৎ ভূ-ভাগ কিছুদিনের জন্যে তলিয়ে

গিয়েছিল সমুদ্রে। তারপর ওটে শ্যামো অথবা গোবি মরুভূমির মতো একটা বৃহৎ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল কালক্রমে।

ওপরে সুরাসুরের যুদ্ধের কথা যেখানে বলা হয়েছে পুরাণের সেখানেই বলা হয়েছে:—'দু দলে প্রচণ্ড মারমারি শুরু হয়েছিল—একদল অগ্নিবর্ষণ করছিল এক দিক থেকে, অন্য দল অপর দিক থেকে—প্রচণ্ড রকমের অগ্নিবর্ষণ। সাংখ্য অসুর মহাদেশটার একাংশ আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল, অন্য দিকে ক্রৌঞ্চা দ্বীপের রাজা ক্রাকাচা অথবা ক্রৌঞ্চা অগ্ন্যুত্তাপে ভস্মিভূত করে দিচ্ছিল অন্য অংশ। এভাবেই দু'দলই একটা উর্বর শস্য-শ্যামল অঞ্চলকে রুক্ষ অনুর্বর মরুভূমিতে পরিণত করে তুলেছিল।'

পুরাণে আরও আছে:—

দেবতা এবং দৈত্যদের মধ্যে যুদ্ধের পর যারা বেঁচেছিল তারা দু' হাত আকাশের দিকে তুলে প্রাণ ঢালা কাতর কণ্ঠে বললে:—ভগবন! আমাদের-কে যে বাঁচাবে, তাকেই আমাদের রাজা করে পাঠাও! আমরা বাঁচতে চাই! তাদের মুখে ছিল শুধু একটা শব্দ 'ঈট্'। এই 'ঈট্, শব্দে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠলো, সমস্ত দেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।'

তাদের সেই সকাতর সকরুণ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ঝড় উঠলো, 'কালীর' জল আশ্চর্যজনকভাবে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো—যেমন হয়ে থাকে টাইফুন সাইক্লোনের সময়। আর সেই প্রকাণ্ড ঢেউগুলোর মাঝখান থেকে জেগে উঠলেন 'ঈট্'—অসংখ্য সেনাদলের অগ্রভাগে তিনি, মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠে বললেন:—অভয়! ভয় নেই।' পরে এই 'ঈট সমগ্র বর্বর দেশ, মিশ্র স্থান, অর্ভ-স্থান বা আরবদেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন এবং সে সব অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করলেন, সেখানকার অধিবাসীদের সুখ সমৃদ্ধির পথ দেখালেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে হিন্দু পুরাণগুলো যদি পশ্চিম আফ্রিকার ওপারে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপগুলোতে এবং অন্যান্য মহাদেশগুলোতে যে সব যুদ্ধ ও ধ্বংস কার্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে সবের বর্ণনা দিতে পারে, তারা যদি বর্বর জাতি এবং আরবদের খবরাখবরও দিতে পারে তাহলে হিন্দুরা নিশ্চয় ফিনিসবাসীদের আগে সমুদ্রবিদ্যা আয়ত্ত করেছিল—খৃঃ পূঃ ২০০০ কি ৩০০০ শতাব্দীতে যে ফিনিস সভ্যতার জন্ম, হিন্দু পুরাণগুলোর বয়েস তার থেকে নিশ্চয়ই বেশী।

হিন্দু পুরাণগুলো এর থেকেও অনেক বেশী পুরোনো খবর দিতে পারে।

যেমন ধরুন 'আটলান্টিসের কথা। পুরাণে যে শাঁখ দ্বীপের কথা বলা হয়েছে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের মতে সেটেই প্ল্যাটোর আট্‌লান্টিস। পুরাণে লেখা আছে শাঁখ দ্বীপের অস্তিত্ব তখনো আছে অর্থাৎ পুরাণকার যে সময় পুরাণ রচনা করছিলেন সে সময়। সে শাঁখ দ্বীপ বা আট্‌লান্টিক কিন্তু এখন নেই। সেটা মহাসাগরের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ১১০০০ বছরের আরও বহু আগে, (বিশেষজ্ঞদের হিসেব মতে)। পুরাণ রচনা হবার বহু আগে থেকেও যে হিন্দুরা শাঁখ দ্বীপ বা আটলান্টিস সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং, হিন্দু সভ্যতা যে ১১০০০ হাজার বছর থেকেও বেশী পুরোনো, এবং ১১০০০ বছরের অনেক আগেও তারা সুদক্ষ নাবিক ছিলেন, সপ্তসমুদ্র পাড়ি দিতেন, পৃথিবীর খবরাখবর ছিল তাদের নখ দর্পণে তাতে অবিশ্বাস করবার কি আছে!

প্রাচীন ভারতের নক্ষত্র বিদ্যার সাহায্যেও আমরা একথাটা প্রমাণ করতে পারি যে ভারতবাসীরা 'আটলান্টিস' সম্বন্ধে বেশ ভালভাবেই অবহিত ছিল। যেমন:—যখন সূর্যাস্তের সময় সিংহ রাশি সিংহলের দিকে খাড়াভাবে ছিল তখন মধ্যাহ্নে বৃষরাশি নিশ্চয় শাঁখ দ্বীপের (আটলান্টিসের) দিকে খাড়া বা উল্লম্ব হয়েই ছিল। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে সিংহলের অধিবাসী বা রাক্ষসদের কেন সিংহের বংশধর বলা হয়ে থাকে এবং শাঁখ দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে কেন তাদের কুটুম্বিতা ছিল বলা হয়ে থাকে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তা আজ থেকে ২৩০০০ বছর আগের। ম্যাকী তার স্ফিনক্সিয়াডে (Mackey's sphinxiad) হিসেব করেই এ তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন:—সে সময় ক্রান্তিবৃত্তের তির্যক গতি ছিল ২৭° ডিগ্রির‌ও বেশী, ফলতঃ বৃষরাশি আটলান্টিস বা শাঁখ দ্বীপের ওপর দিয়েই অতিক্রম করে থাকবে। (৮৮)

ভারতবাসীরা যে আটলান্টিসের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতো সে সম্বন্ধে পুরাণ থেকে আমরা আরও কিছু জানতে পারি:—'ভারতবর্ষ থেকে পবিত্র ষাঁড় নন্দিকে শাঁখ দ্বীপে আনা হলো রিষভের সঙ্গে মিলন ঘটাবার জন্যে। কিন্তু, যখন শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীরা 'অবিচারের দেশের অধিবাসী দৈত্য'দের সঙ্গে মিশে গেল, পাপাচারে কালো কুৎসিৎ রূপ ধারণ করলো তখন নন্দি চিরদিনের জন্যে শাঁখ দ্বীপেই থেকে গেল।'

আটলান্টিসের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ কি ছিল? তারা দৈত্যের বাসস্থান

যদি সপ্তম পর্যায়ে হয়ে থাকে (কারণ, সে এসেছিল পুষ্কর বা পাতাল অথবা আমেরিকা,—ভারতের অপর পিঠ্ থেকে) তাহলে ভারতের পাতাল বা আমেরিকা নিশ্চয় আটলান্টিস বা শাঁখ দ্বীপের প্রান্তরেখা বরাবর অবস্থিত ছিল। অথবা তা যদি সপ্তম আবহমণ্ডলে অর্থাৎ ২৪° অক্ষাংশ এবং ২৮° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত হয় তাহলে শাঁখ দ্বীপ ছিল পশ্চিম দিকে অবস্থিত—কারণ সূর্য অস্ত যেতো তারই পর্বতমালা অসভূর্জে (বিশেষজ্ঞদের অনেকে এখন অ্যাটলাস, টিরেনিজ অথবা নীল নাম দিয়ে থাকেন)।

ভারতবাসীরা জানতো কি করে আটলান্টিসের ধ্বংস হলো। পুরাণকারদের কেউ কেউ নিশ্চিত হয়েই বলেছেন :—প্রচণ্ড রকমের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস (প্রলয়ের সঙ্গে যার তুলনা চলে) এবং তার সঙ্গে সাংঘাতিক ধরণের ভূ-কম্পনের কবলে পড়ে সাতটা দ্বীপের মধ্যে ছ'টা দ্বীপই তলিয়ে গেল সাগর গর্ভে।'

এসব নানা কারণে এ. এইচ ব্লাভাস্কি বলছেন :—একটি হিন্দু কাহিনী (আটলান্টিস) ধার করে নিজের বলে জাহির করবার জন্যে গ্রীসবাসীদের অভিযুক্ত করা উচিৎ। কতকগুলো ভৌগলিক সিদ্ধান্তের জন্যেও তারা হিন্দুদের কাছে ঋণী।

প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের আর একটা ভুল ধারণা ছিল 'রাশিচক্র' সংক্রান্ত যাবতীয় কিছু হিন্দুরা গ্রীসবাসীদের কাছ থেকে ধার করেছে। বেঙ্গলী তাদের এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন। হিন্দু রাশিচক্র মিশরের রাশিচক্রের থেকেও পুরোনো। মিশরবাসীদের কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে তাদের রাশিচক্র ৮৭০০০ বছরের পুরোনো। কিন্তু, হিন্দুদের রাশিচক্র ৮৫০,০০০ বছরের পুরোনো। মিশরবাসীরা রাশিচক্র নিয়ে এসেছিল দক্ষিণ ভারত থেকে। (৮৯)

ম্যাকী তার স্ফিনক্সিয়াডে যে দুঃসাহসিক মন্তব্য রেখেছেন তা আধুনিক ঐতিহাসিকদের ঘাবড়ে দেবে। তিনি বলেছেন :—'মোটের উপর, ল্যাবিরিনৃথ, পিরামিড, এবং রাশিচক্র প্রভৃতি প্রাচীন মানব সভ্যতার স্মৃতি ও সাক্ষ্য বহনকারীরা মানব সভ্যতার ৫০ লক্ষ বছরের বেশি আগের সাক্ষ্য বহন করে না। হিন্দুরা কিন্তু, সত্তর থেকে আশি লক্ষ বছর আগেকার মানব সভ্যতার স্মারক চিহ্ন রেখে গেছেন। একটা পুরোনো চীনে মাটির মাদুলিই তার প্রমাণ।'

উরের একটা কবরে পাওয়া গেছে একটা বানরের মূর্তি। মহেঞ্জো-দারোতে যে বানরের মূর্তিআবিষ্কৃত হয়েছে দেখতে হুবহু সে রকম। অতি প্রাচীনকাল থেকে বানর ভারতবাসীদের অতি প্রিয়। ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির উপর তার যে রকম প্রভাব পৃথিবীর অন্য কোন সভ্যতার ক্ষেত্রে এ রকমটি দেখা যায় না। তাই প্রত্নতত্ত্ববিদ এস. কে দীক্ষিত এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন যে উর অথবা মেসোপটোমিয়ার অধিবাসীরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

সুমারিয়ার নগরীগুলোতে কতকগুলো অঙ্কিত পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এ পাত্রের অঙ্কন-পদ্ধতি সুমেরীয়ই বটে; কিন্তু বিষয় বস্তু যা কিছু তা সব ভারতীয়। ওখানে আঁকা আছে জেবু, বিরাট কুঁজ-ওয়ালা ষাঁড়ের চিত্র। প্রাচীন ভারতের যে সব শীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোতে এ ধরনের চিত্র বেশী পরিমাণে চোখে পড়ে। বিশ্ব-বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ডন-চাইল্ড তাই এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন যে সুমেরীয় শিল্পিরা ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি উদযাপন অনুষ্ঠান সমূহ দেখে থাকবে এবং তাতেই প্রভাবিত হয়ে থাকবে।

টোডারা আদিম অধিবাসীদের মধ্যে খুবই প্রাচীন। তাদের মধ্যে একটা গান প্রচলিত আছে। সে গান থেকে জানা যায় জাহাজের কথা। তাদের পূর্ব পুরুষেরা জাহাজে করে দূরদেশে বাণিজ্য করতে যেতো এ গানটি ধরে রেখেছে সেই তাদেরই স্মৃতি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা মেসোপটোমিয়া খনন কালে সেখানে প্রচুর পরিমাণ ভারতীয় পণ্য উদ্ধার করেছেন। এদের মধ্যে আছে চন্দন কাষ্ঠ। চন্দন কাষ্ঠ দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে প্রচুর জন্মে। আলেকজেণ্ডার কোনড্রাটোভ এসব বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন:—নাবিক হিসেবে ফিনিসবাসীদের থেকেও প্রাচীন আর্য-পূর্ব যুগের ভারতবাসীরা।

মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত হয়েছে মাস্তল-ওয়ালা জাহাজের চিত্র। ব্রিটিশ-প্রত্নতত্ত্ববিদ আরনেস্ট তবুও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন:—ফিনিস বাসী এবং আরবীয়দের থেকেও যে ভারতবাসীরা নাবিক হিসেবে প্রাচীন এতে কিন্তু তা প্রমাণিত হচ্ছে না। কিন্তু, অতি সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় গবেষকরা বোম্বাইয়ের অদূরে কাথিয়াওয়ার নামক স্থানে খনন করে ইষ্টক-নির্মিত বিরাট একটা জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামতি স্থা নআবিষ্কার করেছেন। সাত মিটার চওড়া একটা খাল খনন করে এই সুবৃহৎ শিপ্‌-ইয়ার্ডটার সঙ্গে

আরব সাগরের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। শোথাল শিপ্-ইয়াডটা, আলেক-জেণ্ডার কোনড্র্যাটোভের মতে, হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর সমসাময়িক।

ব্যবিলনীয় লেখা থেকে জানতে পারা যায় মেলুখার কথা। ' লক্ষ্য করে দেখবার বিষয় ব্যবিলনের অধিবাসীরা মেলুখায় যেতো না, মেলুখা-বাসীরাই আসতো তাদের দেশে বাণিজ্য করবার জন্যে। সুমেরীয় সূত্র থেকে জানা যায় তাদের বিরাটকায় জাহাজের নাম ছিল ম্যাগুলিম্। অনেক বিশেষজ্ঞই দ্রাবিড়দের 'মান্‌চি' শব্দটার মধ্যে ম্যাগুলিমের সাদৃশ্য খুঁজতে চান। 'মানচি'র অর্থও বিরাট একখানা মালবাহী জাহাজ। এই 'মানচি' শব্দটা মালয়ালম, তামিল, কানাড়ি তেলেগু ভাষায় বহুল প্রচলিত। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আলেকজেণ্ডার কোনড্রাটোভের সিদ্ধান্ত :—মেলুখার কথা বলতে গিয়ে ব্যবিলনবাসীরা দক্ষিণ ভারতকেই বোঝাতে চেয়েছেন।(১০৯)

এই রুশ প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে ভারতবাসীরা যে শুধু মেসোপটোমিয়াতেই যেতো তা নয় তারা মিশরের মতো দূর দেশের সঙ্গেও বাণিজ্য করতে।

উত্তর মিশরের লোহিত সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে যে সব অসংখ্য পাথরে খোদাই চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোতে এমন সব জাহাজের চিত্র আঁকা রয়েছে যেগুলোর সঙ্গে মিশরীয় জাহাজের রয়েছে বিস্তর ফারাক। জেবেল—এল—আরাক নামক স্থানে এমন একটা ছোরার বাঁট আবিষ্কৃত হয়েছে যেটার ওপর আঁকা রয়েছে একটা নৌ-যুদ্ধের চিত্র। মিশরীয়দের নৌকা প্যাপাইরাস (Papyrus) দিয়ে তৈরী ; আর অপর পক্ষের নৌকোর রয়েছে সু-উচ্চ অগ্রভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগ। প্রথম প্রথম বিশেষজ্ঞরা এসব অ-মিশরীয় নৌকোকে সুমেরীয়দের মনে করতেন। কিন্তু, সাম্প্রতিক গবেষণার সাহায্যে এটেই প্রমাণিত হয়েছে যে ওসব জাহাজ হলো দক্ষিণ-ভারতবাসীদের।

সুমেরীয় বা ব্যবিলনীয় উপাখ্যানে আছে পৃথিবীর স্বর্গ ডিলমুনের কথা। ডিলমুনে নাকি মৃত্যু ব্যাধি ছিল না. মানুষের জীবন ছিল সেখানে ভাবনা-মুক্ত আনন্দোচ্ছল। এই ডিলমুন কি বাইবলের স্বর্গের মতোই কাল্পনিক কিছু? আধুনিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত :—না, তাহলে ব্যবিলনবাসীরা 'ডিলমুনের জাহাজ' কথাটা বার বার ব্যবহার করতো না। ডিলমুন নামে কোন জায়গা নিশ্চয় ছিল এবং ওখান থেকেই ব্যবিলনে জাহাজে করে সুসভ্য নাবিকেরা বাণিজ্য করতে আসতেন, ব্যবিলনবাসীদের সভ্যতা উপহার দিতেন। তাহলে ডিলমুন—রহস্যটা কি? কারও কারও মতে ওটা বাহ্রিন

দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ক্রামের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানালেন। তার প্রবলতর যুক্তির মধ্যে একটা হলো :—ঐ দ্বীপপুঞ্জে কোন হাতী নেই। কিন্তু, সুমেরীয় সূত্র থেকে জানা যায় গজ-দন্তই ছিল ডিলমুনের প্রধান রপ্তানী দ্রব্যের অন্যতম। ক্রামেরের অন্য যুক্তি, জলদেবীর কোন মন্দির উক্ত দ্বীপপুঞ্জে চোখে পড়ে না। সুতরাং তারসিদ্ধান্ত :—ডিলমুনের কথা বলতে গিয়ে ব্যাবিলনবাসীরা ভারতবর্ষের কথাই বলেছেন। ভারতবর্ষে হাতী প্রচুর, এখানে জলদেবীর পুজা বহুল-প্রচারিত, এখানকার নৌ-যাত্রার ঐতিহ্যও অতি প্রাচীন।

উপরের এই আলোচনা থেকে দেখা গেল ভারতবর্ষের সভ্যতা গ্রীসের থেকে অল্পবয়স্ক'ত নয়ই, এমনকি মিশর ব্যাবিলনের সভ্যতার থেকেও পুরোনো।

এ. বেসাণ্ট এবং সি. ডব্লিও লীড্‌বিটারের লেখা ম্যান্! হোয়েন্স, হাউ এণ্ড হুয়িদার— (এ রেকর্ড অব্ ক্লেইয়ারভোয়্যাণ্ট ইন্‌ভেস্টিগেশন) নামক বইতে লিখেছেন :—১৩৫০০০ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে বি. সি. ভিরাগ দক্ষিণ ভারতীয় সাম্রাজ্যের মহান সম্রাট ছিলেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন ব্রাহ্‌স্পতিকে। তাদের সন্তানের নাম ছিল মঙ্গল। একদিন মনু সূক্ষ্ম শরীরে আবির্ভূত হলেন সম্রাট ভিরাগের কাছে। নির্দেশ দিলেন :—মঙ্গলকে আদেশ দাও সে যেন সিংহল হয়ে মিশরে যায়। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন যুবক যুবতীদের পাঠাও। যে সব যুবক যুবতী গিয়েছিল মঙ্গলের সঙ্গে মিশরে তাদের বারো জনের নাম পুরাণে পাওয়া যায়। মিশরে তখন টোলটেক্‌দের শাসন। মিশরের তখনকার ফ্যারাও বৃহস্পতি মঙ্গল এবং তার দলবলের সঙ্গে দেখা করলেন। বৃহস্পতির একটি মাত্র কন্যা ছিল। ঐ একটিমাত্র সন্তানের বয়স যখন খুবই অল্প তখন বৃহস্পতির স্ত্রী মারা যান। এদিকে সেখানকার পুরোহিত প্রধান সূর্যকে মহাগুরু আদেশ দিলেন বহিরাগতের প্রতি যথাবিহিত সৌজন্য দেখাতে এবং তাদের সেবা যত্ন করতে। বৃহস্পতিকে মহাগুরু বললেন তার কন্যাকে মঙ্গলের সঙ্গে বিয়ে দিতে। মঙ্গল বৃহস্পতি কন্যাকে বিয়ে করলেন। তাদের ঔরসে সন্তান হলো। এভাবে ভারতীয় ও মিশরীয় রক্ত মিশ্রিত হয়ে এক নতুন জাতের সৃষ্টি হলো। তবে তাদের চেহারায় দেহ সৌষ্ঠবে বীর্যবত্তায় আর্যদের প্রভাবটাই বেশী ছিল। মিশরের স্মৃতি সৌধ বা স্তম্ভগুলোতে এ জাতীয় মিশরীয়দের মূর্তি চোখে পড়ে।

কয়েকজন ভারতীয় দেব দেবীকেও মিশরীয়রা পুজো করতেন। যেমন উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণেরা ওঁ এর পুজো করতেন (Chapter XVI Verse 450)—poti-pherah অর্থে priest of On (ওঁ)। জেনেসিস থেকে আরও জানা যায় মিশরীয়রা আপিস (অপ ঈস জলদেবতা) দেবীর পুজোও করতেন। কারউ কারউ মতে পিরামিড অর্থ পৌর মঠ পুরু বংশীয় রাজাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মঠ। হিন্দুরাও মাতাপিতাকে খুব ভক্তি করতেন। হিন্দুদের কাছে মাতা পিতা দেবতার চেয়েও বেশী কিছু। মিশরবাসীদের কাছেও ছিল তাই। তাই তারা মৃত্যুর পরেও যাতে মাতা পিতার যথার্থ মান মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে সে উদ্দেশ্যে, তাদের স্মৃতি রক্ষার জন্যে, তাদেরকে অমর করে রাখবার জন্যে পৌরমঠ বা পিরামিড তৈরী করেছিলেন। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই মতে মিসরবাসীরা পিরামিড তৈরী করেননি। যারা পিরামিড্ তৈরী করেছিলেন তারা বহিরাগত উন্নত সুসভ্য সম্প্রদায়। কিন্তু এরা কারা? মিশরবাসীদের ওপর ভারতীয় প্রভাব যে উল্লেখযোগ্যভাবেই পড়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে পেন্এনসাইক্লোপিডিয়ার নবম গ্রন্থের ৩০১ পৃষ্ঠায়। When the history of Europe, Greece, Athens, Rome was in the dark, the high state of material civilisation was attained under a system of constitutional policy which resembles in some respects with those of the Hindoos. অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপ—গ্রীস্, এথেন্স, রোম প্রভৃতি সুসভ্য দেশ ও জাতি যখন অন্ধকারের অতল গহ্বরে তখন মিশরে এমন একটা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল যে সভ্যতার গঠন প্রকৃতি ও জীবনাদর্শের সঙ্গে হিন্দুদের অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে।'

আম্মিয়ানুস্ মার্সেলিনাস, একজন মিসর তত্ত্ববিদ্, পিরামিড্ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন :—পিরামিডের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ আঁকা বাঁকা অনেকগুলো পথ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে প্রাচীন দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে পটু ব্যক্তিরা এগুলোর সাহায্যে বন্যার আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। তাদের দুর্জ্ঞেয় বিদ্যার অনেক কিছুই তারা এখানে ওখানে চিরস্থায়ী করে রাখবার চেষ্টা করেছেন পাছে সে সব বিদ্যা লুপ্ত হয়ে যায়।'

'এ সব লোক যারা বন্যার আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করতেন তারা মিশরবাসী নন্।' তবে কে তারা? 'আইসিস আনভেইলড' নামক বই থেকে

এইচ্‌. পি. ব্ল্যাভাস্কি লিখেছেন :—ইউরোপীয়রা জাহাজে করে এদিক ওদিক সদর্পে ভেসে বেড়াবার আগে ফিনিসবাসীদের বৃহদাকার জাহাজগুলো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে বেড়াতো, এ কথা আমরা ভুলে যাই কেন ? পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা স্বীকার করবেন যে হাত মিশরের পিরামিড তৈরী করেছে, সে হাতই তৈরী করেছে কম্বোডিয়ার আঙ্কোর ভাট, মধ্য আমেরিকার পালেঙ্ক এবং ইউক্সমলের সভ্যতা।'

পি. এইচ্‌. ব্ল্যাভ্যাস্কি হয়তো বলবেন সমুদ্রের অতলগর্ভে বিলুপ্ত আট—লান্টিসের অধিবাসীরাই এসব সৃষ্টি করেছে। কিন্তু, মিস্টার উইলফোর্ড এ কথাটা খুব ভালভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ভারতবাসীরা নাবিক হিসেবে ফিনিসবাসীদের থেকে অনেক বেশী প্রাচীন। মিশরের পিরামিড্‌ তৈরীতে ভারতবাসীদের কোন হাত ছিল কিনা একথাটা খুব ভালভাবে প্রমাণিত না হলেও কম্বোডিয়ার আঙ্কোর ভাট, মধ্য আমেরিকার পালেঙ্ক এবং ইউক্সমলের সভ্যতায় যথেষ্ট ভারতীয় প্রভাব একথাটা বিশেষজ্ঞ মহল সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন আশা করি। এ বিষয়ে পিয়ারী হোনোর নামক এক জার্মাণ ভদ্রলোক যথেষ্ট আলোপাত করেছেন।

মায়া সভ্যতার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : পালেঙ্ক মন্দিরে যে মস্ত বড় ক্রস বা দণ্ডকাষ্ঠের ছবিগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে (এবং এই জন্যেই পালেঙ্ক মন্দিরকে অভিহিত করা যায় 'দণ্ডকাষ্ঠের মন্দির') সেগুলোর সঙ্গে জাভায় বা যবদ্বীপে যে স্বর্গ-বৃক্ষের ছবিগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যবদ্বীপে দণ্ডকাষ্ঠের কড়িকাঠগুলোর মধ্যে একটা দৈত্যের মুখ রয়েছে—এই একই ধরনের দৈত্য মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে পালেঙ্কে। পালেঙ্কে'র পদ্ম-দেওয়াল, ক্রস-চিহ্নিত খিলান' এর সঙ্গে কম্বোডিয়ার আঙ্কোর ভাটের তুলনা করলে একথাটাই মনে হয় যে পালেঙ্ক যারা তৈরী করেছে, আঙ্কোর ভাটও তাদের সৃষ্টি।

বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। মায়া সভ্যতার যে ক্যালেণ্ডার পাওয়া গেছে তার সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় ক্যালেণ্ডারের আশ্চর্য মিল—জাভা শ্যাম কম্বোডিয়ায় যে ক্যালেণ্ডার পাওয়া গেছে সেগুলোর সঙ্গেও ম্যায়াদের ক্যালেণ্ডারের হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে। এসব ক্যালেণ্ডার যে আধুনিক যুগের ক্যালেণ্ডারের চেয়ে কোন অংশে হীন নয় তা বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি : ম্যায়ারা সূর্য গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী

করবার জন্যে একটা তালিকা ব্যবহার করতো। এ তালিকায় লেখা আছে ১১,৯৬০০০০ দিন। আধুনিক নক্ষত্রবিদ্যায় এই হিসেবটা ১১, ৯৫৯, ৮৮৮ দিন। কী আশ্চর্য মিল দেখুন! তবে পুরোনো ঐ সব ক্যালেণ্ডার একটা দিক দিয়ে আধুনিক ক্যালেণ্ডারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ আমাদের নক্ষত্র বছর এবং পঞ্জিকা বছরের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়ে গেছে। শতো চেষ্টা করেও আমরা কিন্তু এই পার্থক্যটা ঘুচাতে পারিনি। এই পার্থক্যটা যখন খুব বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে তখন আমরা জোড়াতালি দিয়ে সে বৈষম্যটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ম্যায়াদের পঞ্জিকা-বছর এবং নক্ষত্র-বছরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

পাহাড়ী দেশ ইয়ুক্যাটানের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নগরী কাবাহ্। এই নগরীর সর্ববৃহৎ প্রাসাদের নাম মাস্ক। একটা ১৬৫ ফুট লম্বা অমুচ্চ প্ল্যাটফরমের ওপর প্রসাদটা অবস্থিত। এই প্রাসাদের দশটা রুম। ইন্দোচায়না'র প্রাসাদ তৈরীর যে স্থাপত্য ও কলাকৌশল তার সঙ্গে এর হুবহু সাদৃশ্য চোখে পড়ে। মাস্ক প্রাসাদের দরজাগুলোর এবং সম্মুখভাগের যে কারুকার্য তার সঙ্গে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায় কম্বোডিয়ার প্রাসাদ শ্রেণীর ভাস্কর্য রীতি এবং শিল্পশৈলীর! কাবাহ্‌তে যে মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে সে মন্দির গাত্রে আঁকা রয়েছে নানা ধরনের সুস্পষ্ট চিত্র নকসা, প্রতিমূর্তি—মন্দির গাত্রে কোথাও একটু ফাঁক নেই—সর্বত্র অনবদ্য শিল্পসৃষ্টিতে ঠাঁসা। দেখলে অনেকে ভারতীয় মন্দির বলে ভুল করবেন। ভারতীয় মন্দিরগুলোর সঙ্গে এমনি তার সাদৃশ্য ও একাত্মতা।

চিসেন ইৎস্থা'য় (Chichen Itza) যে প্রাসাদগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর সঙ্গেও ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের অনেকটা মিল রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সে সব মন্দিরের ভাস্কর্য শিল্পের প্রধান উপাদান হলো পদ্মফুল এবং পদ্মপাতা। অনেক ক্ষেত্রে ডাঁটা শুদ্ধ পদ্মফুল গাছটা পুরো আঁকা রয়েছে মন্দিরের দেয়ালগুলোতে। জগুয়ার মন্দিরের কার্ণিশের নীচে কারুকার্য করা অংশে শিল্পচাতুর্য সহকারে সে পদ্মফুল গাছের ডাঁটা, পাতা এবং ফুল আঁকা হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার্হ।

ভারতের মতো চিসেন ইৎস্থাতেও কাল্পনিক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চারপাশে রয়েছে পদ্মফুল, পদ্মপাতা আঁকা। এছাড়া কোন মানুষের চিত্র আঁকবার

ফ্রেম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে এই পদ্মফুল। মানুষের যে চিত্রগুলো আঁকা রয়েছে তাদের আকৃতি, ভঙ্গিমা, কৌশলপূর্ণ গতিবিধি সব কিছুর সঙ্গে মিল রয়েছে ভারতীয় মন্দিরগুলোতে যে সব মানব মূর্তি আঁকা রয়েছে তাদের। অবশ্য পোষাক পরিচ্ছদ আলাদা রকমের। টোলটেক্ কার্ণিশের নীচে কারু-কার্য অংশে যে কুমুদ ফুল আঁকা রয়েছে তাকে দেখলে মনে হবে যেন দেখছি অমরাবতীর মন্দিরের সেই কুমুদ ফুলের অলংকার।

কম্বোডিয়া এবং ভারতের মন্দিরগুলোতে আরও একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। সেটা হলো একটা সামুদ্রিক দৈত্যের মুখের দুদিক থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটো পদ্মফুল গাছ। ঐ দৈত্যটার শরীরটা মাছের মতো দেখতে, কিন্তু তার মুখটা দেখতে হস্তিশুণ্ডের মতো। এই একই রকমের মূর্তি ও চিত্র চোখে পড়ে চিসেন-ইঝাতে। ভারতীয় মন্দিরগুলোতে যে ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে উপোরোক্ত সামুদ্রিক দৈত্যটার ঠিক সেই ভঙ্গিমাই চোখে পড়ে চিসেনইঝা'র মন্দির গাত্রে।

এ ছাড়া ভারতীয় মন্দিরগুলোতে দেখা যায় দেবতারা রয়েছেন আসন পিঁড়ি হয়ে উপবিষ্ট মানুষের ওপর, কিংবা উপবিষ্ট রয়েছেন বাঘ কিংবা সিংহের ওপর। হিন্দু মন্দিরের এই চিত্রশৈলিও সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে চিসেন ইঝার মন্দিরগুলোতে।

হিন্দুদের যে সূর্য-চাকৃতি (খেলবার সময় যে লোহার চাকা কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ওপর ফেলা হয় ঠিক তারই মতো দেখতে) শঙ্খ এবং বিষ্ণু মূর্তি সেগুলোকেও প্রাচীন আমেরিকার সভ্যতার কেন্দ্রভূমিতে এতো বেশী চোখে পড়ে যে মনে হয় ভারতবর্ষের সঙ্গে ছিল তাদের অচ্ছেদ্য বন্ধন।

ওখানে ছাতাও দেখতে পাওয়া যায়। এই ছাতা হলো সম্ভ্রান্ত বংশের সম্মানের প্রতীক। য়ুকাটানের চামুলটান প্রাসাদের কার্ণিশের নিম্নস্থ কারুকার্যখচিত অংশে দু রকম ছাতার চিত্র চোখে পড়ে। এই দু রকম ছাতা এখনো ভারতবাসীরা ব্যবহার করে।

ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সভ্যতার চমৎকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে জার্মাণ পণ্ডিত পিয়ারী হোনোর অনুমান করেছেন সুদূর অতীতে ভারত বাসীরা আমেরিকা জয় করে থাকবে। তবে প্রশান্ত মহাসাগরের সুবিশাল অস্তিত্বকে ডিঙিয়ে সুদূর আমেরিকায় গিয়ে পৌছানো কি ভারতবাসীদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল? পিয়ারী হোনোর দৃঢ়কণ্ঠে

বলেছেন:—হ্যাঁ, সম্ভবপর ছিল। সুপ্রাচীন পণ্ডিতদের লেখা থেকে আমরা একথা জানতে পারি যে ভারতবাসীরা নাবিক হিসেবে ছিল শ্রেষ্ঠ। তাদের ছিল বড় বড় সব জাহাজ। টোলেমি লিখে গেছেন কি ভাবে ভারতীয় অতিকায় জাহাজগুলো সগর্বে মাথা উঁচু করে মহাসমুদ্র পাড়ি দিতো। একজন আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ওয়াল্টার ক্রিক্‌বাগ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন:—কলম্বাসের অন্ততঃ এক হাজার বছর আগে ভারতবাসীরা যে জাহাজ ব্যবহার করতো তা ছিল কলম্বাসের জাহাজ থেকেও অনেক গুণ বড়। বড় বড় বিশেষজ্ঞরা তাই এখন এ বিষয়ে একমত যে কলম্বাসের অনেক আগে ভারতবাসীরা আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল।

পুস্‌কর বা আমেরিকার দুভাগ—অর্থাৎ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে যে ভারতবাসীরা অবহিত ছিল হাজার হাজার বছর আগে সে কথা পুরাণ থেকেও জানতে পারি। এমন একটা সময় ছিল যখন একটা সরল রেখার এক প্রান্তে ছিল ভারতবর্ষ এবং অন্য প্রান্তে ছিল দক্ষিণ আমেরিকা। মাঝখানে এ দুটো ভূ-ভাগকে সংযুক্ত করেছিল এক গুচ্ছ ছোট বড় দ্বীপ এবং মহাদেশ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষ দুটো আমেরিকার সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল। আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদের তাই অ্যাম্মিআনুস মার্সেলিনাস অভিহিত করছেন পূর্বভারতের ব্রাহ্মণ হিসেবে। আমেরিকার পূর্ব পুরুষেরা নাকি বাস করতেন যে ভূ-ভাগে সেটা সম্প্রসারিত ছিল কাশ্মীর থেকে সামো মরুভূমি পর্যন্ত। সুতরাং, একজন পথচারী উত্তর দিক থেকে পায়ে হেঁটে আলাস্কা উপমহাদেশে পৌছুতে পারতো—মাঞ্চুরিয়া, টার্টারি উপসাগর, কিউরাইল এবং অ্যালুউসিয়া দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দিয়ে। অপরদিকে, অন্য একজন পরিব্রাজক দক্ষিণ দিক থেকে সুরু করে শুধু মাত্র একটা ক্যানু বা ডোঙা সম্বল করে শ্যামের ওপর দিয়ে পোলিনেশিয়ার দ্বীপগুলোর ওপর দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার যে কোন অংশে পৌছুতে পারতো।

এইচ, পি ব্লাভ্যাস্কি তার সিক্রেট ডকট্রিনের তৃতীয়খণ্ডে বলেছেন:—পুরাণগুলোতে যখনই মেরুর উত্তর দিকের কথা বলা হয়েছে তখনই আদিম এল্‌ডোরাডো বা স্বর্ণ রত্নবহুল একটা স্থানের কথা বলা হয়েছে,—যেটার নাম এখন উত্তর মেরু অঞ্চল। ঐখানটাতে আজ আমরা শুধু অনন্ত বরফের

রাজত্ব দেখতে পেলেও সেখানে একদিন ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুটতো—সেখানে ছিল একটা মহাদেশ। বিজ্ঞানও বলে থাকে একটা পুরোনো মহাদেশের কথা যেটার বিস্তৃতি ছিল স্পিটসবার্জেন থেকে ডোভার প্রণালী পর্যন্ত। গূঢ় বা প্রাচীন বিদ্যা অনুসারেও—বহুপূর্বে ঐ অঞ্চলগুলো ঘোড়ার পায়ের নালের মতো একটা মহাদেশ গঠন করেছিল যার এক প্রান্ত পূর্ব দিকে নর্থ কর্ণওয়ালের আরও পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে গ্রীণল্যাণ্ড এবং বেয়ারিং (Behring) প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত আরও অন্যান্য অঞ্চলগুলো পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল, আর দক্ষিণপ্রান্তের শেষ সীমা ছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ। লেমুরিয়ার নিরক্ষিয় ভাগটা ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহাদেশটার জন্ম হয়েছিল। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম ভারতবাসীরা জানতো আফ্রিকাব কথা, আমেরিকার কথা, অ্যাণ্টার্কটিকার কথা—লেমুরিয়া এবং আটলান্টিসের কথাও। ইউরোপ মহাদেশের জন্ম'ত সে'দিনকার ঘটনা। ভারতবাসীরা নাবিক হিসেবে অতীব দুর্দান্ত ছিল এবং পৃথিবীটা চষে বেড়াতো তাব প্রমাণ পুরাণ এবং প্রাচীন ইতিহাস। ভারতীয় পুরাণের কথা যে ফেলবার নয় তার প্রমাণ ঐ পিরিরীচ মানচিত্র। ভারতীয় পুরাণে লেখা আছে বরফশূণ্য উত্তরমেরু অঞ্চল এবং একটি মহাদেশের কথা। পিরিরীচ মানচিত্রেও ঐ অঞ্চলগুলো বরফ মুক্ত।

তাহলে এটেই আমাদের মেনে নিতে হয় পিরিরীচ প্রাচ্যের (ভারত বর্ষের) যে প্রাচীন মানচিত্রগুলো হস্তগত করেছিলেন তাদের জন্ম হিমবাহযুগের আগের। মেরু অঞ্চলগুলোতে তুষার জমতে স্বরু করলো কখন? ১৯৫৭ সালে ইলিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে, এল হাউ (Hough) সাউণ্ডিং বা শব্দ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এবং কারনেগী ইনষ্টিটিউটের ডঃ ডব্লিও ডি, হ্যারী রেডিও কার্বনের সাহায্যে এ তথ্যটাই উদ্ঘাটিত করেছিলেন যে মেরুপ্রদেশ-গুলোতে তুষার জমতে শুরু করে ৬০০০ থেকে ১৫০০০ বছর আগে। মেরুপ্রদেশ অভিযানে যে সব ফরাসী বিশেষজ্ঞরা গিয়েছিলেন তাদের মতে ঘটনাটা ৯০০০ থেকে ১০,০০০ বছর আগেরকার। আমরা এটেই ধরে নিতে পারি যে অন্ততঃপক্ষে দশ হাজার বছর আগে গ্রীণল্যাণ্ড অ্যাণ্টার্কটিকার সেই রূপই ছিল যেরকমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি পিরিরীচ মানচিত্রে। যারা ১০.০০০ বছর আগে মানচিত্রগুলো এঁকেছিল তারা যে সব দিক দিয়ে খুবই সুসভ্য ছিল—পৃথিবীর সব খবরাখবর ছিল তাদের নখ দর্পণে—অর্থাৎ তাদের

ভৌগলিক জ্ঞান ছিল নিঃসন্দেহাতীত, বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে ছিল তারা খুবই উন্নত এ কথাটা মেনে নিতেই হয়।

আমেরিকার ম্যালারী সাহেব আর একটা সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন:—দশ হাজার বছর আগে এরোপ্লেন বা উরোজাহাজই যদি না থাকবে'ত ঐ মানচিত্র আঁকা সম্ভবপর হালা কি করে? আকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ না করে'ত ভূভাগের প্রকৃত রূপ দেখা সম্ভবপর নয়। ঐ মানচিত্রের দ্রাঘিমা রেখাগুলো এতো সুস্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে আঁকা যে মাত্র দু'শতাব্দী আগেও আধুনিক মানুষ সে ব্যুৎপত্তি বা দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ম্যালারী সাহেবের গবেষণা মুগ্ধ করেছে নিউ হ্যাম্পশায়ারের কীনের কীন স্টেট কলেজের প্রফেসর চার্লস হ্যাপগুডকে। প্রফেসর হ্যাপগুড ইতিপূর্বে পৃথিবীর গতি প্রকৃতির ওপর একটা বই লিখে বিশেষজ্ঞ মহলে সাড়া জাগিয়েছিলেন। সে বইটার ভূমিকা লিখে দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন তার বক্তব্যকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন। হ্যাপগুডও ম্যালারী সাহেবের পথ অনুসরণ করে মানচিত্রগুলো নাড়া চাড়া করে দেখলেন। তিনি প্রমাণ করে দিলেন মানচিত্রগুলোর প্রাচীনত্ব। তিনি বললেন—সেই প্রাচীন যারা এঁকেছে মানচিত্রগুলো তারা যদি আকাশে উড়তে না পারতো তাহলে কি তারা পৃথিবীর এবং তার মহাদেশগুলোর মানচিত্র আঁকতে পারতো? পিরিরীচ মানচিত্রে অ্যাণ্টার্কটিকার যে চিত্র দেখানো হয়েছে তার যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত রায় দিলেন বোস্টন কলেজের ওয়েস্টন পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের ডাইরেক্টর ড্যানিয়েল এল. লোনচেন। পিরিরীচ মানচিত্রে আণ্টার্কটিকা ছাড়াও আমাজান নদী, ভেনেজুয়েলা উপসাগর, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতিকেও দেখানো হয়েছে।

আরও কয়েকটা মানচিত্রের কথা বলছি:—১৫৫৯ সালে আঁকা তুরস্কের হাজী আহম্মদের একটা মানচিত্রে আমরা দেখতে পাই এ্যাণ্টার্কটিকা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী উপকূল এবং তা খুবই নিভুলভাবে আঁকা। কিন্তু এই মানচিত্রে আরও একটা কিছু আছে যা আমাদের পুরাণের সেই কাল্পনিক গল্পটাকে সত্য প্রতিপন্ন করে—যখন ভারত মঙ্গোলিয়া থেকে পায়ে হেঁটে আমেরিকায় যেতে পারতো এশিয়ার মানুষ।

ঐ মানচিত্রে আঁকা রয়েছে সাইবেরিয়া এবং আলাস্কা সংযোগকারী একটা

নাম না জানা ভূ-ভাগ—যেটা দুটো ভূ'ভাগের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন রচনা করেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে ঐ সেতুটা বেয়ারিং প্রণালীতে তলিয়ে গেছে ৩০, হাজার বছর আগে। তিরিশ হাজার বছর আগেরকার কোন সুসভ্য সভ্যতা এই মানচিত্রের জন্ম দিয়েছিল যারা জানতো সাইবেরিয়ার আলাস্কার এই ভূ-ভাগটার কথা? আর আমাদের পুরাণকারেরাইবা তা জানলেন কি করে? পুরাণকারেরা যা লিখে গেছেন তা সব গাঁজাখুরি কল্পনা মাত্র নয় তাহলে!

১৮৩০ সালের জেনো মানচিত্র ভেনিসবাসীরা যে গ্রীণল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিল তারই সাক্ষ্য বহন করছে। নরওয়ে, সুইডেন ডেনমার্ক, জার্মাণী এবং স্কটল্যাণ্ডের উপকূলভাগ আঁকা রয়েছে সেখানে। এই মানচিত্র এতো নির্ভুল যে বিস্মিত হতে হয়। এই মানচিত্রে আছে আরও কতকগুলো দ্বীপপুঞ্জের কথা—যেগুলোর অক্ষাংশের অতি সুস্পষ্ট উল্লেখও রয়েছে সেখানে। কিন্তু, ঐ দ্বীপপুঞ্জগুলো'ত এখন নেই। তাহলে ঐ দ্বীপপুঞ্জগুলো যখন ছিল তখনকার মানচিত্রের একটা অনুলিপি মাত্র ১৮৩০ সালের উক্ত মানচিত্রটা।

টোলেমীর মানচিত্রগুলোও আবার নতুন করে আঁকা হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। সে সব মানচিত্র থেকেও জানা যায় গ্রীণল্যাণ্ড সম্পূর্ণরূপে তুষারাবৃত ছিল না। তখন সুইডেনেও গ্ল্যাসিয়ারের রাজত্ব চলছিল। টোলেমির সময় সুইডেনে গ্ল্যাসিয়ারের চিহ্নমাত্র ছিল না—পঞ্চদশ শতাব্দীতে বা আমাদের এ যুগে গ্ল্যাসিয়ার থাকার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু. এখন যদি সুইডেনে আবার গ্ল্যাসিয়ারের রাজত্ব শুরু হয় তাহলে তার যে রূপ আমরা দেখতে পাবো টোলেমির মানচিত্রেও সুইডেনের এই একই রূপ দেখতে পাচ্ছি আমরা। সুতরাং, টোলেমিও যে তার মানচিত্রগুলো প্রাচীন সূত্র থেকে যোগাড় করেছেন, সেগুলোর অনুলিপি তৈরী করেছেন এই কথাটা সহজ ভাবে বলা চলে। বিশেষজ্ঞদের মতে টোলেমির মানচিত্রগুলোও পনের থেকে দশ হাজার বছরের প্রাচীন।

এই সব মানচিত্রগুলো যে অতি প্রাচীন তার আর একটা প্রমাণ—গুয়াজ্যাল-কুইভার ব-দ্বীপ ঐ মানচিত্রগুলোতে চোখে পড়ে না। কিন্তু সেই ব-দ্বীপটা এখন কয়েক শত বর্গমাইল বিস্তৃত। বিশেষজ্ঞদের মতে এ ব-দ্বীপ সৃষ্টি করতে কম পক্ষে একটা নদীর লেগেছে কুড়ি হাজার বছর।

আমরা আরও দেখতে পাই—ভূমধ্য সাগরের দ্বীপগুলো ঐ মানচিত্র

গুলোতে আরও অনেক বড় করে আঁকা। কিন্তু, এই দ্বীপগুলোর সেই মহিমা আর নেই। বিশেষজ্ঞদের অনুমান ঐ দ্বীপগুলোর যে রূপ আঁকা আছে মানচিত্রগুলোতে তাদের সেই অক্ষত রূপ ছিল আজ থেকে প্রায় ২০ থেকে ৩০ হাজার বছর আগে।

এই মানচিত্রগুলো থেকে দেখা যায় তখন সুইডেন, জার্মাণ. ইংল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ডেও গ্ল্যাসিয়ারের রাজত্ব ছিল। বিশেষজ্ঞদের অনুমান এ সব দেশে গ্ল্যাসিয়ার ছিল দশ হাজার বছর আগে।

অতএব এই মানচিত্রগুলো যে দশ হাজার বছর থেকে কুড়ি ত্রিশ হাজার বছরের পুরোনো এ কথাটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন? কুড়ি ত্রিশ হাজার অন্যূন দশ হাজার বছর আগেও যে পৃথিবীতে অতি আধুনিক সভ্যতা বিরাজ করছিল তার অকাট্য প্রমাণ এই মানচিত্রগুলো। মানচিত্রগুলোর নিখুঁত এবং প্রণালীসম্মত স্থান বিবরণ দেখে মনে হয় তারা ফটোগ্রাফি বা ছবি তোলার বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং তাদের ছিল উড়ন্ত বা হাওয়াই জাহাজ।

এ প্রসঙ্গে আমি আরও কতকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করছি।

খৃঃ পূ ৫০০ শতাব্দীতেও ইউরোপে এমন একটা উপাখ্যান প্রচলিত ছিল যে উপাখ্যান থেকে জানা যায় আটলান্টিকের অপর পাড়ে বিরাট একটা মহাদেশের কথা। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এই মহাদেশটার কথা শুধু মুখে মুখেই ঘুরে বেড়াত না, কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে লিখিত বিবরণও রেখে যাবার চেষ্টা করেছেন। তারা ঐ মহাদেশটার নাম দিয়েছিলেন আল্‌টিমা থিউল। ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যটক এবং ভূ-তত্ত্ববিদ পসানিয়াস লিখেছিলেন আটলান্টিকের ও পাড়ে কতকগুলো দ্বীপের কথা যেগুলোতে বসবাস করে লাল চামড়া-ওয়ালা, ঘোড়ার মতো শক্ত কালো চুলওয়ালা লোকেরা। এ'তো আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদেরই বর্ণনা। কলম্বাসের দেড় হাজার বছর আগের মানুষ কি করে জানতে পারলো আমেরিকার কথা?

ইউরোপে একটা জনপ্রিয় গুজব প্রচলিত ছিল:— মেরুপ্রদেশে বাস করে কিম্ভূত কিমাকার এক প্রকার প্রাণী। তাদের গলা বলতে কিছু নেই, তাদের মুখগুলো বুকের ওপর, তাদের আছে মস্তো বড়ো বড়ো পা, যেগুলো সূর্যের আলোক থেকে পর্যন্ত আড়াল করে রাখে তাদেরকে।

ইউরোপের সহজ সরল লোকগুলো এ ধরণের আজগুবি প্রাণীর কথা বিশ্বাস করলেও শিক্ষিত লোকেরা কিন্তু এ ধরণের প্রাণীর কথা উর্বর মস্তিস্কের কল্পনাপ্রসূত বলে উপহাসই করতো। কিন্তু, ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রীণল্যাণ্ড আবিস্কৃত হলো। উপাখ্যানের সেই সব কিম্ভূত-কিমাকার দৈত্যদেরকে ইউরোপবাসীরা চিনতে পারলো—ওরা হলো বাফিন উপসাগরের পশমের পোষাক পরিহিত, বরফ-জুতো পরিহিত এস্কিমোরা। এই আবিস্কারের পর শিক্ষিত আধুনিক মনোভাবাপন্ন লোকেরা যেন চমকে উঠলো:—হ্যাঁ, তাইতো, প্লেটোও'ত তার একটা অসমর্থণীয় সংলাপে এমন একটা দেশের কথা বলেছেন যেখানকার লোকেরা একসঙ্গে ত্রিশদিন ধরে শুধু সূর্যের আলোকে সিক্ত হয়,—রাত দিন বলতে সেখানে কিছু থাকে না। এ সময় দিগন্তরালে সূর্য কেবল একটি ঘণ্টার জন্যে ডুব দেয়। প্লেটো এবং তার সমসাময়িকেরা কি করে অনাবিষ্কৃত মেরুপ্রদেশের কথা জানতে পেরেছিলেন?

অ্যাণ্টার্কটিকা মহাদেশ আবিস্কৃত না হওয়ার আগেও প্রথম দিকে বাঘা বাঘা ভূ-তত্ত্ববিদদের ধারণা ছিল দক্ষিণী মহাসাগরের তুষার ঝড় এবং বরফ খণ্ডের ওপারে যে টুকরো টুকরো ভূ-ভাগ চোখে পড়ে সেগুলো কতকগুলো দ্বীপ। যেহেতু উত্তর মেরু একটা মহাসাগর—খণ্ড খণ্ড ভাসমান তুষারখণ্ডে আবৃত, সেহেতু এটেই সন্দেহাতীত ভাবে স্বাভাবিক যে বিপরীত মেরু প্রদেশেও এরকম একটা মহাসাগরের অস্তিত্ব থাকবে। কিন্তু, নাবিকদের যে সব উপাখ্যান সেগুলো বার বার দাবী করে এসেছে—না, ওখানে রয়েছে একটা সুবিস্তৃত মহাদেশ। নাবিকেরা ঐ মহাদেশটা সম্বন্ধে জানতে পারলো কি ভাবে? এতো বেশী ঠাণ্ডা জায়গা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। মেরু প্রদেশের দু'হাজার মাইলের মধ্যে নেই কোন জনবসতি কিংবা গাছপালা। আজ পর্যন্ত, দুটো মাত্র অভিযাত্রী দল তার কাছাকাছি যেতে পেরেছে। চার হাজার মাইল বিস্তৃত উপকূলের ধারে কাছেও এখনো পর্যন্ত কোন মনুষ্যবাহী জাহাজ যেতে পারেনি। আজ পর্যন্ত মানুষ এই মহাদেশের শতকরা এক ভাগ মাত্র অংশে পা রাখতে পেরেছে। অথচ, সমগ্র ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার আয়তনের সমান এই মহাদেশটার যে অস্তিত্বের কথা আমরা নাবিকদের থেকে জানতে পারি তা যে অক্ষরে অক্ষরে ঠিক তা এখন ষোল আনা উপলব্ধি করতে পারছি আমরা।

যে সময় পৃথিবীর মানুষ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কথা জানতোই না সে সময়ও বিভিন্ন উপাখ্যানে এই অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের নাম শোনা যেতো:— ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দক্ষিণ দিকে অনেক দূরে' রয়েছে একটা মহাদেশের অস্তিত্ব। শেষ পর্যন্ত উপাখ্যানের কথাই সত্যি হলো। ১৬৪২ শতাব্দিতে আবেল ট্যাসমান বললেন বিরাট একটা ভূ-ভাগের কথা। কিন্তু, 'টেরা্যা অস্ট্রেলিশ ইন্‌কগনিটার' রহস্য উন্মোচিত হলো ১৭৭৫ শতাব্দীতে কাপ্তেন জেম্‌স কুকের আবিষ্কারের পর।

একটা উপাখ্যানে প্রচলিত ছিল— নিরক্ষিয় বৃত্তের কোথাও এমন একটা দেশ আছে যেটা খুবই ভয়াবহ। সেখানে সূর্যের উত্তাপ এতো বেশী যে সেখানকার অধিবাসীরা চিরদীনের মতো কালো হয়ে যায়। কিন্তু উপাখ্যানের এই দেশটার কথা তখনকার দিনের যুক্তি বুদ্ধি সর্বস্ব বিজ্ঞলোকেরা বিশ্বাস করেনি। এমনকি, আফ্রিকার নিগ্রোদের কথা সর্বপ্রথম যখন আধুনিক পৃথিবী শুনেছিল তখনো সভ্য মানুষ সে কথাকে আমল দিতে পারেনি সহজে।

এ ধরণের প্রাচীন উপাখ্যানগুলো দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে পিরিরীচ মানচিত্রকে। পিরিরীচ মানচিত্র এমন একটা লুপ্ত সভ্যতার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করছে যে সভ্যতার নখদর্পনে ছিল এ পৃথিবীর সব খুঁটি নাটি তথ্য -অর্থাৎ তার ভৌগলিক জ্ঞান ও পরিধি আধুনিক সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।

হাজার হাজার বছর, হয়তো লক্ষ বছর আগের এই সু-উন্নত মানব সভ্যতার স্মৃতি ধরে রেখেছিল উপরোক্ত এই উপাখ্যানগুলো।

কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকেরা, বৈজ্ঞানিকরা কি বলে থাকেন? আমাদের ছাত্ররা পাঠ্য পুস্তকে কি পড়ে থাকে? ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে প্লিসটোসিন যুগের শুরু দশ লক্ষ বছর আগে এবং শেষ দশ হাজার বছর আগে—ঐতিহাসিকদের হিসেব মতে ৮০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে। ঐ সময় পৃথিবীর শেষতম তুষার যুগের ইতি। এই হিসেব থেকে এ কথাটা অনুমান করা যায় তখন পৃথিবীর বুকে সভ্যতার চরমোৎকর্ষতা লাভের কোন সুযোগই ছিল না। তখন পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল শীতল—এখনকার চেয়ে পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল অনেক বেশী ঠাণ্ডা। এখন, অসট্রেলোপিথেকাস নামে বানরের মতো দেখতে এক প্রকার জীব পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল দশ লক্ষ বছর আগে। বৈজ্ঞানিকদের

কারুউ কারুউ মতে এই অসট্রেলোপিথেকাস মানুষের পূর্ব পুরুষ। কিন্তু, অনেক বৈজ্ঞানিকই অসট্রেলোপিথেকাস থেকে যে মানুষের জন্ম এ কথাটা মানতে চান না। তাদের মতে অসট্রেলোপিথেকাসকে মানুষ বলে চেনবার জো নেই। তাহলে মানুষের মতো দেখতে প্রাণীরা অবতীর্ণ হলো কবে জীবনের রঙ্গমঞ্চে? পাঠ্য পুস্তকের মতে:—তুষার যুগের শেষ হবার অনেক আগেই ঘটেছিল তাদের আবির্ভাব। তবে তুষার যুগ শেষ হবার আগে বাস করতো নিয়ান-ডারথাল এবং ক্রো-ম্যাগনান মানব। ওরা ছিল গুহা মানব। সভ্যতার আলোকের আভাটুকুই ওরা দেখতে পায়নি, সভ্যতার আলোকে 'অবগাহন করবে সে' ত অনেক পরের কথা। একমাত্র তুষার যুগ শেষ হবার পরেই মানুষের সামনে সভ্যতার আলো ফুটে উঠতে থাকে একটু একটু করে। দশ হাজার বছর আগে যে শিশু সভ্যতার জন্ম সেইই সবে চন্দ্র বিজয় করে ফিরলো; সে শিশু সভ্যতা আজ শুধু পরিণতই নয়, আকাশ বিজয়ী। কিন্তু, উপরোক্ত পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ এবং মানচিত্রগুলো কি সাক্ষ্য দেয়? তারা'ত সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলে। তারা আধুনিক সভ্যতাগর্বী মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, পৃথিবীর বুকে তোমরাই যে এক মাত্র সভ্য প্রাণী, উন্নত প্রাণী, আকাশবিজয়ী প্রাণী তা'ত নয়। তোমাদের সঙ্গে তুলনায় নিকৃষ্ট নয় এমন অনেকগুলো সভ্যতার জন্ম হয়েছে ইতিপূর্বে পৃথিবীর বুকে।

এমনকি নিউটনেরও বিশ্বাস তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পুনঃরাবিষ্কার করেছেন মাত্র। তিনি'ত বার বারই বলতেন:—আমি যদি সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী কিছু জেনে থাকি'ত দেখে থাকি'ত দৈত্যদের (অর্থাৎ তাঁর চেয়ে আরও বেশী গুণী জ্ঞানী প্রতিভাধর লোকদের) ঘাড়ের ওপর ভর করেই। (If I have seen further, said Newton, it is by standing on the shoulders of giants)।

নিউটন স্বয়ং এ কথাটা কেন বলে গিয়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমাদেরকে তাঁর সমসাময়িক বন্ধু ওট্টারবুরি মহাশয়ের স্মরণ নিতে হয়। তিনি লিখে গেছেন, 'বিনয় আমাদেরকে শিক্ষা দেয় অতীতের ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে থাকতে, বিশেষ করে আমরা যখন সঠিক জানি না তাদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে। নিউটন জানতেন (বলতে গেলে মুখস্তই করে রেখেছিলেন ঋষিদের জ্ঞানসূত্র ও বাণী) তাঁদেরকে

এবং তাঁদের প্রতিভা, জ্ঞান- ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন বলেই তিনি ওসব প্রাচীন ঋষিদের শ্রদ্ধা করতেন ভগবানের মতো। কারণ, তাদের জ্ঞানের আকর যে সব গ্রন্থ নিউটন যোগাড় করতে পেরেছিলেন সেগুলো অধ্যয়ন করে তিনি একথাটাই বুঝেছিলেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের আবিষ্কার ছিল আধুনিক যুগের আমাদের চেয়েও চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। প্রাচীন জ্ঞানের আকর গ্রন্থ পুস্তকগুলোর সিকি ভাগের অর্ধেকও আমাদের জন্যে রক্ষিত নেই। থাকলে আমাদের নিত্য নতুন আবিষ্কার সব তাদের কাছে ম্লান হয়ে যেতো।' (৯৫)

মানব-সভ্যতার ক্রমঃবিবর্তনেবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিশ্রুত মনীষীদের এসব স্বীকারোক্তি আমার (যে কলম ধরেছে ক্রমঃবিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবার জন্যে) হাতে কি পাশুপাত অস্ত্রের মতো অমোঘ অস্ত্র নয় ?

মানুষের পূর্বপুরুষ অন্যগ্রহের মানুষ !

মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে যেমন ক্রমোন্নতি বা ক্রমঃবিবর্তনবাদের কথা খাটে না, তেমনি মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ক্রমঃবিবর্তনবাদ খাটছে না। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি মানুষের জন্ম পশুর থেকে নয়। মানুষের জন্ম দেবতার হাতে। মানুষ দেবতা কিংবা গ্রহান্তরের মানুষদের বংশধর। অনেকেই হয়তো আমার কথা শুনে চমকে উঠবেন। যেটা কিনা বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত তার বিরুদ্ধেই আমি রুখে দাঁড়াচ্ছি। বলছি, না, তা নয়। প্রশ্ন তুলবেন হয়তো, ক্রমঃবিবর্তনবাদটা খাঁটি না হয়'ত বৈজ্ঞানিকেরা তাকে অতো অভ্রান্ত বলে মেনে নিলেন কেন? ক্রমঃবিবর্তনবাদটাকে জগতের প্রতিথযশা সব বৈজ্ঞানিকরাই নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছেন তা নয়। না নিয়েও উপায় নেই তাই। মন্দের ভালো এই আর কি। কারণ কুমোরটুলির মৃৎশিল্পিরা যেমন করে বিভিন্ন রকম অনিন্দসুন্দর মূর্তি তৈরী করেন ভগবানও সে রকম ভাবে নিজের হাতে মানুষ তৈরী করেছেন—'এ কথাটা' বৈজ্ঞানিকেরা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু মানুষ তো অন্য গ্রহ থেকে নেবে আসতে পারে।

আমার এই দৃষ্টি ভঙ্গির বৈজ্ঞানিকত্ব স্ব-প্রমাণিত হবে যদি ক্রমঃ বিবর্তনবাদটাকে আমি বিজ্ঞানের সাহায্যে অবৈজ্ঞানিক অগ্রহণ-যোগ্য হিসেবে প্রমাণিত করিতে পারি। তাই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকুই আপনাদের শুভেচ্ছা নিয়ে হাতে নিচ্ছি।

প্রথমে চলুন একটু হাসাহাসি করি। তবে যুক্তিতর্কের সাহায্যে। ক্রমঃবিবর্তবাদীরা যে সব যুক্তি দেখিয়েছেন সেগুলোর কথাই আমি বলছি। ক্রমঃবিবর্তনবাদীরা তাদের মৃতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সিরোলজি বা রক্ত পরীক্ষার সাহায্য নিয়েছেন। তারা বলতে চান—একটা কুকুরের রক্ত একটা ঘোড়ার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দাও সেটা মারা যাবে. কিন্তু একটা মানুষের রক্ত দাও বানরের শরীরে ঢুকিয়ে সে যাবে না মরে। এর থেকে কি এ সিদ্ধান্তই নেয়া যায় না যে মানুষ আর বানর রক্তের বাঁধনে বাঁধা, কিন্তু কুকুর ও ঘোড়া তা নয়। কিন্তু, বিশেষজ্ঞদের মতে কুকুরের রক্ত অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে মারাত্মক তাই ঘোড়া মারা যায়—এক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্কের কোন প্রশ্নই উঠছে না। ভেড়া, ছাগল এবং ঘোড়ার রক্ত কিন্তু এদিক দিয়ে

মারাত্মক নয়। এদের একের রক্ত অন্যের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে কোন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

বি. সি. নেল্‌সন্ রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে বিভিন্ন প্রাণীর রক্তের ঘনত্ব আবিষ্কার করেছেন এভাবে:—মানুষের রক্তের ঘনত্ব ১০৫৯, শূকর এবং খরগোসের ১০৬০, ব্যাঙের ১০৫৫-৫৬; সাপের ১০৫৫ এবং বানরের ১০৫৪.৯। এই তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাঙ এবং সাপই মানুষের সঙ্গে নিকটতম রক্তের সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছে। তবে শূকরই আমাদের সব চেয়ে নিকটতম আত্মীয়। বানর এদিক দিয়ে আমাদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তবে কি শূকরের থেকেই মানুষের জন্ম? এ বিষয়ে দস্তুর মতো গবেষণা করেছিলেন ইউনিভার্সিটি অব লণ্ডনের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি প্রাপ্ত একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ। পরীক্ষা ছাড়াও তিনি আরও কতকগুলো প্রমাণ দেখিয়েছিলেন যা থেকে এটাই আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে শূকরই মানুষের নিকটতম আত্মীয়। (৬২)

আর একটা কথা। রক্ত পরীক্ষাই যদি ক্রমঃবিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হতে পারে দুধ পরীক্ষা নয় কেন? এদিক দিয়ে কিন্তু আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী গাধা। তাহলে মানুষের জন্ম কি গাধা থেকে? আমি কাউকে অবশ্য আক্রমণ করতে বা আঘাত দিতে চাইছি না। প্রশ্নগুলো পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি মাত্র।

আরও একটা প্রশ্ন তুলছি:-- ফিলাডেলফিয়ার ইমারিটাস্ অব্ জেফারসন্ কলেজের প্রফেসর ডঃ ডব্লিউ. ডব্লিউ কিন্ লিখেছেন (৬৩):—পশুর কণ্ঠ দেশের মাংসগ্রন্থি মানুষের রোগের প্রতিশেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পশুর কণ্ঠদেশের মাংসগ্রন্থি মানুষের কণ্ঠদেশের মাংসগ্রন্থির মতো কাজ করে। তবে মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্যে এ ক্ষেত্রে ভেড়ার কণ্ঠদেশের মাংসগ্রন্থি খুবই কার্য্যকর। তাহলে কি আমরা এখানে এ প্রশ্নটা তুলতে পারি না ভেড়াও মানুষের সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়?

মোট কথা রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে মানুষের জন্ম যে বানর থেকে একথাটা প্রমাণিত হয় না। আরও একটা ব্যাপার দেখুন:—রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে দেখা যায় উটপাখী এবং ময়ূরের রক্তের সঙ্গে হায়না এবং চিতা বাঘের রক্তের চমৎকার মিল। তাহলে কি আমাদের এই সিদ্ধান্তই নিতে হয় যে চিতাবাঘ ও হায়নার সঙ্গে রয়েছে উটপাখী ও ময়ূরের সম্বন্ধ!

আচ্ছা আপনাদের মনে কি এই প্রশ্নটা জাগে না মানুষের জন্ম যদি বানর থেকে হয় তাহলে বানরের মত তার শরীরটা লোমাবৃত নয় কেন? মানুষের শরীরটা পশুর থেকে অত আলাদা রকমের সুন্দর তকৃতকে চক চকে হলো কি করে? ডারউইন অবশ্য একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার ব্যাখ্যা হলো এই:—নারীরা কম লোমওয়ালা পুরুষকেই পছন্দ করে। সুতরাং সুন্দরী নারীর প্রিয় হবার জন্যে পুরুষ নিশ্চয় কম লোমাবৃত হবার ক্লান্ত বাসনা পুষতে লাগলো মনে। এই ভাবে ধীরে ধীরে বংশানুপরম্পরায় পুরুষ লোমহীন হয়ে পড়ল। কারণ যে লোমওয়ালা সে বিয়ে করার জন্যে কোন নারী পাবে না। বিয়ে যদি করতে না পারে তবে বংশ রক্ষা হবে কি করে? অপর দিকে যার লোম নেই সে নারী প্রিয় এবং তার বংশেরও বাড বাড়ন্ত। কিন্তু নারী বানরের কি লোম নেই? নারী বন-মানুষের হয় তো লোম আগে ছিল না, এখন হয়েছে। সে জন্যেই কি আদি নারীর শরীর লোমাবৃত ছিল না? আচ্ছা, ফ্রেনোলজি কি বলে? আমরা যুগ যুগ ধরে জেনে আসছি মার গুণ পাবে ছেলে আর বাবার গুণ পাবে মেয়ে। সুতরাং ডারউইনের ব্যাখ্যানুসারে মেয়েদেরই লোমহীন হবার কথা, ছেলেদের অর্থাৎ পুরুষদের নয়।

পুরুষের শরীরে লোম নেই? আছে বিশেষ বিশেষ জায়গায়। প্রত্যেক পুরুষের থাকে কেশর দাঁড়ি গোঁফ, কিন্তু মেয়েদের এসব নেই কেন? বৈজ্ঞানিকেরা কি ব্যাখ্যা দেবেন তার? বানর, বন-মানুষের পিঠে প্রচুর লোম। কিন্তু বুকে নেই একটুও। মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার। পিঠে নেই কিন্তু বুকে আছে। কি কারণ আমি তা জানি না। ক্রমঃবিবর্তনবাদীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন কিনা জিজ্ঞেস করে দেখুন।

হাস্যকর কয়েকটা যুক্তির কথা শুনলেন। এবার চলুন ক্রমঃবিবর্তনবাদীরা যে সব গুরুতর যুক্তির অবতারনা করে থাকেন সেগুলোর আলোচনা করি।

হিমবাহ যুগে মানুষের জন্ম-সূত্র রচনা করেছিলেন বিবর্তনবাদীরা এভাবে:—বানর জাতীয় কোন প্রাণী পরিণত হলো বন-মানুষ জাতীয় প্রাণীতে; বন-মানুষ জাতীয় প্রাণী পরিণত হলো নীয়ানডারথাল নামক প্রাণীতে; কালক্রমে এই নীয়ানডারথাল নামক প্রাণী থেকেই আধুনিক আকৃতির মানুষের উদ্ভব। মোটকথা, মানব-জাতীর উদ্ভবের প্রাক্কালে এমন এক জাতীয়

প্রাণী (সিম্পাঞ্জী, গেরিলা প্রভৃতি) তার পূর্বপুরুষ ছিল যার ছিল শক্ত সু-উচ্চ পৃষ্ঠদেশ, পশ্চাদগামী কপাল, ছোট্ট মস্তিষ্ক, সু-উচ্চ অসম নাক ও মুখ, বাঁকানো মেরুদণ্ড ইত্যাদি। আজ থেকে ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে এই অনুমানটার পেছনে ছিল সে সময়কার আবিষ্কৃত ফসিল বা জীবাশ্মগুলোর জোরালো সমর্থন। কিন্তু গবেষণা স্তব্ধ হয়ে থাকে না। এর মধ্যে আরও অনেকগুলো জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো উপরোক্ত সহজ সরল ব্যাখ্যা-টাকে সমর্থন করছে না। প্রথমতঃ, যে সুপ্রাচীন বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব ঘটে থাকবে তাদের উপরোক্ত সু-উচ্চ শক্ত পৃষ্ঠ দেশ, পশ্চাদগামী কপাল ছোট্ট মস্তিষ্ক সু-উচ্চ অসম নাক ও মুখ বাঁকানো মেরুদণ্ড প্রভৃতি নেই। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে আবিষ্কৃত প্লিসানথ্রোপাস এবং প্যারান-থ্রোপাস জাতীয় প্রাণীদেরও রয়েছে সোজা মেরুদণ্ড এবং মানুষের মতো অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এরা যারা বাস করতো টাশ্যারী যুগের শেষ ভাগে কিংবা কোয়র্টারনারী যুগের প্রারম্ভে তাদের কপাল ছিল অনুন্নত। এভাবে দেখা যায় মানুষের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে এনথ্রোপাস গ্রুপ বা বানর শ্রেণীর প্রাণীদের এমন কি নীয়ানডারথাল গ্রুপের প্রাণীদের কোন সাদৃশ্য নেই। এ ছাড়া এমন আরও কতকগুলো উল্লেখযোগ্য চমকপ্রদ জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছে। এর ফলে উপরোক্ত 'থ্রি-স্টেজেস্ হাইপথিসিস বা 'তিন পর্যায়'-অনুমানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

S. A Sieber তাই বলেছেন :—Early evolutionistic speculations about semi-human development of ancient man were purely subjective and false·········that modern type of man is as old as any of the crudest human fossils, that evolution was not in a straight line but was disharmonious. That crude and modern traits occurred, in what remains for scientists an inexplicable tangle. তাই প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ স্টিফেন ফিউস বলেছেন :—

···palaeontological evidence is, in specific cases (that of the horse for instant), so great as to be justifiably called scientific proof. Even here the descent of one

organic form from another has not been actually observed, but it is legitimately inferred, as are most of the reliable data of history. As regards the highest groups (types), the fact of evolution from one type to another is purely hypothetical, for all factual evidence is absent.

অর্থাৎ, বিশেষ কোন প্রাণী থেকে বিশেষ কোন প্রাণীর উদ্ভবের কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এসব বৈজ্ঞানিকদের অনুমান মাত্র। আর মানুষের মতো উচ্চতর প্রাণীদের কথা বলতে গেলে, ক্রমঃবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কোন বিশেষ বিশেষ প্রাণীর থেকে মানুষের উদ্ভব এ তথ্যটাও পুরোপুরি অনুমান নির্ভর। এ ক্ষেত্রে বাস্তব-নির্ভর কোনরূপ প্রমাণ অনুপস্থিত।

আসুন, এসম্বন্ধে আরও বিশদভাবে অলোচনা করবার চেষ্টা করি।

মানুষের পূর্বপুরুষ হিসেবে বৈজ্ঞানিকেরা হাযির করেছেন পিথেক্যানথ্রোপাস, হীডেলবাগ, পিল্টডাউন এবং নিয়ানডারথাল নামক ৪টি প্রাণীর কঙ্কাল এবং মাথার খুলি। কোন বৈজ্ঞানিক বলছেন :—পিথেক্যানথ্রোপাস থেকে হীডেলবাগ মানুষের জন্ম. হীডেলবাগ থেকে পিল্টডাউন মানুষের জন্ম এবং পিল্টাডাউন মানুষের থেকে নীয়ানডারথাল মানুষের জন্ম। অন্যান্য কয়েকজন আবার বলেছেন :—না না, তা নয়. মানুষের ৪টি বংশধরদের প্রতিনিধিত্ব করছে এরা। একটা বিশেষ ধরনের বানর বংশের শেষ বংশধর পিথেক্যানথ্রোপাস, হীডেলবাগ তার পরবর্তী মনুষ্য বংশের শেষ বংশধর; পিল্টডাউন এবং নীয়ানডারথালও একই ভাবে এক একটা লুপ্ত মানব বংশের শেষ বংশধর। এখন প্রশ্ন হলো এই এরাই যদি ক্রমঃবিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি হওয়ার প্রত্যেকটা পর্যায়ের শেষ বংশধর হয়ে থাকে তাহলে তাদের বংশধরেরা আসলো কোত্থেকে? হীডেলবাগ বা নীয়ানডারথালরাও কোন বংশধর রেখে যায়নি। তবে? এইচ. জি. ওয়েলস্ তাই তার 'আউটলাইন অব হিস্ট্রিতে' (পৃঃ ৬৯) বলেছেন :—আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে পিথেক্যানথ্রোপাস থেকেই মানুষের জন্ম হয়েছে।

ডারউইন নিজেও স্বীকার করেছেন :—আমরা যখন তন্ন তন্ন করে খুঁজি তখন কিন্তু এটুকু প্রমাণ করতে পারি না যে কোন বিশেষ ধরনের জীব জন্তুর বহিরাকৃতিতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। "When we

descend to details, we can prove that not one species has changed."

পিথেক্যানথ্রোপাস, হীডেলবাগ পিল্টডাউন এবং নীয়ানডারথাল এই বিশেষ ৪ রকমের প্রাণীর মধ্যে যদি কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না ঘটে থাকে 'ত মানুষের জন্ম হলো কি করে? অথবা বানর থেকে মানুষের জন্ম হলো কি করে?

বৈজ্ঞানিকদের হিসেব মতে হীডেলবাগ-মানব বেঁচেছিল আজ থেকে দুলাখ বা তিন লাখ বছর আগে। এই অসংখ্য বছরগুলোতে নিশ্চয় কোটি কোটি নর বানর (ape-man) বেঁচে থাকবে। কিন্তু তারা কোথায়? বানর আর মানুষের মাঝামাঝি পর্যায়ের যে প্রাণী তাদের-কঙ্কাল কোথায় পাওয়া গেছে? তাহলে আদৌ কোন নর বানর ছিল না? অর্থাৎ বানর থেকে নরের সৃষ্টি হয়নি?

এইচ, জি, ওয়েল্‌সের মতে সোলিউটারের মুক্ত শিবিরে নাকি প্রতি বছর অসংখ্য ঘোড়ার সমাবেশ হতো। এই জায়গাটা খনন করে এক লক্ষ ঘোড়ার কঙ্কাল পাওয়া গেছে। নর বানরের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে একসঙ্গে অতগুলো নর বানরের কঙ্কাল এক জায়গায় পাওয়া যাবে না কেন? ডঃ আলেস্ক হার্ডলিকার (Hrdlickar) বলেছেন, অন্য একটা জায়গায় পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ২০০,০০০ ঘোড়ার কঙ্কাল। তাই প্রশ্ন ওঠে বৈজ্ঞানিক হিসেব মতে ৭৫০০০০ বছর ধরে যে কোটি কোটি নর বানর এবং নর বানরী বেঁচেছিল পৃথিবীর বুকে তারা গেল কোথায়? কোথায় তাদের চিহ্ন? কোটি কোটির জায়গায় মাত্র চারটি। তাও আবার পূর্ণকঙ্কাল নয়। ঐ কঙ্কালের কোন অংশটা যে বানরের আর কোনটা যে মানুষের তাও বুঝে ওঠা মুশকিল।

অ্যানথ্রোপলজি বা মানুষের বিজ্ঞান কি কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে? তারা শুধু অনুমান করছে। দৃঢ়ভাবে কিছু সমর্থন করতে পারছে না। উদাহরণ স্বরূপ আমি পিল্টডাউন মানুষের কঙ্কালের কথা বলছি। এই কঙ্কাল নিয়ে সে কী হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। এই কঙ্কালটা যার বৈজ্ঞানিকেরা তার নাম দিলেন ইওয়ানথ্রোপাস বা প্রত্যুষ মানব। তার সময় দুলক্ষ বছর। কিন্তু মহাকালের কী নির্মম পরিহাস। শেষ পর্যন্ত আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেল পিল্টডাউনের যে নমুনা সেটার মধ্যে আছে

প্রবীন কঙ্কাল—তার সঙ্গে একটা বানরের দেহের কিছু অংশ যে বেঁচেছিল একশ বছর আগে কিংবা তারও আগে অথবা তারও কিছু পরে। মানুষের জন্মের ইতিহাস নিয়ে কি তামাশা, কী চাতুরী ; কী প্রতারণা! বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক মহল শেষ পর্যন্ত পিল্টডাউন কঙ্কালটাকে নিজেদের গবেষণাগার থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন দূরে। অ্যানথ্রোপোলজিস্ট বা নৃতত্ত্ববিদরা'ত তার কথা ভুলতে পারলেই বেঁচে যান। যে জায়গায় পিল্টডাউন কঙ্কালটা পাওয়া গিয়েছিল সে জায়গাটাকে সরকারি ভাবে প্রাচীন মূল্যবান স্মৃতির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কঙ্কাল এবং খুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা তাই এখন খুব সাবধানে পা ফেলছেন ভবিষ্যতে যাতে এ রকম ভাবে বোকা না বনে যান তারা। (৬৭)

একটু পরে আমি আরও কতকগুলো কঙ্কাল ও মাথার খুলির কথা বলছি। তার আগে বৈজ্ঞানিকেরা কি ভাবে সত্যকে চাপা দিয়ে মিথ্যাচরণের মধ্যে দিয়ে অন্ধভাবে শুধু নিজেদের মতবাদটাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান সে সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলে নি।

বেশীদিনের কথা নয়। সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসররা ছাত্রদের নিয়ে একটা আলোচনা সভা বসিয়েছিলেন। মাদ্রাজের প্রেসীডেন্সি কলেজের জীববিদ্যার প্রফেসর মিঃ ওয়েকলী রায় দিচ্ছিলেন ক্রমঃবিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে।

কিন্তু, সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি, ডিগ্রিধারী একজন প্রফেসর ক্রমঃবিবর্তনবাদের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে বললেন অশ্বের বংশপঞ্জীর কথা। বললেন:—অশ্বের এই জন্মপঞ্জী থেকেই কি এ কথাটা প্রমাণিত হয় না যে ক্রমঃবিবর্তনবাদের সূত্রটা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। শুনে প্রফেসর ওয়েকলী বললেন—অন্যান্য আরও অনেক প্রফেসরের মতো আপনিও হয়তো ভেবে থাকবেন যে ঐ অশ্বের জীবাশ্মগুলোকে স্তরে স্তরে সাজানো মৃত্তিকা বা শিলা রাশি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে যেমনটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে নিউইয়র্ক মিউজিয়ামে। আপনি হয়তো জানতেন না একটা একালের অশ্বের খুর খুঁজে পাওয়া গেছে কোলোরাডোর প্রাচীন স্তরে—ইউহিপুসের হাড়গুলো থেকেও প্রাচীন। অশ্বের বংশপঞ্জী সংক্রান্ত এই যে সত্যোদ্ঘাটন, এটা ক্রমঃবিবর্তনবাদের সাহায্যে যারা অশ্বের জন্ম ইতিহাস উদ্ধার করতে চান তারা জানেন না, কিংবা জানলেও সত্যকে চাপা দিতে চান নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে। আমরা যে সব পাঠ্য বই পড়ে থাকি সে সব

পাঠ্য বইয়ে ক্রমঃবিবর্তনবাদ বিরোধী যে সব তথ্য ও যুক্তি রয়েছে সেগুলোর স্থান হয় না—সুতরাং ক্রমঃবিবর্তনবাদ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অসম্পূর্ণ ও একপেশে। বস্তুতঃপক্ষে ভূ-তত্ত্ব বা জিওলজি ক্রমঃবিবর্তনের স্বপক্ষে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম। এ সম্পর্কে ভূতাত্ত্বিকদের কোন জোরালো সমর্থন নেই। এমনকি ডারউইন নিজেও বলে গেছেন :—Geology assuredly does not reveal any such finely graded organic chain, and this is perhaps the most obvious and serious objections that can be urged against the theory of evolution (vol 11 page 49).

ডারউইন তার বইতে হবে হয়তো, ছিল হয়তো, মনে করা যায় এ ধরণের ভাষা ব্যবহার করেছেন। এর থেকে কি এ কথাটাই প্রমাণ হয়না যে নিজের মতবাদটাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাবার মতো যথেষ্ট মাল মশলা তার ছিল না ? এদিকে তার শিষ্যরা অথবা তার মতবাদের সমর্থকদের কাণ্ডকারখানা দেখুন। স্যার আর্থার কীথ নামক একজন বৈজ্ঞানিকের কথাই বলছি। বৈজ্ঞানিক মহলে তার খুবই নাম ডাক। এমন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর কিনা সত্যকে চাপা দেবার চেষ্টা! তার একটা গবেষণামূলক গ্রন্থে তিনি ক্যালাভ্যারাস এবং ক্যাসটিনিডো'তে যে মাথার খুলিগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোর কোন উল্লেখ করেননি। অথচ ঐ খুলিগুলো তার সময় পর্যন্ত যতগুলো নর-বানরের খুলি পাওয়া গেছে সেগুলোর থেকে অনেক বেশী প্রাচীন। প্রফেসর ই, ডুবোইস'ও একই ধরণের অপচেষ্টা করেছেন। তিনিও মানুষের কঙ্কাল হাত মুখ মাথার খুলির কথা গোপন করে গেছেন যদিও ঐ মাথার খুলি পিথেক্যান্থ্রোপাস বা জাভা নর বানরের একই সঙ্গে একই স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রশ্ন করতে পারেন কেন তারা সত্যকে গোপন করেছেন ? সোজা উত্তর :—যে কংকাল মাথার খুলি তাদের মতবাদের স্বপক্ষে সেগুলোকে নিয়ে তারা মাতামাতি করেছেন; কিন্তু যেগুলো তাদের মতবাদের বিপক্ষে সেগুলোকে তারা সভয়ে এড়িয়ে গেছেন। হেকেল'ত নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি গর্ভস্থ সন্তানের চিত্র নিয়ে কারসাজি করেছিলেন তার বায়োজেনেটিক ল'কে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। বুঝুন এবার বৈজ্ঞানিকদের মাহাত্ম্য।

১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসের ইউনেস্কো (UNESCO) বিল্ডিং-এ অ্যানথ্রোপোজিক্যাল এবং প্যালিওনটোলোজিক্যাল কংগ্রেসের

অধিবেশন বসেছিল। সেই কংগ্রেসে মানুষ যে নিয়ানডারথাল মানুষের বংশধর এই তথ্যটাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল সর্বপ্রযত্নে। ঘোষণা করা হয়েছিল, যে মানুষ সর্ব প্রথম পাথরের অস্ত্র সস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরী করতে শিখেছিল এবং মৃতের পূজো করতো তার জন্ম আজ থেকে ২০,০০,০০০ বছর আগে।

১৯৫৯ সালে ডঃ লিকী তখনকার দিনে পরিচিত নর কঙ্কালগুলোর চেয়েও প্রাচীন কঙ্কাল আবিষ্কার করলেন। সেই সব মানুষ টাঙ্গানীয়ার ওলডুভাইয়ে বাস করতো আজ থেকে ১৮০,০০০ থেকে ৮০০,০০০ বছর আগে। ঐ কঙ্কালের নাম জিনজ্যানথ্রোপাস ওস্ট্র্যালোপিথেকাস। ১৯৬২ সালে তিনি আবিষ্কার করলেন কেনিয়াপিথেকাস যার বয়স ৫০,০০০,০০০ বছর। ১৯৬৩ সালে তিনি দাবী করলেন ওলডুভাইয়ে যে নতুন হোমোহ্যাবিলিস খুঁজে পাওয়া গেছে সেটা মানুষের উৎপত্তি বিষয়ক যে মতবাদগুলো বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে আসছে নৃতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য ক্রমঃবিবর্তনবাদীদের মস্তিষ্কে এদ্দিন ধরে সেগুলোর মূল ধরে দিয়েছে টান। সুতরাং ঐ সব মতবাদের বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মানুষের জন্মের ইতিহাস খুঁজবার নতুন পদ্ধতি খুজতে হবে।

১৯৬৯ সালের ইউনেস্কো অধিবেশনের প্রাক্কালে ইয়নে রেবীরোল (yvonne Rebyrol) লে মোন্ডে'তে লিখেছিলেন :— মানুষের মতো অবিকল দেখতে প্রাণীরা আজ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগে বাস করতো পৃথিবীতে এই সত্যোদ্ঘাটন ক্রমঃবিবর্তনবাদীদের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব এনে দিয়েছে।

এ পর্যন্ত মানুষের যে বংশপঞ্জী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা ভালভাবে পরিচিত তা হলো এই :— প্রথমে ওস্ট্র্যালোপিথেকাস। কিন্তু, এখন এমন একটা প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে যেটা ওসট্র্যালোপিথেকাসদের সমসাময়িক—কিন্তু দেখতে অবিকল মানুষের মতো। ডঃ লীকির মতে এই নতুন আবিষ্কার হোমো—'হ্যাবিলিস'ই আমাদের পূর্ব পুরুষ ; অন্যান্য হোমোনিড্‌দের (ওস্ট্র্যালো-পিথেকাস, নীয়ানডারথাল প্রভৃতির) সঙ্গে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। ওরা কোন উত্তর পুরুষই রেখে যায় নি।

ডঃ লীকি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছিলেন :— মানুষের মাথার খুলির এমন জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া

গেছে যে মাথার খুলিকে দেখলে মনে হবে সেটা যেন কোন আধুনিক মানুষেরই মাথার খুলি, অথচ, ঐ জীবাশ্মটা খুবই প্রাচীন। তাহলে কি এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে ত্রিশ হাজার বছর, এমন কি তারও আগে আজকের মতো আধুনিক মানব বাস করতো পৃথিবীতে?(৬৬) ক্রমঃবিবর্তনবাদীরা দয়া করে উত্তর দেবেন? ২৮-১০-৭৪'এর খবর, ইথিওপিয়ায় অনুসন্ধানরত আমেরিকা ও ফরাসী অভিযাত্রীদল ঘোষণা করেছেন প্রাচীনতম মানুষের এমন একটি দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে যা পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে পূর্ববর্তী সব ধ্যান ধারণা পাল্টে দিতে পারে। এই নরকঙ্কালটি প্রায় ৪০ লক্ষ বছরের মতো পুরোনো। মানুষের আবির্ভাবের তারিখটা এভাবে আরও পেছনে চলে যাচ্ছে।

কঙ্কাল আর মাথার খুলি নিয়ে যতোই গবেষণা চলছে ততোই মানুষের জন্ম-ইতিহাস পেছিয়ে যাচ্ছে এবং যে সব খুলিগুলোকে ক্রমঃবিবর্তনবাদীরা মানুষের পূর্ব পুরুষদের মনে করে আসছিলেন এবং মুখ্যতঃ যেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞানীরা ক্রমঃবিবর্তনবাদের ভিত্তি রচনা করেছিলেন সে গুলোকে আজ আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবার সময় হয়েছে।

মানুষ কি শুধু খুলি সর্বস্ব যে তার জন্ম-ইতিহাস একমাত্র খুলি আর কঙ্কালের মধ্যে নিহিত থাকবে? মানুষ পশুর থেকে আলাদা তার মস্তিষ্কের জোরে। অন্য প্রাণীর যা নেই তার তা আছে—তার কৃষ্টি আছে, সংস্কৃতি আছে, সভ্যতা আছে। তাই, মানুষের জন্ম-ইতিহাস একমাত্র খুলি-সর্বস্ব হতে পারে না। অন্যান্য সরীসৃপ, পশুপাখীর বেলায় খুলি এবং কঙ্কালই একমাত্র বিবেচ্য হতে পারে যেহেতু ওসব সরীসৃপের কোন কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা নেই এবং ও সবির কোন নিদর্শনই তারা রেখে যেতে পারে না অনাগতকালের ঐতিহাসিক গবেষকদের জন্যে। দুঃখের বিষয়, এতকাল ক্রমঃবিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিকেরা যতোটা খুলি কঙ্কাল নিয়ে নাড়া চাড়া করেছেন ততোটা করেননি মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির বেলায়। তাদেরই বা দোষ কি, দশ বিশ ত্রিশ হাজার লক্ষ বছর আগের মানুষ যে সভ্য সংস্কৃতি-পরায়ণ, কৃষ্টিবান হতে পারে এ তারা ধারণাই করতে পারেননি।

আজ থেকে প্রায় ১২০০০ থেকে ২০০০০ বছর আগের অনেকগুলো শিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে ফ্রান্সের সোল্যুটার শহরে। আমরা আমাদের আজকের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ওসব সামগ্রি অত্যাবশ্যক নয়

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। অথচ, আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের মতে ১২০০০ থেকে কুড়ি হাজার বছর আগের মানুষের ছিল আদিম অসভ্য জীবন—পশুর মতো খাবার সংগ্রহ করা, নানা রকম শত্রুর মোকাবিলা করা, শীতাতপের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা প্রভৃতি কাজে এতো বেশী ব্যস্ত থাকতো যে তারা অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক কোন কাজ করবার ফুরসৎই পেতো না। সোল্যুটার শহরে অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সব নমুনা পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে আছে মূল্যবান পাথবেব ওপব নানা রকম অতীব সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য, শিল্পচাতুর্য। তাদের ছোরা এবং বর্শাফলকের এমন সুন্দর নমুনা পাওযা গেছে যেগুলো দিয়ে নিধন করা কিংবা সেগুলোকে জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অসম্ভব। এগুলোকে শুধু ব্যবহাব কবা যেতে পাবে গৃহসজ্জার কাজে। সোলুটাবে হাড়ের এমন সূক্ষ্ম ছুঁচ আবিষ্কৃত হয়েছে যা আধুনিক সেলাই-বিশেষজ্ঞরাও অতি সাগ্রহে লুফে নেবেন দুর্লভ সামগ্রি হিসেবে। ও জাতীয় ছুঁচ দিয়ে নিশ্চয় সুন্দর অত্যাধুনিক পোষাক তৈরী করা হতো।

১৭৮ পৃষ্ঠার চিত্র দুটো লক্ষ্য করুন। প্রথমটা আবিষ্কৃত হয়েছে ফ্রান্সের লুসাক নামক স্থানে। এই চিত্রটা আজ থেকে ১২০০০ থেকে ১৬০০০ বছর আগের ম্যাগ্‌ড্যালেনিয়ান যুগেব সাক্ষ্য বহন করছে। ঐ নারী মূর্তিটাকে দেখে কি আপনাদেব কোন আদিম গুহাবাসিনী মনে হয়? ওর বেশ ভূষায় চেহারায়একটা অত্যাধুনিক ছাপ। অথচ আজকালকার গোরা প্রাগৈতিহাসিক এবং ক্রমঃবিবর্তনবাদীদেব মতে ম্যাগ্‌ড্যালেনিয়ান যুগের মানুষ গাছের ছাল আর পশুর চামড়া পরে লজ্জা নিবারণ করার চেষ্টা করতো মাত্র। ডান দিকের চিত্রটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা গুহা চিত্র। আবিষ্কৃত হয়েছে কালাহারি মরুভূমির একটা গুহায়। লোকটা দস্তানা পরেছে, বুট জুতো পরেছে এবং আমাদের অচেনা অথচ সুদৃশ্য অন্যান্য পোষাক।

ইউরোপ এবং আফ্রিকায় অরিগ্‌ন্যাসিয়ান এবং ম্যাগড্যালেনিয়ান যুগের এরকম আরো অনেকগুলো চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যা দেখলে এতো বেশী চমকপ্রদ ও অত্যাধুনিক মনে হয় যে, কোন কোন বিশেষজ্ঞ ওসব চিত্রগুলোকে জাল জিনিস হিসেবে অভিহিত করতে ছাড়েননি। তাদের ধারণা, এ যুগের কোন শিল্পি ওসব জীবন্ত শিল্প সৃষ্টি করে সেগুলোকে ১৫০০০, ২০,০০০ বছর আগের বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু, অন্যান্য সৎ স্বাধীনচেতা

গবেষকরা দীর্ঘ দিন গবেষণা করে এ কথাটাই প্রমাণ করে গেছেন যে সত্যি সত্যিই ওসব গুহা চিত্র ম্যাগ্‌ড্যালেনিয়ান বা অরিগ্‌ন্যাসিয়ান যুগের সৃষ্টি।





এদের মধ্যে অ্যাবি ব্র্যুইল (Abe´ Breuil) এবং রবার্ট সিলভারবার্গ'এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন ক্রমঃবিবর্তনবাদীদের আমি কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। আশা করি তারা সেগুলোর সদুত্তর দিতে পারবেন।

নেভ্যাদার ফিসার ক্যানিয়নে চুনা পাথরের ওপর ট্রিয়াসিক যুগের একটা ছাপ আবিষ্কৃত হয়েছে। ছাপটা একটা জুতোর তলার। অস্পষ্ট চোখে পড়ছিলো সেলাইয়ের ছিদ্রগুলো। যুগটা ডাইনোসরদের। ডাইনোসররা কি জুতো পরতো? তাদের কয়টি পা ছিল? চারটে পায়েই জুতো পরতো? বৈজ্ঞানিকেরা কি উত্তর দেবেন? ডাইনোসররা যদি চার পায়ে জুতো না পরে থাকে, জুতো তৈরীর বিদ্যে বুদ্ধি তাদের নাই থাকে'ত পৃথিবীর বুকে তখন নিশ্চয় দু পা-ওয়ালা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সভ্য জীবদের অস্তিত্ব ছিল। তারা কি মানুষ. না দেবতা? বৈজ্ঞানিকেরা কি উত্তর দেবেন?

সোভিয়েত রাশিয়ার প্যালিওন্টোলোজিক্যাল মিউজিয়মের ডাইরেক্টর প্রফেসর কে. কে. ফ্লোরেভের কাছে প্রাচীন যুগের একটা বাইসন বা মহিষের মাথার খুলি রক্ষিত আছে। খুলিটা এতো প্রাচীন যে আমাদের পূর্বপুরুষ গুহামানবদের মাথার খুলিগুলোকেও যথেষ্ট নতুন মনে হয় সে তুলনায়। খুলিটা প্রায় এক কোটি বছরের মতো পুরোনো। ওটের মাথায় একটা বুলেটের ছিদ্র রয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে এটেই প্রমাণিত হয়েছে যে পশুটা ঐ বুলেটের আঘাতে মারা যায় নি। কারণ, তার জীবদ্দশাতেই ঘা'টা শুকিয়ে গিয়েছিল। মানুষ বড় জোর যখন বানরের স্তরে তখন কে কিসের সাহায্যে ঐ জন্তুটাকে আঘাত করেছিল?

উত্তর রোডেশিয়ার ব্রোকেনহিলে আদিম মানবের একটা মাথার খুলি পাওয়া গেছে, যেটা নাকি ৪০,০০০ হাজার বছরের পুরোনো। লণ্ডনের হিস্ট্রি মিউজিয়ামে সেটে রক্ষিত আছে। ওটার মাঝখানে একটা পরিষ্কার গোলাকার ছিদ্র রয়েছে। কোন পাথুরে অস্ত্রের আঘাত পেলে কিংবা কোন বৃহৎ প্রাণীর দাঁত বা সিং এর গুঁতো খেলে ঐ ছিদ্র থেত্‌লে যেতো, অমন সুন্দর গোলাকার হয়ে থাকতো না নিশ্চয়। তা হলে কি ওটে একটা বুলেটের ছিদ্র? ঐ খুলিটার বিপরীত অংশটাও নেই। তাই, বিশেষজ্ঞদের অভিমত, হ্যাঁ, ঐটে বুলেটের ছিদ্রই হবে। চল্লিশ হাজার বছর আগেও বুলেট! কাদের ছিল ঐ আগ্নেয়াস্ত্র? ওরা কারা? মানুষ, দেবতা, না দানব?

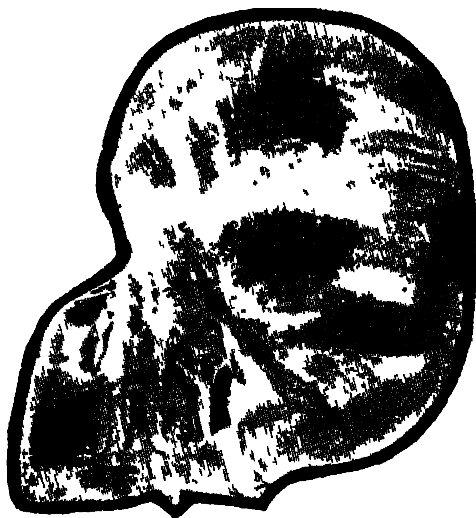
দক্ষিণ পশ্চিম কোস্টারিকায়, গোয়াতেমালা এবং মেক্সিকোয় কতকগুলো পাথরের বল পাওয়া গেছে—খুবই সুমসৃণ। কালো জিনিসেরও যেন দ্যুতি বেরুচ্ছে। ঐ বলগুলোর কোন কোনটার ওজন বেশ কয়েক টন, কিন্তু শক্ত আগ্নেয় পাথর কেটে কুটে মসৃণ করে বলের আকার দিলো কারা, কিসের সাহায্যে? যেখানে পাওয়া গেছে বলগুলোকে সে জায়গায় আশে পাশে কোন যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় নি। আর পাথরগুলোকেও বেশ দূর থেকে আনা হয়েছে। বলগুলো কি উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল? বলগুলো কোন যুগের? কোন সভ্যতার? পাথরগুলোকে কারা কিসের সাহায্যে পর্বত শীর্ষে তুলে এনেছিল, কিংবা বলগুলোকে সেখানে স্থাপিত করেছিল কি উদ্দেশ্যে? (৫৫)

কতকগুলো বল ত্রিভুজাকারে সজ্জিত। তাই অনেকের ধারণা ঐ বলগুলোর কোন নক্ষত্রবিদ্যাবিষয়ক কিংবা ধর্মীয় তাৎপর্য থেকে থাকবে। সে যাই হবে হোক বিশেষজ্ঞদের ধারণা ঐ বলগুলো যারা তৈরী করেছিল তারা সভ্যতার দিক দিয়ে খুবই উন্নত ছিল। (Natural History Magazine sept 1955 U S A) গবেষণা চলেছে, পুরাতত্ত্ববিদরা এ নিয়ে এখনো মাথা ঘামাচ্ছেন। আমি তাদেরকে আরও তাগাদা দিয়ে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করছি:—এ কাদের কীর্তি?

১৯৬০ সালে টি, জি, গ্রিটসাই এবং আই, জে, ইয়াটুমকো সোভিয়েত রাশিয়ার ওডেসা'তে উটপাখী, উট এবং হায়েনার কতকগুলো হাড় খুঁজে পেয়েছিলেন। সেগুলো প্রায় দশ লক্ষ বছরের পুরোনো। তারা দেখলেন হাড়গুলোর ওপর কে যেন সুদৃশ্য কারুকার্য করেছে কেটেকুটে। ছিদ্রগুলো ছিল নিখুঁত, যে সরু লম্বা খাতগুলো কাটা ছিল তাও খুব পরিচ্ছন্ন, নজর কাড়ার মতো। বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন ওগুলোকে কোন অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছে, তারপর সেগুলোকে করা হয়েছে মসৃণ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতবাদ অনুসারে দশ লক্ষ বছর আগে কি মানুষের অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীতে? থাকলেও তারা এমন একটা আদিম পর্যায়ে ছিল যে তাদের মধ্যে উপরোক্ত কোন দক্ষ কারুশিল্পী ছিল না এটা নিশ্চিত। তাহলে পশুপাখীর হাড় দিয়ে সুদৃশ্য কারুকার্য সব কাদের সৃষ্টি?

আরও একটা প্রশ্ন আমি বৈজ্ঞানিকদের কাছে রাখছি। ১৯৫৯ সালের কথা। রাশিয়া এবং চীনের একদল পুরাতাত্ত্বিক অভিযান চালিয়েছিলেন

গোবি মরুভূমিতে। তাদের পুরাভাগে ছিলেন ডঃ চৌ মিন্স চেন্। তারা আবিষ্কার করলেন মরু পাথরের ওপর খোদিত একটা জুতোর ছাপ। পরীক্ষা করে দেখলেন ছাপটা কয়েক মিলিয়ন বছরের পুরোনো। বিপদে পড়লেন তারা, কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পেলেন না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মতে কোটি বছর আগে পৃথিবীতে'ত প্রাণীর অস্তিত্বই ছিল না। (৫৪)



চিত্রটা দেখুন। স্ফটিকের একটা মাথার খুলি। দু'লক্ষ বছর আগেকার কোন সুদক্ষ শিল্পি ছিলেন ওটার রূপকার? (৫২)

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটবার আগে বাস করতো বিরাট বিরাট আকারের নানাবিধ সরীসৃপ,—বৈজ্ঞানিকেরা যার নাম দিয়েছেন ডাইনোসর। প্রত্নতাত্ত্বিকরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প আবিষ্কার করেছেন সেগুলো থেকে এটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ও সব গুহাচিত্রে যে সব প্রাণীদের চিত্র আঁকা রয়েছে সেগুলো অধুনা বিলুপ্ত লক্ষ লক্ষ বছর আগেরকার অতিকায় বৃহৎ প্রাণী। ১৯২৪ সালে ডোহেমি সায়েন্টিফিক এক্সপেডিসন্ উত্তর এরিজোনার হ্যাভা শুপাই ক্যানিয়নের একটা গুহার পাথরে খোদাই করা কতকগুলো চিত্র আবিষ্কার করেছিলেন। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছিলেন ওখানে যে সব প্রাণীদের চিত্র আঁকা সেগুলো 'টাইর‍্যানোসরাস' ছাড়া আর কিছুই নয়। ওগুলো রয়েছে পেছনের পায়ে

ভর করে। ওর্‌গনের 'বিগ্‌ সেন'ডি রিভারে'র অন্য একটা গুহা চিত্রে যে সব প্রাণীর চিত্র আঁকা সেগুলোর নাম 'স্টেগোসরাস'। পৃথিবীর মাটিতে মানুষ পা রাখার আগে এসব প্রাণী বাস করতো। লেখক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক এ. হ্যাযাট (Hyatt) ভেরিলের মতে পানামাব কোকল সিরামিকসে যে প্রাণীটার চিত্র আঁকা সেটার নাম হলো টেরোড্যাকটিল (pterodactyl) যেটা নাকি মানুষের এক ইয়ন্‌ (eon) আগে বাস করতো পৃথিবীতে। পিস্‌কো পেরুর সন্নিকটে নাজকা জেলার কারুকার্য করা প্রাচীন পাত্রে প্রফেসর জুলিও টেলো (Tello) ইলামা'র (Illama) চিত্র অঙ্কিত দেখতে পেয়েছিলেন। ঐ প্রাণীর পায়ে পাঁচটি আঙ্গুল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পায়ে পাঁচটি আঙ্গুল বিশিষ্ট ইলামার একটা কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। এ জাতীয় প্রাণী বাস করতো পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বছর আগে। যে সময় এসব প্রাণীরা বেঁচেছিল পৃথিবীর বুকে তখন যদি মানুষের জন্ম না হয়ে থাকে পৃথিবীতে অর্থাৎ মানুষ যদি ওসব প্রাণীকে স্ব-চক্ষে না দেখে থাকে তাহলে ওসব চিত্র আঁকা হলো কি করে ? সুতরাং, বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তই নিতে হয় যে পৃথিবীর বুকে যখন টাইর‍্যানোসরাস, স্টেগোসরাস প্রভৃতি অতিকায় সরীসৃপ শ্রেণীর জন্তুরা বাস করতো তখনও পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে বেড়াতো দ্বি-পদবিশিষ্ট মানুষ নামক বুদ্ধিমান প্রাণী।

অদৃশ্য পরিবর্তন এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কোনটার সাহায্যেই'ত প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং ক্রমঃবিবর্তনবাদ সূত্রকে প্রমাণ করা যায় না। আমেরিকার প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ক যাদুঘরের প্রাক্তন ডাইরেক্টর ডঃ ওস্‌বোর্ণ হয়তো পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী নর বানরের মাথার খুলি পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের তুলনায়। তার মতে:—নর-বানরেব যে সূত্র সেটা নিতান্তই ভুল, সেটা বিপথেই পরিচালনা করেছে শুধু বৈজ্ঞানিকদের। ঐ সূত্রটাকে আমাদের গবেষণা থেকে বাদ দেওয়া উচিৎ,—আমাদের সাহিত্যে, পাঠ্য বইয়ে তার যেন কোন উল্লেখ না থাকে। এই কটু কথা কয়টি বলে ফেলেই ওসবোর্ণ সাহেব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন :—এ কথা কয়টি কোন রাগ কিংবা মান অভিমান, কিংবা কোন রকম সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী-জাত নয়; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিছক সত্যান্বেষণের খাতিরে কথা কয়টি বলা

হচ্ছে। বানরের পিছনে না ছুটে নতুন ভাবে নতুন পথে মানুষের জন্মদাতার অন্বেষণ করবার জন্যেই তিনি কটুকথা কয়টা শোনাতে বাধ্য হচ্ছেন।

জীবাশ্ম বিশেষজ্ঞদের রাজপুত্র হিসেবে খ্যাত হার্ভাড ইউনিভার্সিটির লুইস অ্যাগসিজ তার বিখ্যাত বইতে (৬৯) লিখেছেন :—একজন জীবাশ্মবিদ্ হিসেবে প্রথম থেকেই আমি ক্রমঃবিবর্তনবাদীদের মতবাদ ও বাদানুবাদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এসেছি। কারণ, প্রকৃতির শিলাস্তরের ভাঁজে ভাঁজে প্রাণী দেহের যে নমুনা পড়ে রয়েছে সেই নমুনা অর্থাৎ জীবাশ্মরাশি বিভিন্ন প্রাণীব জন্ম বৃত্তান্ত যেভাবে উদ্ঘাটিত করেছে আমাদের মতো বিশেষজ্ঞদের সামনে তার সঙ্গে ক্রমঃবিবর্তনবাদীদের বক্তব্যের কোন মিল নেই। বস্তুতঃ, সূত্র হিসেবে ক্রমঃবিবর্তনবাদটা ভুল। কারণ, বিজ্ঞানের কোন শাখাই এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারে না যে প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদন পদ্ধতি এবং সংখ্যা বৃদ্ধি পদ্ধতি কোন না কোন সময় বিশেষ কোন পশু পাখী থেকে বিশেষ রকমের পশু পাখীর জন্ম দিয়েছে।'

জীবাশ্মবিদদের মধ্যে রাজপুত্র নামে খ্যাত লুইস অ্যাগসিজের বক্তব্য থেকে একথাটাই প্রমাণিত হয় যে বানর কিংবা অন্য কোন বিশেষ প্রকারের প্রাণী থেকে মানুষের জন্ম হতে পারে না।

বিশ্ববিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ প্রফেসর ভিরচাও (Virchow) বলেছেন :— ডারউইনের অনুগামীরা মিছেমিছি বানরের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। দুয়ের মধ্যে সেতু বন্ধনকারী মাঝামাঝি পর্যায়ের একটিও কি নর-বানর পাওয়া গেছে? বানরের পরে এবং মানুষের অব্যবহিত আগের মাঝামাঝি পর্যায়ের সেই বিদ্ঘুঁটে প্রাণীটার খোঁজ'ত কেউ পায়নি। কোন বিজ্ঞানী জোর গলায় বলতে পারেন যে ওরকম একটা কিছু তিনি আবিষ্কার করেছেন? (৭০)

জীবাশ্ম-বিজ্ঞান প্যালিঅনটোনোজির সূত্রানুসারে পাথরের মধ্যে পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রাণীর কঙ্কাল মিশে থাকবার কথা। নর-বানরের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তাদের কঙ্কালগুলো জীবাশ্ম হয়ে সুপ্ত থাকবে না কেন নিরেট পাথরের নিষ্প্রাণ বুকে?

প্রফেসর হলডেন বলেছেন :— প্রাকৃতিক নির্বাচনই যে ক্রমঃবিবর্তন সূচিত করে অর্থাৎ এক জাতীয় প্রাণীকে উচ্চতর কোন প্রাণীতে উন্নীত করে এ রকম প্রমাণ আমরা পাইনি। সুইডেনের লিউও বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিস্তার অধ্যাপক ডঃ হেরিবার্ট নেলসন লিখেছেন :—বিশেষ বিশেষ রকম প্রাণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বা বিবিধ প্রকারের প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে; সংমিশ্রণ জাত বিভিন্ন রকম বিচিত্র প্রাণীর উদ্ভব ঘটতে পারে বিশেষ শ্রেণীর কোন প্রাণীর মধ্যে—ক্যালাইডস্কোপ চোখে লাগিয়ে দেখলে তার ভেতর যে রকম সুন্দর রং এবং আকৃতি দেখা যায় অনেকটা সেই আনুক্রমিক পরিবর্তনের মতো। কিন্তু বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট জাতেব কোন প্রাণী থেকে নির্দিষ্ট জাতের কোন প্রাণীর জন্ম হতে পারে না—কতকগুলো বৃত্ত যেমন পারে না পরস্পরকে ছেদ করতে। প্রজাতি বা বিশেষ ধরণের উচ্চ প্রাণী অপরিবর্তণীয়। (৭১)

প্রফেসর জে. মূলার ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই পুরস্কার তাকে দেওয়া হয়েছিল মিউটেশনের ওপর গবেষণামূলক একটা গ্রন্থের জন্যে। তার গবেষণার মর্মার্থ এ রকম—মিউটেশনগুলোর বেশীর ভাগই নিকৃষ্ট। বস্তুত উৎকৃষ্ট মিউটেশনগুলো এতই বিরল যে তাদের সবগুলোকেই নিকৃষ্ট বললে অত্যুক্তি হয়না'। (৭২) আরও পরবর্তীকালে (১৯৬৩) ম্যায়ার বলেছিলেনঃ—মিউটেশনগুলোব প্রায সবিই যে অনিষ্টকর এ কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

উপরোক্ত বিশেষজ্ঞদের এসব উক্তির সাহায্যে এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যায় :—যেহেতু মিউটেশনগুলোর প্রায় সবগুলোই দুর্বল অনিষ্টকর সেহেতু তারা খুবই স্বল্পায়ু এবং কোন কোন বিশেষ উন্নত ধরণের প্রজাতির জন্ম দিতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম—অনেকটা খঞ্জের পর্বত অতিক্রম করবার মতো। তাই, প্রফেসর ই. ডব্লিউ ম্যাকব্রিড (Macbrid) বলেছেন :—কোচকানো পাখাওয়ালা, কিংবা দুর্বল দৃষ্টিশক্তিধর প্রাণী ক্রমঃবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যে কোন উন্নত স্তরে উন্নীত হবে এমনতরো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যদিও গবেষণাগারে সযত্নে লালনের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে প্রতিপালন করা সম্ভব, বন্য দশায় কিন্তু তাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা ছিটে ফোঁটাও থাকে না। প্রফেসর হলডেন (১৯৫১ সালে) বার্মিংহামে যে বায়োলজিক্যাল কাউন্সিল বসেছিল সেখানে এই ধরণের মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :—প্রাকৃতিক নির্বাচন সব কিছুরই চরম অবস্থাকে লোপাট করে দিতে সদা ব্যস্ত,—বিশেষ করে যদি স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন রকমের বা অসাধারণ মিউটেশনের ফলে এই চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়। হলডেন

আরও বলেছিলেন:—পারস্পরিক ভাবে যদি দুটো বন্ধ্যা সন্তানের জন্ম দেওয়া হয়ে থাকে একই জন্মসূত্র থেকে—যেমনটা করা হয়েছিল ড্রোসোপাইলিয়ার ক্ষেত্রে তাহলে সে ক্ষেত্রে ঐ দুটোকে দুটো নতুন প্রজাতি হিসেবে গণ্য করা যায় না। তার মতে-কোষানুবিদরা এখনো নতুন প্রজাতির ড্রোসোপাইলিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। (৭৩)

একটু উৎকৃষ্ট ধরণের মিউটেশন্ তৈরী করা সম্ভবপর কোন কোন সময়ে এ কথাটা স্বীকার করে নিলেও লোক সংখ্যার ক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলোর সক্রিয় ভূমিকা প্রতিপন্ন করা একটা সমস্যাবিশেষ। কারণ যদিও প্রতি বছর ছাব্বিশটা ড্রোসোপাইলিয়ার বংশ পরীক্ষা করা হয়েছে—(১৯১০ সাল থেকে আজ অবধি এক হাজারটিরও বেশী বংশের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে) তবুও মিউটেশনগুলো সঙ্ঘটিত হয়ে উঠেছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ডোব্ঝান্স্কির মতে প্রাকৃতিক জনসংখ্যা থেকে ১০০০০ থেকে ২০০০০ জন সিওডোস্কিউরা'র (Pseudobscura) ব্যক্তি সমষ্টি বেছে নিয়ে তাদের সন্তানদের শ্যালাইভারি গ্ল্যাণ্ড ক্রোমোজম্ পরীক্ষা করে একটাও স্থানান্তরের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়নি। অবশ্য, যদিও আকস্মিকভাবে এরকম স্থানান্তর লক্ষ করা যায় জীবন সংগ্রামের পক্ষে কিন্তু তা নিতান্তই অনুপোযোগী। মিউটেশনের মতো এরকম স্থানান্তরের ঘটনাও খুব বিরল। এবং জনসংখ্যার ওপর কোন রকম স্থায়ী প্রভাব ফেলতে গেলে ভূ-তত্ত্ববিদ্রো পৃথিবীর যে বয়স নির্দ্ধারণ করে থাকেন তাও হয়ত পর্যাপ্ত নয়—অর্থাৎ জন সংখ্যাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা এ ধরণের স্থানান্তর এবং পরিবর্ত্তনের একটুও নেই। (৭৪)

তাহলে কি এখন আমাদের মনে এ প্রশ্নটাই অতি সহজভাবে উঠতে পারে না, বিভিন্ন রকমের স্তন্যপায়ী জীবেরা যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে (তুলনামূলক ভাবে) টার্শ্যারী পিরিয়ডের পর থেকে জন্ম নিলো পৃথিবীর বুকে—তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কি ভাবে দেওয়া যায়?

কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর গোল্ডক্রেণ্ড (Goldchrendt) এই একই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন। ক্রমঃবিবর্তনবাদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশদ আলোচনার পর তিনি এ কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন ছোট খাট পরিবর্তন (মিউটেশন) সম্পূর্ণভাবে নতুন প্রজাতির জন্ম দিতে পারে না কোনমতেই। মিউটেশনের ফলে যে বিভিন্ন রকমের

প্রাণীর জন্ম হয় সেগুলোকে প্রাথমিক বা প্রান্তসূচক প্রজাতি হিসাবে গণ্য করা যায় না। তার লেখা বই 'থিয়োরেটিক্যাল জেনেটিক' নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেনঃ—এখনো পর্যন্ত কেউ কোন রকম নতুন প্রজাতির জন্ম দিতে পারেনি—উচ্চতর প্রাণী সে'ত দূরের কথা, ছোট খাট অন্ত্যজ প্রাণীগুলোও নির্বাচন এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মিউটেশন বা পরিবর্তনের সাহায্যে যে সম্পূর্ণ রকম নতুন জাতের প্রাণীর জন্ম দিতে অক্ষম এ কথাটা আজ স্ব-প্রমাণিত। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রফেসর লাইসেনকো এবং মাইচুরীন এ জন্যেই মেণ্ডেল এবং মর্গানের ওপর খুব একহাত নিয়েছেন।

ডঃ হেরিবার্ট নিলসনও (জার্মাণ বিশেষজ্ঞ) এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেনঃ—মিউটেশন মানেই অধঃপতন। সে কোষানু বা জিনের পরিবর্তনই হোক কিংবা ক্রোমোজম সংক্রান্তই হোক তারা প্রাণীর স্বাভাবিক প্রতিরোধক্ষমতা এবং জীবনীশক্তি নষ্ট করে দেয় —এমনকি উৎকৃষ্ট রকম মিউটেশনগুলোও যদি সুসঙ্ঘটিত হয়ে ওঠে তবুও। সুতরাং, মিউটেশনগুলোর যে এমন কোন ক্ষমতা নেই যাতে তারা অন্য কোন নতুন প্রজাতির জন্ম দিতে পারে তা সকলেই স্বীকার করবেন। (৭৫)

উদ্ভিদ এবং পশুকে পরীক্ষা করেও দেখা গেছে তারা একটা নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্ম দিতে পারে। যেমন এক জাতীয় কাঁঠাল বীজ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের কাঁঠাল গাছের জন্ম দিতে পারে। কাঁঠালও আমের মধ্যে বিভিন্ন জাত দেখা যায়। আম এবং কাঁঠালের প্রকার ভেদ অসংখ্য রকম। কিন্তু, প্রাকৃতিক কারণেই আম কখনো কাঁঠাল হতে পারে না, কিংবা কাঁঠাল আম হতে পারেনা। তাদের যদি এমন কোন স্পর্দ্ধা দেখা দেয় যে ইশ্বরের নির্দিষ্ট গণ্ডি পেরিয়ে তারা নতুন কোন গণ্ডিতে গড়িয়ে পড়বে তাহলে তারা প্রকৃতির শৃঙ্খলরাজ্যে খাপছাড়া হয়ে পড়বে—ফলতঃ শক্তিহীন এবং অচিরেই আত্মবিলুপ্তির পথে।

এ জন্যেই পৃথিবীর কোন বৈজ্ঞানিক আজ পর্যন্ত হাতে কলমে প্রমাণ করতে পারেননি যে কোন জাতের প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে নির্দিষ্ট জাতের প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্ম হয়েছে। ক্রমঃবিবর্তনবাদীরা হয়তো বলবেন, এখন হচ্ছে না বলে যে আগে হয়নি তেমন'ত কোন কথা নেই। কিন্তু এমনটি যদি হয়ে থাকে—তাহলে'ত তার সাক্ষ্য বয়ে নিয়ে বেড়াতো পাথরের স্তরের জীবাশ্মগুলো। কিন্তু, ঐ জীবাশ্মের সাহায্যেও কি বৈজ্ঞানিকেরা

প্রমাণ করতে পেরেছেন যে ক্রমঃবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কোন বিশেষ রকম প্রাণী সম্পূর্ণ একটা আলাদা শ্রেণীর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে? পারেননি। তাই এপ-ম্যান বা নর-বানরের কোন জীবাশ্মের খোঁজ মেলেনি প্রস্তর স্তরের ভাঁজে ভাঁজে। এই-ই যদি সত্যি হয় তাহলে বানর বা বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব ঘটলো কি করে? পাঠকেরা ভেবে দেখুন এবং ক্রমঃবিবর্তনবাদীদের প্রশ্ন করুন।

হাভার্ড ইউনিভার্সিটির ভূ-তত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ এন, এস সেলার (sehller) তাই বলেছিলেনঃ পৃথিবীতে এখন যে কুড়ি লক্ষ থেকে ত্রিশ লক্ষ রকমের জীব জন্তু প্রাণী উদ্ভিদ বাস করেছে তারা যে মূখ্যতঃ প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রে অনুযায়ী জন্ম পরিগ্রহ করেছে এমন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবেন না।

এখন প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। জিরাফের গলা লম্বা কেন? এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ক্রমবিবর্তনবাদীরা এভাবেঃ— জিরাফের গলা লম্বা না হলে উঁচু খেঁজুর গাছের খেঁজুর খেতে পারতো না সে। সুতরাং না খেতে পেয়ে তাকে মরতে হতো। দয়া করে তাই প্রকৃতি দেবী তার গলাটাকে লম্বা করে দিয়েছেন। এ ভাবে প্রকৃতি দেবী যার উপর দয়া পরবশ হয়েছেন সেই বহাল তবিয়তে টিকে আছে পৃথিবীতে। যাদের ওপর প্রকৃতি দেবীর নেক নজর পড়েনি অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে লড়বার পাথেয় যার যতো কম সে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ততো তাড়াতাড়ি। মিষ্টার টিলনি এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেনঃ— স্ত্রী জিরাফ পুরুষ জিরাফের চেয়ে প্রায় দু'ফুটের মতো খাটো। প্রাকৃতিক নির্বাচন যদি এ ক্ষেত্রে কাজ করতো তাহলে'ত স্ত্রী জিরাফের বংশ ধ্বংস হতো। এর অর্থ জিরাপের বংশ ধ্বংস। ল্যামারকের সূত্রানুযায়ী —আহারের সময় জিরাফকে উপরের দিকে গলা বাড়িয়ে দিতে হয়— এর ফলে তার ছেলে মেয়েরা ধীরে ধীরে লম্বা গলার অধিকারী হয়ে ওঠে। মিষ্টার টিলনির মতে ব্যাখ্যাটা অবৈজ্ঞানিক। এ প্রসঙ্গে তিনি মাকড়শার কথা তুলেছেন। জাল বিস্তার করবার জন্যে মাকড়শার রয়েছে কতকগুলো জটিল প্রত্যঙ্গ। জাল বিস্তার করবার এই যে কলকব্জা সেগুলো পুরোমাত্রায় বিকাশ লাভ না করা পর্যন্ত অকেজো হয়েই থাকে, এবং মধ্যবর্তী সময়টুকুতে যদি মাকড়শা ধীরে ধীরে জাল বিস্তারের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিতে তাহলে ঐ সব জৈবিক কলকব্জা মাকড়শার পক্ষে মারাত্মক

হয়ে উঠবারই কথা। সুতরাং, মাকড়শার যখন জন্ম হয়েছে তখনই জাল বিস্তারের সব সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়েছে তাকে। (৬৭)

প্রাকৃতিক নির্বাচন হেতুই যদি পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের প্রাণীর উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে এ কথাটাই মেনে নিতে হয় যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি বলে অনেক প্রাণীর বংশ বিলুপ্তি ঘটেছে, আবার অনেক প্রাণী প্রকৃতির ওপর জয়ী হয়ে বেশ বহাল তবিয়তে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে চলেছে।

এ যদি হয়'ত মানুষের মতো প্রাণীর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটার এবং পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হবার পেছনে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পৃথিবীর বায়োস্ফিয়ারটা উচ্চ শ্রেনীর প্রাণীর পরিবর্তে বরং নিম্নশ্রেণীর পোকা মাকড় ভর্তি হয়ে থাকাটাই ক্রমবিবর্তনবাদীদের সূত্রানুসারে অধিকতর যুক্তিযুক্ত হতো। কারণ, নিম্নশ্রেণীর পোকা মাকড়দের জীবনের উপাদান দরকার হয় যৎসামান্য। একটা পিঁপড়ের বেঁচে থাকার সহজাত ক্ষমতা যে মানুষের চেয়ে বেশী এটে জীববিজ্ঞানীরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। গত দশ কোটি বছর ধরে কয়েকটা পিঁপড়ের বংশ নিজেদের আকৃতি প্রকৃতি ঠিকই রেখে দিতে পেরেছে; একটুও হের-ফের ঘটেনি তাদের শারীরিক গঠন বৈচিত্র্যে। কিন্তু, মানুষকে বার বার তার খোলসটা পাল্টাতে হয়েছে প্রকৃতির চাহিদা মেটাবার জন্যে। পিঁপড়ের মতো অন্ত্যজ প্রাণীগুলোর প্রকৃতি এবং পরিবেশের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেবার সহজাত ক্ষমতা যদি এতোই বেশী 'ত মানুষের মতো অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীগুলোর জন্ম হলো কেন?

ঝিনুকেরা এক সঙ্গে কোটি কোটি সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে—এদের মধ্যে একটা কি দুটো মাত্র মারা যায়। আরও একটা ভাববার কথা, পিঁপড়ের মতো এই ঝিনুকগুলো কোটি কোটি বছর ধরে ঠিক একই রকম থেকে গেছে। যুগে যুগে পৃথিবীর আকৃতি প্রকৃতি আবহাওয়া পাল্টেছে কিন্তু ঝিনুকগুলোর আকৃতি প্রকৃতিতে কোন রকম পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এ ছাড়া পৃথিবীর জলভাগের প্রত্যেক জলবিন্দুর মধ্যে রয়েছে একই রকম ডাইয়্যাটম, অ্যালগি, রোটিফার, পোকা ইত্যাদি। প্রত্যেকটা জলবিন্দুর এসব উপাদান, অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের তুলনায়, নিরক্ষিয় অঞ্চল থেকে মেরু প্রদেশ, মিষ্টি জল থেকে নোনা জল সব জায়গায় একই রকম। সুতরাং, প্রকৃতিদেবী কি মানুষের তুলনায় এসব অন্ত্যজ প্রাণীরই ওপর

বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাননি? যেখানেই একটা পাথর উপরে পড়েছে আর একটু মাত্র মৃত্তিকার সন্ধান পেয়েছে অমনি সেখানে সবুজ ঘাসের সমারোহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু, শুধু মৃত্তিকা নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। মৃত্তিকার মধ্যে নিজের জীবন সংস্থান খুঁজে নিতে হলে মানুষকে সে মাটিতে প্রাণপাত পরিশ্রম করে মাথা খাটিয়ে ফসল ফলাতে হয়; আর ঐ ঘাসকে কাজে লাগাতে হলে তাকে গরু মোষ ছাগল প্রভৃতিকে সে ঘাস খাওয়াতে হয় যত্ন করে—অর্থাৎ পশু জগৎকে তোয়াজ করে মানুষকে বাঁচতে হয়। যদি আয়ুব দিক দিয়ে বিচার করতে হয়, তাহলে পিঁপড়ে প্রভৃতি অন্যান্য অন্ত্যজ প্রাণী মানুষের তুলনায় অনেক বেশী উৎকৃষ্টতা দাবী করতে পারে। যদি মহাকাশে বাঁচার কথা যাচাই করতে হয় তাহলে অসংখ্য সাধারণ উদ্ভিদ বায়োস্ফিয়ারে মানুষের চেয়ে অধিক কাল বেঁচে থাকতে পারে।

প্রকৃতি দেবীর কাছে মানুষ বুঝি সতীনের পুত্র। প্রকৃতি দেবীর আদুরে দুলাল মানুষ কোন দিনই ছিল না। সামান্য অন্ত্যজ প্রাণীর প্রতিও প্রকৃতি দেবীর এক বোখা পক্ষপাতিত্ব। ধরুন, নাকে আপনার সর্দি লেগেছে। তার ফলে আপনার উপরের ঠোঁটে দেখা দিয়েছে ফোঁড়া। এই ফোঁড়ার মূলে রয়েছে হারপেক্স সিমপ্লেক্স নামে এক প্রকার ভাইরাস। রুমাল দিয়ে ক্রমাগতঃ ঘষাঘষিতে যে একটু আধটু ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেখানেই এ জাতীয় ভাইরাস বাসস্থান খুঁজে নেয় এবং বংশবিস্তার শুরু করে। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে এই হারপ্লেক্স সিমপ্লেক্সের বেঁচে থাকার ক্ষমতা অনেক বেশী। হিসেব করে দেখা গেছে মানব বংশের নব্বুই শতাংশ এ এ জাতীয় অসংখ্য কোটি কোটি ভাইরাসের বংশ বৃদ্ধির নব্বুই শতাংশের জন্যে দায়ী। তাজ্জবের ব্যাপার, পৃথিবীর মানব বংশের উপর সে যে জাঁকিয়ে বসে আছে তাই নয়, আত্মবলুপ্তির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাদের সর্বক্ষণের সতর্কতা। কলেরার রোগ জীবাণুরা রোগীকেও মারে নিজেরাও মরে। কলেরা রোগীর মৃতদেহটা হয়তো পোড়ানো হয় নয়তো কবরস্থ করা হয়। হারপ্লেক্স সিমপ্লেক্স কিন্তু রোগীকে মারে না, নিজেও মরে না। চুম্বনের মতো পরশ দিয়ে বেড়ায় কেবল মানুষের দেহে দেহে: হাওয়ার ওপর ভর করে চপল চটুল পদে ঘুরে বেড়ায়।

অন্যান্য প্রাণীকে প্রকৃতি দেবী নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন শীতাতপ

থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে, শত্রুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। কাউকে দিয়েছেন তিনি লম্বা ধারালো নখর ও দাঁত, কাউকে দিয়েছেন তিনি দ্রুত গতি, কারও গায়ে সাজিয়ে দিয়েছেন পর্যাপ্ত পশম. কাউকে দিয়েছেন লম্বা গলা—এক্ষেত্রে উঠ যে নিজের কুজ'টা থেকে জল তৈরী করে নিতে পারে তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। নইলে মরুভূমির উঠ বাঁচতো কি করে? কিন্তু, মানুষেয় বেলায় প্রকৃতি দেবীর সাফ জবাব, 'তোমার ব্যবস্থা তুমি নিজে কর বাপু, তোমার দিকে নজর দেই অতো সময় নেই আমার। তাই, মানুষকে বাধ্য হয়ে পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করতে হলো, হাতিয়ার অস্ত্র শস্ত্র তৈরী করতে হলো। এ প্রসঙ্গে আর একটা প্রশ্ন তোলা হয়তো অযৌক্তিক হবে না। মানুষের শরীরে লোম নেই বললেই চলে। বিশেষ করে শীত প্রধান মেরু প্রদেশ অঞ্চলে যেখানে অন্যান্য পশুদের দেহ ঘন লোমাবৃত সে ক্ষেত্রে মানুষের শরীরটা লোম বিহীন। আবার মজা দেখুন, তুলনামূলক ভাবে বিচার করতে গেলে ককেশিয়ান জাতীয় লোকদের দেহে মাংগল জাতীয় লোকদের (Mamgoloid) চেয়ে কম লোম থাকার কথা। কারণ, ককেশিয়ান জাতীয় লোকেরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে বাস করে। তাহলে পশু পাখীদের ক্ষেত্রে প্রকৃতির যে নিয়ম খাটে মানুষের বেলায় সেটা খাটছে না। ক্রমঃবিবর্তনবাদ বা পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মতবাদ কোনটা দিয়েই এ ব্যাপারটার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে না। (১০৬)

বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের দৈহিক অসুস্থতার কারণ অসম খাদ্য গ্রহণ করা। উদাহরণ স্বরূপ অতিরিক্ত বেশী খেলে হাইপার টেন্সন বা রক্তের নিম্নচাপ দেখা দেয়; চর্বিজাতীয় খাদ্য বেশী খেলে ধমনীগুলো শক্ত হয়ে উঠে। চিকিৎসকদের এসব অভিজ্ঞতার জন্যে মানুষ গর্ব অনুভব করতে পারে; কিন্তু এসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, নিত্য নতুন ঔষধ আবিষ্কারের প্রয়োজন হচ্ছে আমরা কোন জিনিসটা কি পরিমাণে খেতে হবে তা জানিনে বলেই, এই খাদ্য জ্ঞানটুকু প্রকৃতিদত্ত নয় বলেই। অন্যান্য পশুদের তুলনায় মানুষ এ দিক্ দিয়েও প্রকৃতি দেবী কর্তৃক অবহেলিত।

এই যে সঠিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা সেটা নির্ভর করছে কিসের ওপর? স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতার ওপর। ইদুঁরের এই ক্ষমতা নষ্ট করে দিলে সে আর সঠিক খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং মরে যায়। (১০৭)

ইঁদুরের এই স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা মানুষের থেকে অনেক বেশী পরিণত। উদাহরণ স্বরূপ কম মানুষই এক চিনি থেকে অন্য চিনির পার্থক্যটা বুঝে উঠতে পারে এবং এর চেয়েও কম লোকে বুঝতে পারে কি পরিমাণ চিনি স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। কোন জিনিসটা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর, কোন জিনিসটা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর—কোন জিনিসটা কি পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত মানুষের তুলনায় নিকৃষ্টতর প্রাণীদের এটুকু বুঝে ওঠার ক্ষমতা মজ্জাগত প্রকৃতি প্রদত্ত। কিন্তু, মানুষের বেলায় প্রকৃতি দেবী এ দিক দিয়েও উদাসীন। তাই, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে মানুষকে কেবল পাঁয়তারা কষতে হয়, অঙ্ক কষতে হয়—সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তাই তার স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের জন্ম—শরীরটাকে সুস্থ রাখার নানাবিধ নিয়ম কানুন—কতো ক্যালরি খাদ্য শারীরিক পুষ্টির জন্য আবশ্যক, কোন ভিটামিনটা কতোটুকু খাওয়া উচিৎ, কি পরিমাণ খনিজপদার্থ স্বাস্থ্যসম্মত. কি পরিমাণ শর্করাজাতীয় খাদ্য শরীরকে চাঙ্গা রাখতে পারে; কতটুকু চর্বি জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন শরীরের মেদবৃদ্ধিতে সহায়তা করে এ নিয়ে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের কতো উপদেশ পরামর্শ। এখানে ওখানে হাসপাতাল, ডাক্তার, ঔষধের দোকান—নিত্যনতুন ঔষধ আবিষ্কার নিয়ে গবেষণা—এতো করেও কি মানুষের শরীরকে ঠিক রাখা যাচ্ছে? তার খাওয়া দাওযার চলা ফেরায় একটা ভারসাম্যহীন অবস্থা। তাই মানুষ জীবজগৎ পশু জগতের তুলনায় অনেক বেশী রোগাক্রান্ত জীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত।

এ রকম অসম্পূর্ণ অসহায় একটা প্রাণী কিনা জীবন সংগ্রামে অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে বেশী উপযুক্ত!

আমাদের আইন, আমাদের শাসন, সমাজ-ব্যবস্থা, সামাজিক অনুশাসন, নীতিবোধ সব কিছুই কৃত্রিম। তাই আমাদের আইন, আমাদের শাসন আমাদের নিয়ম কেউ মানছে না। সব কিছুকে মানা এবং মেনে চলা আমাদের মজ্জাগত নয়। যেমন ধরা যাক্ যৌন-ক্ষুধার কথা। এ ক্ষুধার তৃপ্তি নেই। মানুষ যখন তখন যে কোন ভাবে এই ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাচ্ছে। কিন্তু, পশু জগতে প্রাণী জগতে প্রকৃতি দেবীর প্রত্যক্ষ বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ। প্রাণী জগতে পশুজগতে প্রকৃতি দেবী অন্ত-প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন স্বভাবের নিয়ম। পশু পাখীরা প্রাণের তাগিদে, শাসনের ভয়ে, বিবেকের তাড়নায় কোন নিয়ম কানুন মেনে চলে না, কতকগুলো নিয়ম কানুন মেনে চলা

ওদের স্বভাব—অনেকটা যন্ত্রের মতো। যন্ত্রের মধ্যে মানুষ যেমন একটা বিশেষ ক্ষমতা এবং ধর্ম আরোপ করে এবং সে ক্ষমতানুযায়ী যন্ত্রটা স্থান কাল পাত্র ভেদে একই রকম আচরন করে, পশুপাখীদের মধ্যেও প্রকৃতি দেবী সে রকম নিয়ম শৃঙ্খলা আরোপ করে রেখেছেন। পশু পাখীর জগতে একটা বিশেষ নিয়ম হলো যৌনক্ষুধা মেটানোর কাজ আর শারীরিক পুষ্টি যোগানোর কাজ দুটো এরা একই সঙ্গে করে না। এক একটা বিশেষ বিশেষ সময়ে ওরা যৌনক্ষুধা মেটায়; মানুষের মতো যত্র তত্র যে কোন সময় সব সময় ওরা যৌন-ক্ষুধা মেটাতে ব্যস্ত থাকে না। বছরের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পশু পাখীরা কেবল খাদ্য সংগ্রহ এবং শারীরিক পুষ্টি যোগানোর কাজে ব্যস্ত থাকে। কোন প্রাণীতত্ত্ববিদই এ কথাটা স্বীকার করবেন না যে একটি প্রাণীও যৌন-ক্ষুধা এবং পেটের ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করে একই সঙ্গে, একই ঋতুতে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের মতে মানুষ তার যৌন-ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে কোন ঋতু এবং সময় মেনে চলে না বলে জীবন সংগ্রামে সে অনেকটা অধঃপতিত হয়ে পড়েছে। যৌন-ক্ষুধা মেটানোর প্রচেষ্টায় এতটুকুও ক্ষান্তি না দিয়ে সে নিজেকে এতো বেশী দুর্বল করে ফেলেছে যে সে তার সামাজিক শক্তির বিরাট একটা অংশকে অ্যাফ্রোডিসিয়াক (ephrodisiac) পরিবেশ রচনায় ব্যয় করতে বাধ্য হয়। এটে করতে গিয়ে তাব স্নায়ুবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সমাজে পরিবারে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রকৃতি রাজ্যে বাঁচার সংগ্রামের কথা বিবেচনা করতে গেলে বলতে হয় মানুষ উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ থেকে পেছিয়ে আছে। সুতরাং, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই যে পশুর থেকে মানুষের জন্ম হয়েছে এই মতবাদটা কতটা গ্রহণযোগ্য ?

উপরোক্ত আলোচনায় আমি যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি তা থেকে দেখা যাচ্ছে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে হঠাৎ, ক্রমঃবিবর্তনবাদের মধ্যে দিয়ে পশু থেকে তার জন্ম হয়নি। আমার উপরোক্ত আলোচনাকে সমর্থন জানাবার জন্যেই বুঝি ম্যাক্স-এ, ফ্লিণ্ড্ (Flindt) লিখেছেন: (৭৬) মানুষের কথা বাদ দিলে, প্রকৃতির কৃতিত্ব তিন প্রকারের বানরের বংশ সৃষ্টি। এর অর্থ, দশ লক্ষ নিউরন (একটা বানরের মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ক্ষমতা) তৈরী করতে প্রকৃতির সময় লেগেছে ৫০০,০০০০০০ বছর। দশ লক্ষ নিউরন সৃষ্টি করতে যদি ৫০০,০০০০০০ বছর লেগে থাকে' ত একটা নিউরন সৃষ্টিতে সময় লেগেছে

ছয় মাস। এখন মানুষের মস্তিস্কের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দশ বিলিয়ন নিউরন অর্থাৎ এক হাজার কোটি নিউরন। তাহলে এই এক হাজার কোটি নিউরন তৈরী করতে প্রকৃতির সময় লেগেছে ৫ বিলিয়ন বছর অর্থাৎ ৫০০ কোটি বছর।

কিন্তু মানুষ এবং তার ঐ বিস্ময়কর মস্তিষ্ক ক্রমঃবিবর্তনের পাত্র থেকে ফুটে বেরিয়ে এসেছে মাত্র ২০ লক্ষ বছরের মধ্যেই! তাহলে এবার দেখুন অঙ্ক শাস্ত্র দিয়েও ক্রমঃবিবর্তনবাদীরা হিসেব মেলাতে পারছেন না। ক্রমঃ-বিবর্তনবাদীরা অাঁকড়ে ধরে আছেন কোন উৎকৃষ্ট জন্তু থেকে (এবং প্রকৃতি রাজ্যে বানরের চেয়ে উৎকৃষ্টতর জন্তু আর কি আছে?) মানুষের জন্ম। তাহলে ঐ উৎকৃষ্ট জন্তুর মানুষের আকার ও মস্তিষ্ক পেতে পেতে অন্যূন ৫০০ কোটি বছর সাধনা করবার কথা। আবার এদিকে তারা বলছেন সব চেয়ে প্রাচীন বানরের থেকে মানুষের জন্ম হতে লক্ষ বছরের বেশী সময় লাগেনি।

আসল কথা কি জানেন, মানব-মস্তিষ্ক এ পৃথিবীর প্রকৃতি সৃষ্টি করেনি। সেটার জন্ম অন্য গ্রহে—অন্য পৃথিবীতে, কিংবা সেই পৃথিবীর সভ্য উন্নত প্রাণীদের হাতে যাদেরকে ধর্মান্ধরা দেবতা বলে অভিহিত করে থাকেন। মানুষের জন্ম মহাজাগতিক অলৌকিক সূত্রে আমার এই পাগলের প্রলাপটার পেছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক বাওথুল (Bowthoul)' এর সমর্থন। মানুষের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন:—আজকাল জীব-বিজ্ঞানীদের অনেকেই সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করে থাকবেন যে প্রাণী জগতের মধ্যে এখন আর স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন চোখে পড়ে না। কিন্তু, মানুষের মস্তিষ্কে এই মিউটেশন ঘটে চলেছে সর্বক্ষণ, -বিশেষ করে কোর্টিক্যাল অঞ্চলে। সুতরাং আমাদের যে মানসিক পরিবর্তন তা ঐ রহস্যজনক, বোধ করি মহাজাগতিক স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশনের মনঃস্তাত্ত্বিক দিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রাকৃতিক নির্বাচন হেতুই নয়, মানব-মস্তিষ্কের এক অতীন্দ্রিয় রহস্যময় শক্তির জোরেই মানুষ আজ সৃষ্টির সেরা সভ্য জীব হতে পেরেছে। ক্রমঃ-বিবর্তনবাদীদের ধারণা মানব-মস্তিষ্কে অতীন্দ্রিয় শক্তির লীলা- খেলা বলতে কিছু নেই। মানব মস্তিষ্কের জন্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ওরা [illegible]:—মানুষ ক্রমশঃ সোজা হয়ে দাঁড়ালো হাত দুটোকে যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ পেল। নানা রকম জিনিস পত্র নিয়ে সে নাড়া চাড়া করতে লাগল, তৈরী করতে লাগল ছোট খাট অস্ত্র শস্ত্র এবং হাতিয়ার। দুটো হাতের এই যে

ক্রমঃবর্ধমান ব্যবহার এর ফলেই মানব-মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা যত বৃদ্ধি পেল, হাতের ব্যবহারও ততো বেড়ে চললো; হাতের ব্যবহার যতো বৃদ্ধি পেলো মস্তিষ্কের উৎকর্ষতাও ততো বেশী বেড়ে চললো। এ ভাবেই জন্ম পরিগ্রহ করলো আধুনিক মানব-মস্তিষ্ক।

খুবই সোজা সরল ব্যাখ্যা। জটিল তত্ত্ব কিছু নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক এ তথ্যটাও বিশেষজ্ঞ মহলে সুবিদিত যে আহার্য বস্তুর নাগাল না পেলে সিম্পাঞ্জী জাতীয় প্রাণীরা একটা কাঠি ব্যবহার করে। কাঠিটা যদি খুবই লম্বা হয় তাহলে তারাকাঠিটা ভেঙ্গে ছোট করে নেয়—কাঠিটা থেকে লতা পাতাগুলোও ছাড়িয়ে নেয়। এ ভাবে তারা হাতিয়ার তৈরী করে। লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার বানরেরাও নিশ্চয় এ রকম হাতিয়ার ব্যবহার করতো। তাই, এখন প্রশ্ন, বানর শ্রেণীর যে প্রাণী বংশ শুধুমাত্র হাতিয়ার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে অত্যুন্নত মস্তিষ্ক শক্তির অধিকারী হয়ে মানুষ নাম ধারণ করলো, বানর শ্রেণীভুক্ত এসব সিম্পাঞ্জী বনমানুষেরা কেন হাতিয়ার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মানুষের মতো উন্নত সভ্য জীব-পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠতে পারলো না? অথচ এই সিম্পাঞ্জীরা পৃথিবীতে বাস করে আসছে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে—মানুষের পূর্বপুরুষ বানরদের চেয়েও (ক্রমঃববর্তনবাদীদের মতে) অনেক বেশী প্রাচীন। তবুও কেন ওরা সেই আদিম স্তরে পড়ে আছে? ওরাও কেন ধাপে ধাপে সভ্যতার পথে এগুলো না?

ক্রমঃবিবর্তনবাদীদের মতে মানুষের প্রয়োজন যতো বৃদ্ধি পেলো, জীবন সংগ্রামে তাকে যতো বেশী জড়িয়ে পড়তে হলো ততো বেশী উৎকর্ষতা লাভ করতে লাগলো তার মস্তিষ্ক। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল সামলাবার জন্যেই মানব মস্তিষ্কের ক্রমঃবিবর্তন। কিন্তু, ডারউইন এবং ক্রমঃবিবর্তনবাদের বিপক্ষে রায় দিচ্ছেন ডারউইনের সহ-আবিষ্কারক আলফ্রেড্ রাসেল ওয়ালেস। ভদ্রলোক গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন। ঐ সব আদিম-অধিবাসীরা শুধু আহার্য-সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকে, জীবনের সাংস্কৃতিক ও সৌন্দর্যের দিকগুলো নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই, ভাবনা নেই, চিন্তা নেই,—অনেকটা পশুর মতো জীবন। তবুও কিন্তু, এদের মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা, বুদ্ধি-বৃত্তিটা আশ্চর্যজনক ভাবে উন্নত। মস্তিষ্কের উৎকর্ষতার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে শিক্ষিত সভ্য মহাকাশযুগের আমাদের তুলনায় তারা কিছু

কম যায় না। উপরে যে শিম্পাঞ্জীদের কথা বললাম তারা হাতিয়ার তৈরী এবং ব্যবহার করতে শিখেও তাদের উৎকর্ষতা বাড়াতে পারেনি; আন্দামানের আদিম অধিবাসীরা কিন্তু পশুর মতো অসভ্য জীবনযাপন করেও আমাদের মতো উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী, কেন? ওয়ালেস সাহেবের উদ্ধৃতি দিতে গেলে :—

'The mental requirements of the lowest savages such as the Australians or the Andaman Islanders are very little above those of many animals. How, then, was an organ developed so far beyond the need of its possesser? Natural selection could only have endowed the savage with a brain a little superior to that of an ape, whereas he actually possesses one but very little inferior to that of the average member of our learned societies.' (১১০)

পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের '(anthropology department) চেয়ারম্যান লোরেন ইশলীও এই একই প্রতিধ্বনি তুলেছেন :— মানুষের গতি প্রকৃতির কথা ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে বলতে হয় এ পৃথিবীর পক্ষে সে বেমানান। এই পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় মানুষের রয়েছে কতকগুলো অপার্থিব বৈশিষ্ট্য। মানুষই একমাত্র জীব যে হাসতে হাসতে মৃত্যু গহ্বরে প্রবেশ করতে পারে; মানুষই একমাত্র জীব যে সত্য ও আদর্শের খাতিরে সর্বস্ব পণ করতে পারে।

আধুনিক যুগের দুজন বিশিষ্ট প্রাণীতত্ত্ববিদ এম, আর, এ চান্স এবং এ, পি, মীড্ স্বীকার করেছেন :—মানুষের যে বিরাটকায় সেরিব্রাম (মস্তিষ্কের বৃহত্তর অগ্রভাগ) রয়েছে তার কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি কেউ।'

তাই বিদগ্ধ নৃতত্ত্ববিদ এবং প্রাণীতত্ত্ববিদরা এই দাবীই তুলছেন :— মানুষের জন্ম ইতিহাস খুঁজে বের করা জীববিদ্যা এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কাজ নয়। 'It is no more a question to be decided by natural science.' আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা এক বাক্যে স্বীকার করছেন পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের জন্ম-ইতিহাস থেকে মানুষের জন্ম-ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাণীর ক্রমঃবিবর্তন এমন একটা নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে

থাকে যেটা শুধু দেহের উপরই কাজ করে। এর ফলেই প্রাণীর দেহে আত্ম-রক্ষার জন্যে বিভিন্ন অস্ত্র ও সজ্জার আয়োজন কিন্তু, মানুষ প্রকৃতি-রাজ্যে বেঁচে থাকবার জন্যে কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরী করেছে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার। তাই, নৃতত্ত্ববিদ স্টিফেন ফিউক্স বলছেন:—Evolution of man is no more in his body, but outside his body. ......It is this unique principle of body liberation' which separates man fundamentally from the animal.'

সুইডেনের প্রাণীতত্ত্ববিদ এ. পোর্টম্যান এবং অন্যান্যদের মতেও শারীর-বৃত্তিক (physiological) দিক দিয়ে মানুষ এবং পশুর মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। পৃথিবীতে মানুষ অনন্য একক তার ধারণাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তির জন্যে। ক্রমঃবিবর্তনবাদের মধ্যে দিয়ে মানুষ এ সব লাভ করতে পারেনি। এমন কি পাকা ক্রমঃবিবর্তনবাদী জুলিয়ান হাক্সলীও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন— If man were wiped out, it is in the highest degree improbable that step to conceptual thought would be taken again......only along one single line is progress and its future possibility being continued—the line of man. In all other directions evolutionary progress seems to have ended in a series of blind alleys.

মানুষের জন্ম যে এ পৃথিবীতে নয়, মহাকাশের অনন্তরাজ্যের অন্য কোথাও এবং ক্রমঃবির্তনবাদের মধ্যে দিয়ে যে-তার সৃষ্টি হয়নি এ বিশ্বাস এবং সন্দেহ মানুষের অনেক দিনের। সেই উনবিংশ শতাব্দীতেও এ ধারণাটা মানুষের মনে দানা বেঁধেছিল। ১৯৬১ সালে জন ডব্লিও ম্যাক্ভির লেখা 'এ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি মানুষ একা' (৭৭) বইটা ছাপানো হয়েছিল। সেই বইতে তিনি বলেছেন,—যারা ক্রমঃবিবর্তনবাদের বিরোধী, যারা মনে করে থাকেন পৃথিবী প্রাণ ধার করেছে অন্য পৃথিবী থেকে তাদের কারও কারও মতে গ্রহান্তর থেকে প্রাণ এসেছে উলকা পিণ্ডের ঘাড়ে চড়ে। উল্কাপিণ্ডের ঘাড়ে চড়ে যে প্রাণ আসতে পারে এ পৃথিবীতে তার প্রমাণ আগেই দিয়েছি। আর কারও কারও মতে এ পৃথিবীতে প্রাণ বয়ে নিয়ে এসেছে স্বয়ং অন্য গ্রহের মহাকাশযান। মহাকাশযানে চড়ে অন্য পৃথিবীর লোক কি নেবে এসেছিল এই পৃথিবীর নিষ্প্রাণ বুকে? জেনে শুনে কিংবা নিজেদের অজান্তেই

তারা হয়তো ফেলে গিয়েছিল জীবাণু, আর সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু থেকেই ক্রমঃবিবর্তনবাদের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছে অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর জীব জন্তুগুলো ? এগুলো হলো বৈজ্ঞানিক ম্যাকভির প্রশ্ন।

১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে লস্ এঞ্জেলসে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের এক সমাবেশে কর্ণেল ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত নক্ষত্রবিদ টমাস-গোল্ড একটা ভাষণ পাঠ করেছিলেন।(৭৮) সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন:—পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি হবার আগে মহাকাশের অন্য পৃথিবীগুলোতে কোটি কোটি বছর ধরে উন্নত সভ্য জীবেরা বাস করে আসছিল। সেই সব পৃথিবীই আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল হয়তো। কিভাবে ছড়িয়েছিল ? সেই সব পৃথিবী এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল হয়তো মহাকাশযান সেই সুদূর অতীতে। হ্যাঁ, কোটি কোটি বছর আগে মহাকাশচারীরা এসেছিল এই পৃথিবীতে। তারা যে প্রাণের বীজ ফেলে গিয়েছিল তাই এ পৃথিবীর মাটিতে বংশ বিস্তার করতে শুরু করেছিল। এবং কালক্রমে আরও যে সব মহাকাশ-চারী এসেছিল তারাই পৃথিবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছিল এই সব জীবাণুসমষ্টি।

তা হলে কি পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল অন্য গ্রহ থেকে ? ডার-উইন পারেননি পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল কি ভাবে তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটলো কি ভাবে ? এ প্রশ্নটা কত বড়ো শক্ত এবং জটিল তা ডারউইনের মতো আর কেউ হয়তো অতোটা উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই তিনি ১৮৬৩ সালে বন্ধু হুকারকে লিখেছিলেন:—পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটলো কি করে, এ মুহূর্তে এটে একটা নিরর্থক প্রশ্ন, (It is mere rubbish, thinking at present of the origin of life।).

আসলে কথা হলো পৃথিবী জীবাণু উপহার পেয়েছে অন্য গ্রহ থেকে। মানুষ আসতো এ পৃথিবীতে এবং তারাই আমদানি করেছে পৃথিবীতে প্রাণের বীজ। এ পৃথিবী মানুষের ধাত্রী হতে পারে, মানুষকে কোলে পিঠে করে মানুষ করতে পারে সে ; কিন্তু মানুষকে সে গর্ভে ধারণ করেনি—তার জঠরে শিশু বেড়ে উঠেনি ক্রমঃবিবর্তনবাদের সূত্রানুযায়ী। এদ্দিন বৈজ্ঞানিকেরা এসব ধারণাকে বলতেন আজগুবি। অন্য গ্রহ থেকে মানুষ এসেছে ! উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা সব। অন্য গ্রহ থেকে যে মানুষ আসতো তার সুস্পষ্ট প্রমাণ

কোথায়? জন ডব্লিউ-ম্যাক্ভি তার 'এলোন ইন দি ইউনিভার্স?' বা 'একাই কি এই বিশ্বে' নামক বইতে অবিশ্বাসীদের এসব প্রশ্নের [illegible] জবাব ছুড়ে মারতে পারেন নি মুখের উপর,—কারণ, অন্য গ্রহ থেকে [illegible]াশযান আসতো প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ সম্বন্ধে তার হাতে পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ ছিল না।

১৯০৭ সালে সুইডেনের বিখ্যাত রসায়নবিদ সান্তে আরহেনিয়াস (Suante Arhenius) বলেছিলেন:—পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেনি আদৌ। অন্য গ্রহ থেকে প্রাণ ভেসে এসেছে বিকিরণ চাপের (Radiation Pressure) দ্বারা পরিচালিত হয়ে; সান্তে আরহেনিয়াস যদি জানতেন যে আমরা অর্থাৎ মানুষ যদি মহাকাশযানে চড়ে অন্য গ্রহে যেতে পারি তাহলে অন্য গ্রহের সুসভ্য সু-উন্নত প্রাণীরাও মহাকাশযানে চড়ে আসতে পারে আমাদের এই পৃথিবীতে, তাহলে তিনি দুঃসাহস করে বলতে পারতেন এ পৃথিবীকে প্রাণ এবং প্রাণী উপহার দিয়েছে অন্য পৃথিবীর মহাকাশযান।

কিন্তু প্রাণী তত্ত্ববিদ্ লোরেন ঈশলী (Eiseley) আধুনিক জমানার মানুষ। তাই তিনি দুঃসাহস করে প্রশ্ন তুলতে পেরেছেন:—আমরা কি অন্য কোথাও থেকে এসেছি? এবং আমরা কি এখন আমাদের মহাকাশ-যানে চড়ে আমাদের (অর্থাৎ মানুষের) জন্মভূমিতে গিয়ে পৌঁছুতে চেষ্টা করছি?

মানুষের জন্মভূমি কোথায়? মহাকাশে অসংখ্য পৃথিবী। সে সব পৃথিবীর কোনটা থেকে মহাকাশযান এবং মহাকাশচারীরা আসতো তা বলা মুশকিল। অতোগুলো পৃথিবী থাকতে শুধু একটা থেকেই বা মহাকাশচারীরা আসবেন কেন? তারা আসতেন নাম না জানা পৃথিবী-গুলো থেকে—তাদের মধ্যে ছিল দানব, দেবতা, অসুর প্রভৃতি নানা রকম পাঁচমিশেলী বুদ্ধিমান প্রাণী। তাদের সংমিশ্রণেই হয়তো তৈরী হয়েছে মানুষ নামে একটা সংকর জাত।

মানুষ অপার্থিব প্রাণীদের বংশধর মাত্র। ক্রমঃবিবর্তনবাদের মধ্যেদিয়ে ইতর প্রাণীদের থেকে তার জন্ম হয়েছে এ ধারণাটা অবৈজ্ঞানিক। কারণ বৈজ্ঞানিকেরা এর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। এ দিক দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা বরং ব্ল্যাক মেইল করবার চেষ্টা করেছেন, এবং কি ভাবে তা করেছেন সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি আলোচ্য

অধ্যায়ে। কিন্তু, আমার এবং আমাদের ব্যাখ্যাটা—অর্থাৎ, মানুষের বংশধরে এসেছে অন্য পৃথিবীগুলো থেকে, তার পূর্বপুরুষেরা বানর শ্রেণীর অন্তর্গত নয় এ সূত্রটার পেছনে যুক্তি আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে—লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে অন্য পৃথিবী থেকে মানুষ বা বুদ্ধিমান প্রাণীরা আসতো এই পৃথিবীতে এইটুকু প্রমাণ করতে পারলেই আমাদের সূত্রটা জোরদার হয়ে ওটে—তাকে আর অযৌক্তিক মনে হবে না। এবং এই যে অন্য গ্রহ থেকে বুদ্ধিমান প্রাণীরা আসতো তাব অসংখ্য পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের





কথা আমি উল্লেখ করেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে। চিত্র দুটা লক্ষ্য করুন। প্রথমটা মধ্য আমেরিকায় আবিষ্কৃত এক প্রাচীন মহাকাশচারীর। দ্বিতীয়

চিত্রটা এ যুগের। কাল্পনিক কাহিনী, উপাখ্যান, পুরাণ কাহিনী, লোক গাঁথা ইতিহাস পুরাকালের ভাস্কর্য-শিল্প সব কিছুই একই ঘটনার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছে—প্রাচীনকালে মহাকাশচারীরা আসতো।" আজকাল আরকিউলজি বা পুরাতত্ত্বও একটা বিজ্ঞান। এবং এটা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়'ত মহাকাশচারীরা আসতো নেমে পৃথিবীতে এ কথাটাও বিশ্বাস করতে হয়।

আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যে সব উপাখ্যান ছড়িয়ে আছে সেগুলোর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে অটোয়া জার্নাল একটা প্রবন্ধে লিখেছিল—পৃথিবীর অধিবাসীরা আগে ছিল অন্য গ্রহে। অন্য গ্রহের বাসীন্দাদের উত্তরপুরুষ হলো মানুষ। ক্যানাডীয় অন্য একটা জার্নাল 'টপসাইড' লিখেছিল :—প্রবন্ধের লেখক সম্প্রতি পিউট ট্রাইব প্রধান 'মেজ্‌ঝালুনার' সংগে দেখা করে এসেছেন। লেখক মেজঝালুনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন :—বলতে পারেন রেডইণ্ডিয়ানরা এসেছে কোত্থেকে? তার জবাবে ট্রাইব প্রধান বলেছিলেন :—প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে রেডইণ্ডিয়ানদের জন্ম হয় আকাশে। তাদের স্রষ্টা গিচ্‌ছি ম্যানিটাউ। তিনি একটা বাজ পাখী (যেটা ওড়বার সময় বজ্রপাতের মতো ভয়ংকর শব্দ হয়) পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীতে তার সৃষ্ট প্রাণীদের নামাবার জায়গা অনুসন্ধান করবার জন্যে। এই জায়গাটা আবিষ্কৃত হলো এবং গিচ্‌ছি ম্যানিটাউ আমাদেরকে এখানেই বাস করবার জন্যে পাঠালেন।"

হাইডেন ইণ্ডিয়ানদের কাছেও ঐ 'বাজপাখী' হলো তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতীক স্বরূপ। ঐ প্রতীক চিহ্নটার ওপরে আছে একটা পাখী—অনেকটা চিলের মতো দেখতে (রেড ইণ্ডিয়ানরা যাকে বলে বাজ পাখী)। একটা মাছের মুখের উপর সেটা দাঁড়িয়ে। মাছটার ল্যাজ এবং মাথার ঠিক মাঝামাঝি বরাবরি স্থানে একটা লোক দাঁড়িয়ে, তার মাথায় একটা লোহার শিরস্ত্রাণ। হাতে একটা বর্শা—সেটা দিয়ে সে গাঁথতে যাচ্ছে মাছটাকে। মিস্টার চার্চওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলেন :—এই প্রতীকটার অর্থ কি? স্থানীয় একজন সন্ন্যাসী তাকে বুঝিয়ে দিলেন—মহাপ্লাবনের যুগে ঐ প্রতীকের বর্শাহাতে লোকটাকে বাজপাখী, বাজ দেবতা এবং অন্যান্য দেবতারাও খুব ভাল বাসতো। মহাপ্লাবন শেষ হলো, তখন দেবতারা লোহার শিরস্ত্রাণধারী বর্শাহাতে দাঁড়ানো লোকটার জন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তাই তারা লোকটাকে একটা স্যালমন (Salmon) মাছে পরিণত করে দিলেন আর তার মাথায় পরিয়ে দিলেন একটা শিরস্ত্রাণ—'

এখানে যে শিরস্ত্রাণটার কথা বলা হচ্ছে সেটা কি কোন মহাকাশচারীর শিরস্ত্রাণ? আর ঐ যে মাছটা সেটা কি একটা কাঁচের খোল? আমাদের মহাকাশচারীরা যদি জলময় কোন গ্রহে নাবতে যায়—তাহলে তাদেরকেও এরকম একটা কাঁচের খোল দেওয়া হবে বোধ করি। এ প্রসঙ্গে জাপানের 'কাপ্পাস' বা ব্যাঙ-মানুষদের কথাও স্মরণীয়।

ব্রায়ান কারা-উলার ড্রোপা ট্রাইবদেরও বিশ্বাস তারা মহাকাশযানে করে নেবে এসেছিলেন। ও ধরণের বিশ্বাস কি শুধু ট্রাইব বা আদিম অধিবাসীদের? পৃথিবীর প্রত্যেকটা সু-সভ্য জাতিরও এই একই বিশ্বাস। দেবতা কিংবা অন্য গ্রহের মানুষেরা আমাদের আদি পিতা—অর্থাৎ তাদের ঔরসেই নাকি মানুষের জন্ম। প্রত্যেকটা হিন্দু জানে সে কোন না কোন ঋষি বা পিথ্রিসের বংশধর; চীনারা জানে তারাও স্বর্গীয় লোকদের বংশধর—চীনাদের ভাষায় 'চিম-নাঙ এবং চাঙ্গ-গী; মিশর বাসীদের জন্মদাতা আইসিস, ওসিরিস এবং থোট। প্রত্যেক জাতিরই আছে সাতজন অথবা দশজন ঋষি মনু এবং প্রজাপতি; সাতটা এবং দশটা কি-ঈ অথবা দশজন এবং সাতজন 'অ্যামসাস্পেণ্ড; দশজন এবং সাতজন চালডিয়ান অ্যাম্নিডোটি; দশজন এবং সাতজন 'সোফিরোথ' ইত্যাদি। (৯১)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর তিব্বতি পণ্ডিত পগব লামা প্রাচীন ভারতে এ পৃথিবী এবং অন্য গ্রহগুলোর মধ্যিকার সম্পর্ক নিয়ে যে সব উপাখ্যান প্রচলিত ছিল সেগুলোর একটা সংকলন প্রকাশ করেন। সেই বইতে লেখা আছে কি করে অন্য গ্রহের লোকদের ঔরসে পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হলো।

আমাদের হিন্দু পুরাণ শাস্ত্র থেকে অবশ্য এমন কিছু প্রমাণ দিতে চান কেউ কেউ যাতে ডারউইনের ক্রমঃবিবর্তনবাদের সঙ্গে তার মিল খুঁজতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু, আমাদের শাস্ত্র যে মারিচী, আত্রি, অগ্নিবাস, পুলস্ত, পুলহ, কেতু, বশিষ্ট প্রভৃতি মানুষের জন্মদাতাদের কথা বলেছে তারা কে? দক্ষ আবার এ সব মানুষের জন্মদাতাদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য—জন্মদাতাদের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে বেশী সন্তান সন্ততির জন্ম দিতে পেরেছিলেন। প্রজাপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দক্ষ মহাকাশ থেকে নাকি ১০,০০০ সন্তান নিয়ে

এসেছিলেন পৃথিবীতে এখানকার নির্জন জনশূন্য প্রান্তরকে কোলাহলমুখর করে তোলার জন্যে। (১৪)

প্রজাপতিদের সাতজন পৃথিবীর সাতভাগে নিজেদের বংশ বিস্তার করেছিলেন। যে ভূ-ভাগগুলোতে ওরা বংশ বিস্তার করেছিলেন সে ভূ-ভাগগুলো যেমন একটার থেকে অন্যটা ভূপ্রকৃতি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে আলাদা, তেমনি মানুষের সাত বংশের এক একটাও শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়েও ছিল বিভিন্ন রকম। কেউ বা দেবতা, কেউ বা দৈত্য, কেউ বা দানব, কেউ বা নাগ, কেউ বা রাক্ষস। এছাড়া গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতি মানব বংশও আছে।

আর্য জাতি হলো বৈবস্বত মনুর সন্তান। প্রথমে তারা এক জায়গায় জন্ম গ্রহণ করে, পরে তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীকরাও আর্যদের বংশধর। শ্লীমানের ট্রয় আবিষ্কারের পর এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রীক সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা মূলতঃ এক। ওই আর্যরাই যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সভ্য ও শক্তিশালী জাতি একথাটা কে অস্বীকার করবে? তারা বিভিন্ন দেশের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন, সভ্যতা বিস্তার করেন।

আমাদের ধর্ম সাত সাতজন প্রজাপতি বা মনুর কথা বলে—এর থেকে কি এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে সাতটা গ্রহ থেকেই ওরা এসেছিলেন? 'সাত' সংখ্যাটা যে একটা রূপক ও বিশেষ অর্থবহ সংখ্যা এ প্রসঙ্গে সেটা মনে রাখা ভালো। সাত সংখ্যাটার নিশ্চয়ই কোন ধর্মীয় তাৎপর্য থেকে থাকবে। সে যাই হোক, সাতজন প্রজাপতিই কি একটা গ্রহ থেকে এসেছিলেন? মহাকাশে অতগুলো গ্রহ থাকতে শুধু একটা গ্রহ থেকেই প্রজাপতির আবির্ভাব ঘটবে কেন? যে প্রজাপতি অসুর বা দানবদের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি নিশ্চয় অন্যগ্রহ থেকে এসেছিলেন। প্লেটো তার ফ্যাড্রাসেতে বলছেন পাখাওয়ালা মানব বংশের কথা। এ্যারিস্টোফ্যানেস প্লেটোর ব্যানকোয়েটে বলেছেন গোল শরীরওয়ালা এক মানব বংশের কথা, এরা কারা? ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ থেকে ওরা এসেছিল। তাই ওদের অতো গঠন বৈচিত্র্য? বিভিন্ন গ্রহ থেকে আসা বিভিন্ন মানব-বংশের মধ্যে পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করবার জন্যে যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো তা আমরা পুরাণ থেকে জানতে পারি। এসব লক্ষ কোটি বছর আগেকার কথা। আজকাল আমরা পৃথিবীতে যে মানুষ দেখতে পাই তারা এসব বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন গঠনের, বিভিন্ন ধর্মের গ্রহান্তরের

মানুষদের সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন—গ্রহান্তরের মানুষেরা এখন পৃথিবীতে আধিপত্য করতে চাইছে না কেন? আমার উত্তর ইংরেজদের বংশধর তো আমেরিকানরা; ইংরেজরা কেন আমেরিকানদের ওপর এখন প্রভুত্ব বিস্তার করতে যাচ্ছে না, তাদের শাসন করছে না? আর অন্য গ্রহের মানুষ এসে যে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে মিতালি করবে তাও হচ্ছে না, তারা পৃথিবীতে তাদের বংশধরদের চিনবে কেন? সব কিছু যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সতের রকম ইউরোপীয়দের সংমিশ্রণে আমাদের ভারতবর্ষে যে সংকর জাত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সৃষ্টি হয়েছে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে আসেন কোন ইউরোপীয়? অন্য গ্রহের মানুষরা আমাদেরকে যে এ ধরণের অবজ্ঞার চোখে দেখে না তাও বা হলফ করে বলা যায় কি করে?

অন্য গ্রহের মানুষ এ পৃথিবীতে আসেন, মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকেন; তারা তাদের উপনিবেশে আসা যাওয়া করেন। এক একটা গ্রহের একচ্ছত্র আধিপত্য এক একটা উপনিবেশে।

এবার আসি আদিম অধিবাসীদের কথায়।

এসব আদিম অধিবাসীদের উপাখ্যানগুলো নিছকই সাজানো গোছানো মিথ্যা ঘটনা? এদের উপাখ্যানগুলোতেও যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে। পাঠকদের সুবিধের জন্যে আরও কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি:—চীনা উপাখ্যানে এমন উল্লেখ পাওয়া যায় হলুদ রঙের বেঁটে-খাটো প্রাণীরা সব আকাশ থেকে নেবে আসতো মহাকাশ-যানে চড়ে। কোন কোন সময় তারা আক্রান্তও হতো। তারা ছিল দেখতে বিদ্‌ঘুটে। তাদের মাথা ছিল বড়ো, শরীরটা ছিল খুবই সরু। তাই হয়তো সৌন্দর্যের পূজারী পৃথিবীর মানুষ তাদেরকে আপ্যায়িত করবার স্বতঃস্ফূর্ততা পেতো না। এ জাতীয় লোক-গাঁথা যে সত্যি তার সমর্থন পাওয়া যচ্ছে বিজ্ঞানের কাছ থেকে।

চীনের কতকগুলো গুহায় মন্দির এবং কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো ১২০০০ বছরের পুরোনো। কঙ্কালগুলো হলো সেই সব প্রাণীর যেগুলোর মাথাটা মস্তো বড়ো, আর শরীরটা ঠিক ততোধিক সরু। চীনের পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌দের কেউ কেউ বললেন—এক জাতীয় বানরের কঙ্কাল, সে সব বানরের বংশ আজ লুপ্ত। কিন্তু, বানর কি কবর দিতে জানে মৃতদেহকে? বানর

পারে না লিখতে পড়তে। ঐ গুহা গুলোতে আঁকা রয়েছে সূর্য চন্দ্র এবং তারারা সব, তাদের আশে পাশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকৃতি জিনিস যেগুলো ধেয়ে আসছে পৃথিবীর একটা পার্বত্যময় অংশের দিকে প্রবল গতিতে।

সোভিয়েত পণ্ডিত সাইটসেভ বলেছেন:—পেরুবাসীদের ধারণা তাদের পূর্বপুরুষেরা ব্রোঞ্জ, সোনা এবং রূপোর ডিম থেকে জন্ম নিয়েছিল। এই সব ডিম পড়েছিল আবার আকাশ থেকে। এ জাতীয় ডিম্বাকৃতি জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট ব্রেনার্ড সাহারা মরুভূমির কেন্দ্রস্থলে। এই আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে গেলেন হেনরী লোটের নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী। সেখানে তারা দেখলেন—নানা রকম ভাস্কর্য বা চিত্র শিল্প। একটা চিত্র থেকে দেখা গেল একটা ডিম্বাকৃতি বস্তু থেকে বেরিয়ে আসছে একটা লোক। ঐ ডিম্বাকৃতি বস্তুটার চারধারে আছে এককেন্দ্রীয় বৃত্ত (concentric circle)।

ডিম থেকে কি মানুষ জন্ম নিতে পারে? পেরুবাসীরা হয়তো ডিম্বাকৃতি মহাকাশযানগুলো থেকে মানুষদের বেরিয়ে আসতে দেখেছিল বা বেরিয়ে আসবার কথা শুনেছিল। যাই হোক তাদের লোক-গাঁথার সংগে সাহারায় আবিষ্কৃত চিত্রগুলোর কী চমৎকার সাদৃশ্য!

তাহলে আদিম অধিবাসীদের বিশ্বাস অমূলক নয়, তাদের বিশ্বাসের রয়েছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। সুতরাং মানুষের পূর্বপুরুষেরা এসেছে মহাকাশের অন্য কোন পৃথিবী থেকে আমার এ সূত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। আমার বা আমাদের এই সূত্রটা ডারউইন এবং তাঁর সমর্থকদের ক্রমঃবিবর্তনবাদ ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের চেয়েও অধিকতর সন্তোষজনকভাবে মানুষের জন্ম ইতিহাস উদঘাটিত করে দিতে সমর্থ। অথচ ছোটকাল থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়ে থাকি তাতে আমাদের মানসিকতা এমনভাবে গড়ে উঠে যে বানর থেকেই আমাদের জন্ম এ কথাটাকে আমরা অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে নির্বিদ্বিধায় মেনে নিয়ে থাকি। কিন্তু, ক্রমঃবিবর্তনের বর্মাবৃত হয়ে পৃথিবীর যে সত্যিকার বাণী ও ইতিহাস নীরবে আমাদেরকে সর্বপ্রকার সংস্কার অন্ধ ধারণা ত্যাগ করে প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে আমরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করছি না।